Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক নারীবাদ(feminism) ও ইসলামী নারীত্ব: তুলনামূলক বিশ্লেষণ

তত্ত্বাবধায়নেঃ উস্তাদ সাইফুদ্দিন শাকিল রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম	জমা দিয়েছেনঃ রাশেদা ইয়াসমিন রোলঃ ২৩১০০১২০৪৮৫

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক নারীবাদ(feminism) ও ইসলামী নারীত্ব: তুলনামূলক বিশ্লেষণ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ	জমা দিয়েছেনঃ
উস্তাদ সাইফুদ্দিন শাকিল রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম	রাশেদা ইয়াসমিন রোলঃ ২৩১০০১২০৪৮৫

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ আধুনিক নারীবাদ(feminism) ও ইসলামী নারীত্ব: তুলনামূলক বিশ্লেষণ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রাশেদা ইয়াসমিন আইডিঃ ২৩১০০১২০৪৮৫

বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

উস্তাদ সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা –
Islamic Online Madrasah - IOM

এক্সটারনালঃ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা –

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আধুনিক নারীবাদ(feminism) ও ইসলামী নারীত্ব: তুলনামূলক বিশ্লেষণ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার

(Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

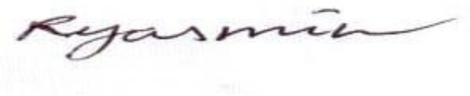

তারিখঃ

মে, ২০২৬ ইং

রাশেদা ইয়াসমিন

আইডিঃ ২৩১০০১২০৪৮৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১. সূচনা ০৬

২. নারীর সংজ্ঞা ০৬

৩. বিভিন্ন ধর্মে নারীর অবস্থান ১১

৪. ইসলামের আলোকে নারীর অধিকার ১৯

৫. নারীবাদ তত্ত্বের আবির্ভাব/অবতারনার ইতিহাস ৩৮

৬. ইসলাম ও পাশ্চাত্য নারীবাদের তুলনামূলক দৃশ্যপট ৩৮

৭. মুসলিম খিলাফতে নারী স্বাধীনতা বনাম পাশ্চাত্য নারীবাদ ৭৫

৮. বংলাদেশের নারীবাদের চিত্রপট ১০৬

৯. পরিবার পরিকল্পনা প্রজেক্ট: পশ্চিমা ও আধুনিক নারীবাদের সমাজ বিধ্বংসী ষড়যন্ত্র ১১৩

১০. নারীবাদের আগ্রাসন থেকে নারী সমাজকে বাঁচাতে করণীয় ১১৮

১১. ইসলামের আলোকে নারীর শিক্ষা, চাকরি ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিশ্চিতকরণে করনীয় ১৩৩

১২. উপসংহার ১৩৮

সূচনাঃ

ইসলামে নারী অধিকার ও জীবন ব্যবস্থার মূল বিষয়বস্তু আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধান আল কোরআন, ও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস থেকে নেওয়া আয়েছে। "Islam is the name of a perfect way of life and social system" - ('ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান ও সমাজ ব্যবস্থার নাম") । ইসলাম নারী জাতি ও নারী সমাজ তো দূরের কথা কোন প্রাণীকূলের প্রতিও এক কিঞ্চিত জুলুম বা অবিচার করেনি । বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে বলবো, "ইসলাম নারীদের কোন দিক দিয়ে ঠকায়নি, করেনি তাদের কণা পরিমান ও অধিকার খর্ব। বরং পুরুষের তুলনায় ইসলাম নারী সমাজকে কেবল অধিকার নয়, সমান অধিকার নয়, বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে দিয়েছে অগ্রাধিকার। এ সম্পর্কে পাঠে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে - পৃথিবীর ভৌগলিক পরিমন্ডলে ইসলামই একমাত্র জীবন বিধান ও সমাজ ব্যবস্থা - যা নির্যাতিত, নিপিড়ীত ও অবহেলিত নারীকূলকে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। জাহেলিয়াতের নগ্ন থাবা ও কালো ছায়া দূর করে আবদ্ধ করেছে স্থায়ী মর্যাদার শৃঙ্খলে ।

আমাদের একথাটি মাথায় রাখতে হবে যে-মূলত নারী হলোঃ- মানব গড়ার ফ্যাক্টোরি । একজন নারীর পেট থেকেই তৈরি হয় হাফেজ, আলেম, মুফতি, মুহাদ্দিস, পীর বুজুর্গ, রাজা-বাদশাহ, ও নবী আম্বিয়া। তাঁরা সমাজের রুপকার ও কর্ণধার, নারী যদি চায় একটি সমাজকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিতে পারে। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়:- একটি আদর্শবান সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা অপরিসীম।

অতএব, মুসলিম নারীদের উপলব্ধি করার এখনি সময় যে, পাশ্চাত্যবাদী কুফরি শক্তিগুলো তাদের মিত্র নয়, বরং ইসলামের উপর কালেমা লেপনের প্রত্যাশা ও মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, তাহযিব-তামাদ্দুনকে সমূলে বিধ্বস্ত করে মুসলিম নারীকূলকে চিরতরে পঙ্গু করে দিয়ে ভোগবিলাসের পণ্য বানানোর নেশায় এঁটেছে বিশ্বব্যাপী এই নগ্ন ফাঁদ !

নারীর সংজ্ঞাঃ

নারী সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে নারীর সংজ্ঞা বা নারী বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার ।

নারী বলতে একজন পূর্ণ বয়স্ক মহিলা মানুষকে বোঝায় ।যৌবনকালে পৌছাবার পূর্বে একজন নারীকে মেয়ে বলে সম্বোধন করা হয়। নারী শব্দটিকে যখন "নারী অধিকার" শব্দগুচ্ছে ব্যবহার করা হয় তখন বয়সের ব্যাপারটিকে প্রাধান্য দেয়া হয়না। নারী শব্দটি সাধারণভাবে যে দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহার করা হয় তা হল, যে কোনো মহিলা মানুষ বুঝাতে, বা বিশেষভাবে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা মানবকে বুঝাতে যা "মেয়ে" শব্দটির পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মেয়ে শব্দটি কখনও কখনও অল্পবয়সী অবিবাহিত মহিলাকে বুঝাতে কথায় কথায় ব্যাবহার করা হয়; মেয়ে শব্দটি ইংরেজিতে এরৎষ মূলত ইংরেজিতে "young person” [ইয়াং পার্সন] “Off year sex” [অফ ইয়ার সেক্স] বোঝায়। এটি শুধুমাত্র ১৬ শতকের শুরুর দিকে ছিল। এবং বিশেষভাবে একটি কন্যা শিশুর অর্থে এসেছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে নারী বলতে সাধারণত সবধরনের নারীকে বোঝানো হয় l

আমাদের একথাও জানা থাকা দরকার যে, নারী শব্দটি আরবিতে, اَلْمَرْأَةُ (আলমারআতু) “নারী” শব্দটি একবচন, উক্ত শব্দটি থেকে বহুবচন আসেনা । অন্য এক শব্দ থেকে বহুবচন হল “বষরি” (নিসাউন) “নারী সমূহ” ।

নারীকে পশ্চিমারা বলে House wife ! বাংলায় বলা হয় গৃহিনী! আর ইসলাম বলে ‘রাব্বাতুল বাইত’ অর্থ ‘ঘরের রানী’ ইসলাম নারীকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছে!

পরিভাষায় :- নারী বলতে বোঝানো হয়, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের পাঁজরের হাড় থেকে তাদের অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। যেন তাদের পরস্পরের মাঝে আন্তরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় ও ভালোবাসা গভীর হয়। এবং তাদের মাঝে প্রেম ভালোবাসার বন্ধন যেন মজবুত হয় । দয়া-মায়ার শিকড় যেন সুন্দর ও মধুময় হয় । ইসলামের মহাগ্রন্থ আল কোরআনে “ ” (নিসা) অর্থাৎ 'মহিলা' শব্দটি ৫৭ বার এবং “ ঔধ!” (ইমরাআহ) অর্থাৎ ‘নারী' শব্দটির ২৬ বার উল্লেখ হয়েছে। পবিত্র কোরআনে 'নিসা' তথা ‘মহিলা' শিরোনামে নারীর অধিকার ও কর্তব্যসংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র বৃহৎ সূরাও রয়েছে। এ ছাড়া কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও তাদের মূল্যায়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। ইসলাম নারীর ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। দিয়েছে নারীর জান-মালের নিরাপত্তা ও সর্বোচ্চ সম্মান ।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :-

অর্থ :- হে মানুষ! তোমাদের রবকে ভয় করতে থাক, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং এ দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর-নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক। যার উসিলা দিয়ে তোমরা একে অপরের নিকট (সাহায্য ইত্যাদির) আবেদন করে থাক এবং সতর্ক থাক আত্মীয়দের সম্পর্কে । নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। সূরা নিসা, আয়াতঃ ১

অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর বাম পাঁজর থেকে সবার আগে হযরত হাওয়াকে বের (পয়দা) করেন । তারপর এ দুইজন থেকেই সমস্ত নর ও নারীকে পয়দা করেছেন এবং পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন অতএব প্রকৃতপ্রস্তাবে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানবকে এক প্রাণ ও এক ব্যক্তি থেকে পয়দা করেছেন। সারকথা, যেহেতু তিনি তোমাদের সকলকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা, সেহেতু তাঁকে ভয় করা ও তাঁর ফরমাবরদারী করা তোমাদের জন্য জরুরী।

এতে দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রথম, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সকলের স্রষ্টা ও অস্তিত্বদাতা। দ্বিতীয়, সকল মানুষের সৃষ্টি আদি উৎস হচ্ছে একই প্রাণ অর্থাৎ মানুষের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম। তার থেকে আল্লাহ তায়ালা সকলকে সৃষ্টি করেছেন। এ থেকে জানা গেল আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক তো আল্লাহরই সঙ্গে । কেননা, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যে পরিমাণ সম্পর্ক ও নৈকট্য থাকে, তা আর কারোর মধ্যে সম্ভব নয়। এর পরবর্তী পর্যায়ের সম্পর্ক নৈকট্য হচ্ছে তা, যা মানব গোষ্ঠীর পরস্পরের মধ্যে পাওয়া যায়। কেননা, তাদের সকলের সৃষ্টির উৎস এক প্রাণ, এক ব্যক্তি।

এ থেকে জানা গেল প্রথমত আমাদের উপর আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা অবশ্যই কর্তব্য । কারণ, তিনি আমাদের স্রষ্টা । অতঃপর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সমশ্রেণী অর্থাৎ মানব গোষ্টির প্রতি সদয় হওয়া ও তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করাও আমাদের কর্তব্য। কারণ, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের সৃষ্টির উৎস একই সত্তাকে বানিয়েছেন। সুতরাং যে নৈকট্য ও সম্পর্ক মানবজাতির পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান, তা অন্য কোন বস্তুর সাথে নেই। এই কারণেই শরীয়তের দৃষ্টিতে (যুক্তি-বুদ্ধির বিবেচনায়) মানুষের জন্য অপর মানুষের সাথে তোমার সদ্ব্যবহার করা এমন জরুরী এবং অসদ্ব্যবহার এমন নিন্দনীয় যে, এমনটি আর অন্যান্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে নয় । এর বিশদ বিবরণ কুরআন-হাদিসে ও শরীয়তের বিধানে বিদ্যমান রয়েছে। হযরত শেখ সাদী রহঃ এর ভাষায় : -

(আদম সন্তান একে অপরের অঙ্গস্বরূপ, যেহেতু তাদের সৃষ্টি হয়েছে একই মূল থেকে । কোনো দিন যদি এক অঙ্গ ব্যথায় ভোগে, তবে তার অন্যান্য অঙ্গের ও শান্তি থাকেনা ।

সারকথা, এস্থলে আল্লাহ তায়ালা যে সকলের স্রষ্টা, এই সত্য প্রকাশ করে তার আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন এবং মানবজাতি যে একই উৎস থেকে সৃষ্টি, এই সত্যের সন্ধান দিয়ে পরস্পর এক দেহের মত হয়ে থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন । বরং আয়াতের সামনের অংশে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন ।

আল্লাহ তায়ালা খালেক ও রব অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হওয়া ছাড়া ও তাঁর আনুগত্য করার আরেকটা কারণ রয়েছে । তা এই যে, তাঁর উসিলা দিয়ে তোমরা পরস্পর একে অপর থেকে স্বীয় হক (অধিকার) ও প্রয়োজন চেয়ে থাকো এবং তার কসম দিয়ে একে অপরকে আশ্বস্ত কর। অর্থাৎ নিজেদের পরস্পরের লেনদেন ও সাময়ীক প্রয়োজনাদি তাঁরই মাধ্যমে ধরে থাক। আল্লাহ-মুখাপেক্ষিতা মানুষের অস্তিত্ব ও স্থিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকল বিষয় ও প্রয়োজনে মানুষ তাঁর মুখাপেক্ষী । এজন্য তার আনুগত্যের আবশ্যকতা আরো জোরদার হল ।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :-

আর আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন। যাহাতে তোমরা উহাদের নিকট শান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে নির্দেশনাবলী সে কওমের জন্য যারা চিন্তা করে। সূরা রূম, আয়াত: ২১

অর্থাৎ, প্রথমে মাটি থেকে শুধু এক আদমকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তাঁরই ভিতর থেকে তাঁর জোড়া বের করলেন, যাতে হৃদ্যতা ও শান্তির সাথে তাঁর নিকট বাস করে । আর আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিগতভাবে উভয় শ্রেণির মধ্যে বিশেষ রকমের মোহাব্বত ও আকর্ষণ রেখে দিয়েছেন, যাতে দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য হাসিল হয়। সে মত উভয়ের মিলনের ফলে মানব-বংশ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। আরো বলেন :-

আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন । এবং তোমাদের যুগল হইতে তোমাদের জন্য পুত্র ও নাতিদের সৃষ্টি করিয়াছেন । আর তিনি তোমাদেরকে পবিত্র রিজিক দান করেছেন। তারা কি বাতিলে বিশ্বাসী? এবং আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করে ? - সূরা নাহল, আয়াত : ৭২

অর্থাৎ সকলকে সমপরিমাণ রিযিক দেওয়া হয়নি। যোগ্যতা ও অবস্থার পার্থক্যের আলোকে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হেকমত অনুযায়ী কতককে কতোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কাউকে তিনি ধনী ও কর্তৃত্বের অধিকারী বানিয়েছেন, যার অধীনে অনেক দাস-দাসী ও চাকর-বাকর থাকে, যারা তারই মাধ্যমে রুযী পায়। আর কতককে।

বানিয়েছেন দাস ও ভৃত্য, যারা নিজেরা এক পয়সা বা সামান্য ক্ষমতারও মালিক নয়, বরং সর্বদা মনিবের আদেশ-ইশারার অপেক্ষায় থাকে, অথচ তারা তার মতই মানুষ । এখন দুনিয়াতে কোন প্রভু কি এটা সহ্য করবে যে, তারা তার ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদায়, ও স্ত্রী প্রভৃতিতে সমান অংশীদার হয়ে যাবে? শরী'য়তের বিধান তো এই যে, গোলামিতে থাকা অবস্থায় তাকে কোন কিছুর মালিক বানালেও মালিক হয় না। বরং মনিবই মালিক থাকে। আর যদি প্রভু তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে নিজ সম্পদ, প্রভৃতিতে সমান অংশীদার বানিয়ে নেয়, তবে তারা উভয়ে পরস্পর সমান হয়ে যাবে বটে, কিন্তু তখন গোলাম আর গোলাম রইল না। যা হোক, গোলামী ও সমান অংশীদারিত্ব একই হতে পারে না ।

যখন একই জাতের ও সমশ্রেণীর মানুষের মধ্যে মালিক ও মালিকানাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমতা সম্ভব নয়, তখন খালেক ও মাখলূককে (অর্থাৎ স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে) উপাস্য ইত্যাদি হওয়ার ক্ষেত্রে সমান মনে করা হয় কি করে? এবং যে সব বস্তুকে স্বয়ং মুশরিকরা পর্যন্ত আল্লাহর মালিকানাধীন বলে স্বীকার করত, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার শরীক ও সমকক্ষ সাব্যস্ত করা কতই না সাংঘাতিক অপরাধ। যে বিষয় কবুল করতে নিজেরা অপ্রস্তুত, তার চেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা খুবই নিমকহারামী!

অর্থাৎ রুযী-রোযগার, ধন-সম্পদ প্রভৃতির মধ্যে আল্লাহ তায়ালা যেমন একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, সকলকে একই স্তরে রাখেননি, তদ্রুপ ইলম ও মারেফত এবং নবুওয়াতের গুণাবলির মধ্যে কাউকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে থাকলে তা তো আল্লাহ তাআলারই দান, তাঁরই নেয়ামত। তার এ নেয়ামতকে অস্বীকার করার কারণ হঠকারিতা ছাড়া আর কি হতে পারে? (তাফসীরে উসমানী)

উক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা একথা সুস্পষ্ট পরিষ্কার হলো যে, "আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ) এর স্ত্রী হযরত হাওয়া (রাঃ) কে তাঁর থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর একথা বলাবাহুল্য যে, পৃথিবীর সকল মানুষ হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (রাঃ) এর ধারাবাহিকতা ও সিলসিলার মাধ্যমে পৃথিবীতে আসছে।

এখানে আরো একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা যেমন পুরুষদের সৃষ্টি করেছেন নির্ধারিত ও স্বতন্ত্র কিছু গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য দিয়ে, তেমনিভাবে নারীদেরকেও সৃষ্টি করা হয়েছে, আলাদা

কিছু কোয়ালিটি ও সতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দিয়ে। উভয়ের মধ্যে রয়েছে, সৃষ্টিগত তফাৎ, কোয়ালিটিগত ডিফারেন্স, ও বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা।

বিভিন্ন ধর্মে নারীর অবস্থান:

আমরা যদি ইসলাম ধর্ম নিয়ে যথাযথ গবেষণার পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মগুলো নিয়ে ও কিছুটা রিসার্চ করি, তাহলে আমাদের সামনে এই বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মত ও পথ, ধর্ম বা আদর্শ নারীর যথাযথ অধিকার ও সম্মান নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়নি। মূলত নারী পুরুষের সমন্বিত প্রচেষ্টায় গঠিত হয় একটা সুন্দর পরিবার, আদর্শবান সমাজ ও সুষ্ঠ রাষ্ট্র ব্যবস্থা। পুরুষের প্রতি হিংসার বীজ বপন করে যেমন আদর্শ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন হতে পারেনা। ঠিক তদুপুরি নারী সমাজকে অবহেলিত করে আদর্শ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখা সম্ভব না । পুরুষের ভূমিকার পাশাপাশি নারী সমাজেরও রয়েছে, সুন্দর পরিবার, আদর্শ সমাজ ও সুষ্ঠ রাষ্ট্র গঠনের মুখ্য ভূমিকা। আর এক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছে। পৃথিবীতে একমাত্র ধর্ম ইসলাম যা নারীকে মর্যাদার শীর্ষাসনে করেছে সমাসীন। যা আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে সক্ষম হবো যদি অন্যান্য ধর্মে নারীর অবস্থান নিয়ে একটু আলোচনা করি। আরবের বাহিরে কোন দৃষ্টিতে নারীকে দেখা হতো, এ সম্পর্কে জৈন্যক প্রখ্যাত মুসলিম উৎ Gustaulibon ডক্টর গুস্তাওলিবনের উক্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি বলেন, "গ্রীকরা সাধারণত নারীদেরকে নিচু স্তরের মনে করত। কোন স্ত্রীলোকের অস্বাভাবিক সন্তান জন্মালে তাকে হত্যা করে ফেলা হতো। (তামাদ্দুনে আরব ৩৭) প্রাচীনকালের বাগ্মী অধ্যায়ে লিখা আছে, আল্লাহর প্রিয় বান্দা মাত্রই নারীর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকবে। একটি শহরের মধ্যে আমি একজন করে আল্লাহর প্রিয় পাত্র পেয়েছি,কিন্তু গোটা পৃথিবীতে ও আমি একজন আল্লাহর প্রিয় পাত্রী পাইনি । (তামাদ্দুনে আরব ৩৮)

তুমি নারী

তোমার ভাবা উচিৎ, তুমি কেন নবীজির অবাধ্য হয়ে

নিজের মত জীবন চালাচ্ছ!!

খ্রিষ্ট ধর্মে নারীর অবস্থান

বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সভ্যতার দাবিদার খ্রিস্টানরা । তাদের ধর্মের অনুসারীরা নারী সমাজকে একবারে (Religiously) "ধর্মীয়ভাবে" পাপের প্রতীক মনে করে। (Tertullian)

“তারতুলিয়ান” প্রাথমিক যুগের খ্রিষ্ঠ ধর্মের একজন প্রথম সারির ধর্মগুরু ছিলেন। তিনি নারী সমাজ সম্পর্কে খ্রিস্টীয় চিন্তাধারা নিম্মোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। নারী শয়তান আগমনের দ্বার স্বরূপ, সে নিষিদ্ধ বৃক্ষের আকর্ষণকারিনী, সে সৃষ্টিকর্তার আইন ভঙ্গ কারিনী। (Cry Sostum) ক্রাই সোস্টাম” নামক খ্রিস্টানদের আরেক ধর্মীয় গুরু নারী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, “ নারী মানেই একটি জন্মগত পাপ, একটি অনিবার্য কু-প্ররোচনা, একটি আনন্দদায়ক বিপদ, একটি পারিবারিক আশঙ্কা,একটি ধ্বংসাত্মক প্রেমদায়িনী, এবং একটি সজ্জিত দুর্ঘটনা। (According to the religious beliefs of Christians) তথা, খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস মতে আদি মাতা হযরত হাওয়া (রাঃ) এর কারণেই নারী জাতির রক্তে ও শিরা উপশিরায় স্থায়ীভাবে জারি হয়ে আছে পাপের তকমা । মানব শরীরে মাতৃত্ব রক্তের অংশ থাকে বলে সন্তান ও পাপিষ্ঠ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস মতে নারী জাতি পাপের পুতুল। খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বিধিগ্রন্থ (ইরনষব) “বাইবেলে” উল্লেখ আছে যে, “ইয়াহুদীদের ধর্মশাস্ত্র (Talmud)

তালমুদ” এর ভাষ্যমতে আদি মাতা হাওয়া (রাঃ) আদি পিতা হযরত আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টিকর্তার নাফরমানি করতে উৎসাহিত করেছিলেন। নাউজুবিল্লাহ! খ্রিষ্টান পাদ্রীরা আরো মনে করে থাকেন যে, রুহানী শক্তি অর্জন ও ধর্মীয় মর্যাদা লাভ একমাত্র নারীর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে সম্ভব। তাই পাদ্রীদের মতে বিয়ে করা উচিত নয়। সঙ্গত কারণে, নারীদের সাথে যৌন সম্পর্ক (বিবাহের মাধ্যমে হলেও) জারজ সন্তান জন্মের কারণ বলে মনে করে থাকেন খ্রিস্টান ও ইয়াহুদী পাদ্রীরা । এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন না করলে নয়, নারীদের সাথে যৌন সম্পর্ক বিবাহের মাধ্যমে যদি হয় জারজ সন্তান জন্মের কারণ । তাহলে পাদ্রীদের জন্মদাতা কে? এদের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তারাও তো (bastard) “জারজ” । যদি বলা হয় তারা জারজ না, তাহলে প্রশ্ন আসবে তারা জন্ম নিয়েছে কোথায়? কুকুরের পেটে না কোন জীব জানোয়ারের পেটে? অবশ্যই তারাও কোনো না কোনো নারীর পেটেই জন্ম নিয়েছে । অতএব তাদের যুক্তি বা দাবীমতে বলা যায়, ইয়াহুদী আর খ্রিস্টানরা নারীর পেট থেকে জন্ম নেওয়ার কারণে পৃথিবীর চূড়ান্ত পর্যায়ের (bastard) বা জারজ। অতএব ধর্মীয় গুরু ও পাদ্রী আসন গ্রহণ করে, পৃথিবীর কোন মানুষ নিয়ে (মড়ড়ফ ধফারপব) “ভালো উপদেশ” বা মানব কল্যাণ সাধনে লেকচার দেয়ার কোন অধিকার তারা রাখেনা । খ্রিস্টানদের গ্রিক " Mythology Z pardro” নামক নারীকে সকল প্রকার বিপদের ঝড় বলা হয়। এ কারণেই ইংরেজিতে একটি পরিভাষা (Paradora) নামক ব্যবহার হয়ে আসছে। পক্ষান্তরে ইসলাম ঈমানের পূর্ণতার জন্য বিবাহ করার আদেশ দিয়েছে। এবং স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তার প্রেরিত রাসূল বিশ্ব মানবতার অগ্রদূত মহানবী

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাজারো দাওয়াতি ব্যবস্তা ব্যতিরেকে বিবাহের বিধান তাঁর জীবনে বাস্তবায়ন করে, গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য নমুনা স্থাপন করেছেন। খ্রিস্টান জাতির নিকট নারী পাপের প্রতীক হওয়ার একটা কারণ এই যে, নারীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যই নাকি হযরত ঈসা (আঃ) এর মত একমাত্র (God's child) "আল্লাহর সন্তান" (নাউজুবিল্লাহ!) কে শুল বরণ করতে হলো। তাদের বিশ্বাস মতে পাপ ও ঈসা (আঃ) গুলিবিদ্ধ হওয়ার মূল কারণ নাকি নারী । মোটকথা খ্রিস্টান ধর্মে নারী সমাজকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। করা হয়েছে অপমানিত, অপদস্ত ও পদদলিত । তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস মতে, মানব জাতিকে স্বর্গ হতে পাপ পংকিল দুনিয়ায় আগমনের জন্য একমাত্র নারীই দায়ী । তারা আরো বলে, আদি মাতা হাওয়া (রাঃ) হচ্ছে শয়তান প্রবেশের দ্বার পথ ঈশ্বরের আনুগত্য ভঙ্গ করার কর্ম তিনিই সর্ব প্রথম আরম্ভ করে। সঙ্গত কারণে সকল নারী জন্ম সূত্রে পাপ কর্মের উদ্যোক্তা হওয়া স্বাভাবিক। খ্রিস্টানরা আরও বিশ্বাস করে, "নারীরা হচ্ছে শয়তানের বাহন, আর এমন বিষধর সাপ যা পুরুষকে দংশন করতে কখনো ভুল করে না।" এসব কারণে বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতায় নারী জাতির মর্মান্তিক অবস্থা দেখা দিয়েছে। এথেন্স বাসিরা হচ্ছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য প্রাচীনতম জাতি। কিন্তু তাদের বিশ্বাস নারী জাতি পরিত্যক্ত দ্রব্যসামগ্রির মতো। এবং তাদেরকে হাটে বাজারে প্রকাশ্যে বেচাকেনা করা হতো। শয়তান থেকেও নিন্দিত ছিল নারী। ঘরের কাজকর্ম সম্পাদন করা এবং সন্তান প্রসব ও লালন পালন করা ছাড়া অন্য কোন মানবিক অধিকার ও তাদের ছিল না। প্রত্যেক পুরুষ একাধিক স্ত্রী রাখতো। এমনকি নারীদের বাদ্য করা হতো একাধিক পুরুষের সাথে মিলন করার জন্য। কারন, তাদের কাছে নারী মানেই ভোগ বিলাসের পন্য । জৈন্যক পাদ্রী বলেছেন, " নারী হচ্ছে শয়তানের প্রবেশস্থল । তারা ইশ্বরের মান মর্যাদার প্রতিবন্ধক । এবং মানব সমাজের জন্য বিপদজনক । উক্ত পাদ্রী আরো বলেছেন, "নারী সব অন্যায়ের মূল। তাদের থেকে দূরে থাকাই উচিৎ। নারী হচ্ছে পুরুষের মনে লালসা উদ্রেককারী। ঘরে ও সমাজে যত অশান্তি সৃষ্টি হয়, সব নারীর কারনেই হয়। এবার অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও একটি সত্য ঘটনা উল্লেখ করতে হচ্ছে, "১৫৮৬ সালে ফ্রান্সে একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়, বহু গবেষক, স্কলার পন্ডিতরা সেই কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করে । তারা বহু আলোচনা, গবেষণা ও চিন্তা ভাবনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, নারী জন্তু নয় মানুষ। তবে তারা এমন মানুষ যে, পুরুষের কাজে চিরন্তন সেবারত থাকাই তাদের কর্তব্য। ইংরেজদের মধ্যে ১৮০৫ সাল পর্যন্ত এই আইন ছিল। এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা আপন স্ত্রীকে ও বিক্রি করে দিত। খ্রিষ্টানদের রুশ প্রবাদে বর্ণিত আছে, "(One soul in ten women) "দশটি নারীতে একটি আত্মা ।" ইটালীয় প্রবাদে বর্ণিত আছে, "ঘোড়া ভালো হোক বা মন্দ হোক মারপিটের প্রয়োজন । নারী ঘোড়ার ন্যায়, "সুতরাং তাদেরকেও ভালো হোক বা মন্দ মারপিটের প্রয়োজন । স্পেনিশ প্রবাদে

বর্নিত আছে, “কুৎসিত রমনী থেকে দূরে থাকা উচিত, আর সুন্দরী রমণীদের উপর ভরসা রাখা উচিত নয়। (তামাদ্দুনে আরব- ৩৭৮)

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! নিশ্চয়ই খ্রিস্টান ধর্মে নারী সমাজকে কতটুকু অবজ্ঞার চোখে দেখা হয় তা আর ব্যাখ্যা করার অবকাশ রাখেনা। চলুন! এখন আমরা ইয়াহুদী ধর্মে নারীর অবস্থানটা একটু পর্যালোচনা করি ।

তুমি নারী,

তোমার ভাবা উচিৎ সেই বর্বরতার যুগ থেকে

কে তোমাকে মুক্তির দিশা দিল!

ইয়াহুদী ধর্মে নারীর অবস্থান

বনী ইসরায়েল এক উশৃংখল স্বভাবের জাতি। যারা আজ সারা দুনিয়ায় বিরাজ করছে ইসলামদ্রোহী ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ভয়ংকর দুশমন হিসেবে। খ্রিস্টান ধর্মের ন্যায় এদের ধর্মে ও নারী জাতিকে সব পাপের উৎস (Roots Of All Evils) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তারা বলে থাকে, “ নারী উপেক্ষার পাত্রি।” এই কথার বাস্তবায়নে তাদের বিধর্মী যুক্তি কথা হলো, “নারীদের জীবনের স্বাধীনতা দেয়া যাবে না।” ইয়াহুদিরা আরো বলে থাকে, “এমন মানুষ কে? যে নাপাক থেকে পাক হতে পারে? যে নারী থেকে জন্ম নিয়েছে সে কিভাবে সত্যবাদী হতে পারে? অর্থাৎ নারী জাতির শিরা, উপশিরা নাপাক। নারী সত্তার মধ্যে সত্যবাদিতা বলতে নেই। এ কারণে নারী থেকে জন্ম নেয়া প্রতিটি মানুষই সত্য শূন্য- অপবিত্র। মানুষ যেহেতু নারী থেকে জন্ম নেয় তাই সে সত্যবাদী হতে পারে না। কেননা-নারীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে অসত্য অপবিত্রতার- (Contaminated Blood) কলুষিত রক্ত। ইয়াহুদী ধর্ম গুরু, উৎ. Gestatulikan বলেন, “কিতাবে মুকাদ্দাস গ্রন্থে বর্ণনা আছে, “নারী জাতি মৃত্যু হতে ও ভয়ংকর তিক্ত” । ইয়াহুদীদের প্রাচীন উপদেশ শাস্ত্রে রয়েছে, যে ব্যক্তি স্রষ্টার প্রিয় সে যেন নিজেকে নারী থেকে দূরে রাখে। “আরো বলেন, “আমি প্রতি সহস্র মানুষের মধ্যে একজন করে স্রষ্টার প্রিয় পেয়েছি। কিন্তু মহাবিশ্বের নারীদের মধ্যে একজনকেও স্রষ্টার প্রিয় পায়নি। ইয়াহুদিদের রচিত আহাদ নামায়ে আতিক নামক কিতাবে লেখা আছে, “নারীরা পণ্যদ্রব্যের ন্যায় তাদেরকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে ক্রয়- বিক্রয় করা যাবে । ইয়াহুদী ধর্মে প্রাচীন যুগ ধরে নারীকে বেচাকেনা করা হতো। তাদের প্রাচীন ধর্মীয় শাস্ত্রে ভাই মারা যাওয়ার পর ভাবিকে জোরপূর্বক বিয়ে করার শক্ত নীতি বিদ্যমান ছিল। তাতে ঐ নব-গৃহিনীর কোন মতামত গ্রহণ করা হতোনা। এবং ঐ নারীকেও কোন প্রকার মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ দিত না। তাদের মধ্যে একাধিক বিয়ের এত প্রচলন ছিল যে, যার যত খুশি বিয়ে করতে

পারতো। তাহলে বোঝা গেল ইয়াহুদীদের মন্তব্যে ও নারী সমাজ যোগ্যতাহীন। কিন্তু আজ সমস্ত বিধর্মীদের আশেপাশে ইসলামী সোনালী যুগের পতাকা উঁচু হয়ে আছে, যার ফলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা নারীদের প্রতি অমর্যাদার চোখ তুলে তাকাতে ব্যর্থ ।

তুমি নারী,

তোমার ভাবা উচিৎ তুমি কেনা-বেচার জন্য

কোনো বাজারের পণ্য না!!

বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অবস্থান

বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনার সূচনাটি করব, বৌদ্ধ শাস্ত্রের ৫৩ নাম্বার জাতক (কুণাল জাতক) নিয়ে। এই জাতকের প্রধান চরিত্র হলো কুণাল, যার মুখের নিঃসৃত বাণী থেকে আমরা বৌদ্ধ ধর্মের নারীর অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারি । কুণাল বলেন, "নারী কখনো বিশ্বাসযোগ্য নয়। নারী স্বভাবগতে বিশ্বাস ঘাতিনি। নারী কোনভাবেই প্রশংসার যোগ্য হতে পারেনা । পৃথিবী যেমন সকলের আঁধার, তেমনি নারী ও কামাচারে পাত্র-পাত্রী বিচার করে না । কুণালের মুখে উচ্চারিত হয় নীতিগাথা:

সদা রক্ত মাংস প্রিয়, কঠোর হৃদয়,

পঞ্চায়ুধ, ক্রুরমতি, সিংহ দুরাশয়।

অতিলোভী, নিত্য প্রতিহিংসা পরায়ণ,

বধি অন্যে করে নিজে উদর পুরণ

স্ত্রী জাতি তেমনি সর্ব পাপের আবাস,

চরিত্র কভু তাদের করনা বিশ্বাস ।

হ্যাঁ পুরুষের অবশ্যই কখনো নারীর চরিত্র বিশ্বাস করা উচিত নয়। শুধু কি বিশ্বাস? কুণালের মতে নারীকে বেশ্যা কুলটা বললে সব বলা হয় না। নারী প্রকৃতপক্ষে এর অধিক কিছু । নারী হলো, "উন্মুক্ত মলভান্ডারের মতো দুর্গন্ধ যুক্ত" । "বিষমিশ্রিত মদিরার মতো অনিষ্ট কারী" । 'কুটিলা সাপের মতো দুই জিব্বা বিশিষ্ট' । "পাতালের ন্যায় অতল গভীর, রাক্ষসীর ন্যায় সন্তোষহীন"। অগ্নির ন্যায় সর্বগ্রাসিনী, নদীর ন্যায় সর্ববাহিনী। বায়ুর ন্যায় যথেচ্ছা গামিনী । বিষ বৃক্ষের ন্যায় বিষফল প্রসবিনী" । নারীরা

কিভাবে মলের মত দুর্গন্ধময় তার ব্যাখ্যায় কুণাল বলেন, “নারী হলো উন্মুক্ত মল ভান্ডারের ন্যায় । উন্মুক্ত মল ভান্ডার দেখলে মাছি যেমন- সেখানে মুখ দেয় তাকে রোহিত করা কষ্টকর হয়ে যায় । কিন্তু একজন জ্ঞানী মানুষ সব সময় এই মলভান্ডারের দুর্গন্ধ উপলব্ধি করে তা এড়িয়ে চলে। তেমনিভাবে নারীরুপ অবিকল মল ভান্ডারের মাছির রূপের ন্যায়, নগ্ন প্রকৃতির পুরুষেরা তাতে ঝাঁপ দিবেই। কিন্তু একজন বিচক্ষণ বিজ্ঞ-জ্ঞানী ব্যক্তি এই উন্মুক্ত মল ভান্ডার রূপ নারীদের দুর্গন্ধ উপলব্ধি করে সদা সর্বদা তাদের সংস্রব থেকে দূরে থাকেন, ও তাদের পরিত্যাগ করে থাকেন” । (সূত্রঃ বৌদ্ধ শাস্ত্রে পুরুষতন্ত্র । নারীরা হলো উন্মুক্ত মলের মতো দুর্গন্ধযুক্ত।

একদিন বৌদ্ধের এক শিষ্য গৌতম বৌদ্ধ কে জিজ্ঞেস করল যে, “পশুপাখি মারা ওভক্ষণ করা মহাপাপ। তবে নারী জাতির উপর কেমন ব্যবহার করতে হবে? গৌতম বৌদ্ধ উত্তর দিল, নারীর প্রতি সুন্দর দৃষ্টি দেওয়া মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থী। এভাবে অন্য এক সময় বলেছে যে, নারীদের সাথে কখনো মেলামেশা বা অনুরাগ রেখো না। তাদের সাথে আবেগের কথাবার্তা ও বলিও না। পুরুষের জন্য নারী জাতি ভয়ংকর বিপদস্বরূপ” । গৌতম বৌদ্ধের শিক্ষার আসল মর্ম এই যে, নারীর সাথে সৎব্যবহারকারী পুরুষ পরকালের মহা মুক্তি থেকে বঞ্চিত থাকবে। গৌতমের দৃষ্টিতে নারীদের দিয়ে পুরুষের উন্নতি কখনো সম্ভব না। এ কারণেই গৌতম বৌদ্ধ বিয়ে করা থেকে বিশ্ব বাসীকে সতর্ক করেছিল। এবং সংসার ত্যাগের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে সন্নাসী হওয়ার দিকে আহবান করেছিল । আর তার আহবানের সাথে সাথেই বৌদ্ধ ধর্মের নারীরা হতাশা ও দুর্দশা উপহার পেয়েছিল। বৌদ্ধের যুক্তিকথা হলো যে, আমার প্রশ্নের উত্তর যদি সঠিক ব্যক্ত করি, তবে আমি বৌদ্ধ হিসাবে গৌরব অর্জন করতে পারবোনা । তাই হিন্দু ধর্মের অনুকরণে নারীকে পাপের প্রতীক বলতে হবে। অথচ তার মতে কোন প্রাণীকে আঘাত করা যাবে না, প্রাণী হত্যা মহাপাপ। আর প্রাণী বলা হয় যার প্রাণ আছে। এখন বৌদ্ধদের কাছে যদি প্রশ্ন করি, তোমাদের ধর্ম মতে জীবকে কষ্ট দেওয়া বা হত্যা করা বিভিন্ন মহাপাপ। আর তোমাদের ধর্মীয় গুরু কর্তৃক নারী সমাজকে যে বিভিন্ন ভাষায়, পদ্ধতিতে আঘাত করা হলো । তাদের মান মর্যাদাকে লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া হলো । তাদের মনিকোঠাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিল, তোমাদের ধর্ম মতে নারীদের কি প্রাণ নেই? যদি থাকে তাহলে নারীদের প্রতি ভালোবাসার আবেগ রাখলে পরকালের স্বর্গ লাভ করা যাবে না কেন? এটা কি স্বয়ং স্রষ্টা বলেছেন? না তাদের ধর্মীয় পন্ডিতের মনগড়া কথা? এটা নারীদের প্রতি কেমন আচরণ? এরপরে ও কি বলব ইসলাম নারীর অধিকার দেয়নি? প্রিয় পাঠক বৃন্দ এই হলো বৌদ্ধ ধর্মে নারীর প্রতি ভালোবাসা। নারীর জন্য সিলেক্টকৃত মান ও মর্যাদা। এবার আসুন হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থান নিয়ে একটু আলোচনা করি। (সূত্র : কষ্টিপাথরে নারীর সম্মান- ৮৭)

তুমি নারী,

তাই আজ তোমাকে বলছি ফিরে আস

তুমি সে পথ থেকে যেই পথ দিয়ে তুমি চলছ!!

হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থান

হিন্দু ধর্মে নারীদের অধিকারের দিকে কোন ভ্রুক্ষেপও করেনি । হিন্দু ধর্মের মত নারীদের ক্ষেত্রে কঠোর বিধান অন্য কোন ধর্মে দেয়নি । সতীদাহের মতো নির্মম অমানুষিক বিয়ে কিংবা স্ত্রী মারা যাওয়ার পর আবার বিয়ে করার অনুমতি লাভ করতে পারে কেবল পুরুষেরা। কিন্তু নারী স্বামী হারানোর পর বিয়ের তো প্রশ্নই আসেনা। বেঁচে থাকা তো দূরের কথা স্বামীর সাথে জীবন্ত দগ্ধ না হলে মৃত স্বামীর সাথে ছটফট করে পুড়ে মরতে না পারলে তার স্বর্গ লাভ হবেনা। যদি কোন নারী এই সতিদাহ হতে বেঁচেও যেত তবে ঘরে, সমাজে, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের কাছে তার কোন সম্মান থাকত না। তাকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনায় এমনভাবে বিদ্ধ করা হতো যার ফলে মনে হতো তার বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া শ্রেয় । হিন্দু সমাজে তো স্বামী সৎ হলে স্ত্রীর জীবন সুখময়, কিন্তু অসৎ হলে তার জুলুম ও নির্যাতনের হাত থেকে নারীকে মুক্তি দেওয়ার কোন পথ রাখেনি । এমনকি স্ত্রীর সাথে অসৎ আচরণ করা যে পাপ তাও বলে দেয়নি। বরং উল্টো বলা হয়েছে নারী দিন-রাতে কোন সময় স্বাধীন থাকতে পারে না। সমস্ত ক্ষমতা স্বামীর থাকবে, নারী স্বাধীন হওয়ার যোগ্য না। বাবা মেয়েকে যার সাথে বিয়ে দিবেন সেখানে আজীবন থাকতে হবে। এবং স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য কোন পুরুষের সাথে ঘর সংসার করতে পারবে না। তথা আজীবন বিধবা হয়ে থাকতে হবে। হিন্দু আইনে আছে অদৃষ্ট নরক বন্য ও বিষধর সাপ এর কোনটাই নারীর সমান ক্ষতিকর নয় । হিন্দু ধর্ম অখন্ড ভারতের এক প্রাচীন ধর্ম। যদিও এটি একটি ধর্ম কিন্তু “ (There was no prophet in this religion) ”এ ধর্মে কোন নবী ছিল না। “ (They have no heavenly book) “তাদের নেই কোন আসমানী কিতাব। যা মূলত এক ধরনের মানব রচিত ধর্ম । এ ধর্মে নারী জাতির কোন মর্যাদাই দেওয়া হয়নি। মনুসংহিতায় নারীকে দাসী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বামী যতই দুশ্চরিত্র, পর নারী আসক্ত হোক না কেন, স্ত্রী হিসেবে স্বামীকে দেবতার পদ সেবা করাই হলো একজন নারীর ধর্ম। এতেই নাকি রয়েছে নারীর মুক্তি ও স্বর্গবাস। শুধু তাই নয়, এ ধর্মে পতি-দেবতার মৃত্যু হলে তার স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় দগ্ধ হয়ে স্বর্গে বাসের সনদ নিতে হয়েছে। এটাই হলো হিন্দু ধর্মে অনুমোদনকৃত নিষ্ঠুর প্রথা । যে পৈশাচিক প্রথা সহ্য করতে না পেরে (Lord William Benting) “লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং”-১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে আইন করে এ অমানবিক প্রথাকে

নির্মূল করেছেন। তবে এখনো ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে এই অঘটন প্রতিফলন হচ্ছে বলে সংবাদ আসছে। অপরদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহু পরিশ্রম ও আন্দোলন করে বিধবা বিবাহের প্রচলন করে গেলেও হিন্দু সমাজ আজও বিধবা বিবাহ কে সহজে মেনে নিতে পারছে না। যার জন্য এখনো বাল্যবিধবাকে ও আমরণ হয়ে একাকীত্ব জীবনযাপন করতে হচ্ছে। যার পেছনে হিন্দু সমাজের নেই কোন ভ্রুক্ষেপ। সঙ্গত কারণে হিন্দু সমাজে বিধবাকে নিয়ে ঘটে চলছে বহু কলঙ্কিত ঘটনা। ধর্মের নামে মন্দিরে মন্দিরে যেসব দেবদাসী প্রথা প্রচলিত আছে, এই প্রথার অন্তরালে যেসব অসামাজিক অপকর্মের কার্যকলাপ লুকান্তরিত রয়েছে, তার বিবরণ যদি হিন্দু সমাজের সচেতন নারীরা পেতো, তাহলে হিন্দু ধর্মকে পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিত। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে নারীকে বঞ্চিত করার কুপ্রথা একমাত্র হিন্দু ধর্মেই বিদ্যমান। হিন্দু নারীরা যদি তাদের গ্রন্থের মধ্যে নারী সমাজকে নিয়ে যেসব কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য ও খারাপ কমেন্ট করা হয়েছে তা জানত, তবে এই জুলুমের নিয়মগুলো থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করত। অন্যথায় ওই ধর্মীয় রীতি নীতি গুলোকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করত । একসময় এই বর্ণিত নিয়মের প্রতি নারীরা নিন্দার ঝড় তুলেছিল । তাই হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলো নারী জাতির জন্য পড়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল । ১৯৩০ সালের হিন্দুদের এক ধর্মীয় কনফারেন্সে মূল বইয়ের লেখিকা হিন্দু ধর্মের পাণ্ডিত্য অর্জনকারী নারী বলেছিলেন যে, হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলো নারীকে কিভাবে এত নিকৃষ্ট ভাবে? কিভাবে নারীকে ধর্মীয় গ্রন্থ গুলোর মধ্যে বিশ্বাসের অযোগ্য বলে প্রমাণিত করেছে? তা ভাবতেও অবাক লাগে। তাদের ধর্মের আরো একটি শ্লোগানে বলা হয়েছে যে, যদি কোন শতবর্ষী হাজারো রচনাকার পৃথিবীর সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু নারী জাতির দোষ বর্ণনা করতে থাকে, তবুও নারীদের দোষ ত্রুটি লিখে শেষ করতে পারবে না। তারা আরো মনে করে নারী জাতির অন্তরে সর্বত্র কয়েকটি দোষ নাকি বিদ্যমান। যেমন- মিথ্যা, অহংকার, ছলনা, ধোকা চালাকি করা, কর্কশতা ও কুকর্মের লোভ। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলিম নারীদেরকে নিয়ে ইসলামের কোন গ্রন্থ, নবী, মনিষী বা বড় স্কলার এইরকম মন্তব্য না করার পরেও কিভাবে তারা বিভিন্ন রীতি নীতিতে হিন্দুদের অনুসরণ করতে চাই? যে ধর্ম নারী জাতিকে এত তুচ্ছ করেছে-বানিয়েছে তাদেরকে পাওনা প্রেমিকা রূপের প্রেমতা। সেই অবাঞ্চিত ধর্মীয় রীতি নীতি কিভাবে অনুসরণ যোগ্য হতে পারে?

সুপ্রিয় পাঠক বৃন্দ! উল্লেখিত আলোচনায় আমরা পৃথিবীতে প্রচলিত প্রথম সারির কয়েকটি ধর্ম যেমন- ইয়াহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্ট ধর্মে নারীর অধিকার ও অবস্থান সম্পর্কে সামান্য হলেও ধারণা পেয়েছি। এবার আমরা মানব জীবনের প্রতিটি সেক্টরে নারী জাতিকে ইসলামের দেওয়া অধিকার ও অবস্থান নিয়ে পর্যালোচনা করবো ইনশাআল্লাহ!

তুমি নারী,

তাই আজ তোমাকে বলছি ফিরে আস

তমি সে পথ থেকে যেই পথ দিয়ে তুমি চলছ!!

ইসলামের আলোকে নারীর অধিকারঃ

নারী অধিকার পরিভাষাটি বলতে বোঝানো হয় এক ধরনের স্বাধীনতা। যা সকল বয়সের নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। এই অধিকার হতে পারে প্রাতিষ্ঠানিক, আইনানুগ, আঞ্চলিক, কিংবা সাংস্কৃতিক দ্বারা সিদ্ধ যেকোন সমাজের আচরণের বহিঃপ্রকাশ । সীমান্ত পেরিয়ে মানচিত্রের ভিন্নতার কারণে, বিভিন্ন দেশে ও সীমান্তে এ অধিকারের বিভিন্ন সংজ্ঞা পাওয়া যায় । দেখা যায় বিভিন্ন পার্থক্য ও ভিন্নতা । কারণ, এটি পুরুষ ও ছেলেদের অধিকারের থেকে ভিন্ন । এবং এই অধিকারের সাপেক্ষে আন্দোলন কারীদের দাবি যে, নারী ও মেয়েদের অধিকার প্রচলনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দুর্বলতা রয়েছে। রয়েছে এক প্রকারের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা ও অপর প্রকারের প্রতি একধরনের উদাসীনতা। যেসব বিষয়ের ক্ষেত্রে নারী অধিকার প্রযোজ্য হয়, তা সুনির্দিষ্ট না হলেও এসব মূলত সমতা ও স্বয়ং সম্পূর্ণতা কেন্দ্রিক। যেমন- ভোটদানের অধিকার, অফিস আদালতে একসাথে কাজকর্ম করার অধিকার, শিক্ষার্জনের অধিকার, সামরিক বাহিনীতে কাজ করার অধিকার, আইনগত চুক্তিতে অংশগ্রহণের অধিকার, এবং বিবাহের অভিভাবকত্ব ও ধর্মীয় অধিকার ।

কিছু জন্ম পরিচয়ে বেড়ে ওঠা নারী ও তাদের হিতাকাঙ্খী নামের প্রগতিবাদীরা, মানবতার মুখোশ পরে, সমতার শ্লোগান তুলে, নির্দিষ্ট একটা প্লাটফর্ম দখল করে পুরুষের সমান অধিকার আদায়ের স্বপক্ষে বিভিন্ন প্রকার ক্যাম্পেইন ও কর্মশালা তৈরির কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে এটি একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে বিষয়টি নিয়ে গশ্চাত্য খুব লাফালাফি করছে।

(শারগোল করছে তথাকথিত নারীবাদীরা । যার সূত্র ধরে ইসলাম বিরোধী অপশক্তিগুলো ইসলামের উপর কালেমা লেপনের জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে। বর্তমান বিশ্বব্যাপী (Western agents) “পশ্চিমাদের এজেন্ট” কুফরি শক্তির দালালরা ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সম্প্রদায়ের তাহযীব তামাদ্দুনকে সমূলে ধ্বংস করে, মুসলিম উম্মাহকে চিরতরে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য যেসব ভয়ংকর মিশন নিয়ে ময়দানে আসছে, তাদের অন্যতম একটি হচ্ছে, (Women's Rights / Women's Freedom)

"নারী অধিকার / নারী স্বাধীনতা ” । আর এই বিষয়টির ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি? সে সম্পর্কে অনেকে অনেক ভাবেই- অনেক আঙ্গিকেই লিখেছেন। বর্তমান পশ্চাত্য এবং ইসলাম বিদ্বেষী অপশক্তি অত্যন্ত সুকৌশলে মুসলিম নারীদেরকে শিকারের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছে। তারা অঙ্কন করেছে মুসলিম পরিবারের পারিবারিক ব্যবস্থা বিলুপ্ত করার জন্য নীল নকশা। অধিকার কিংবা আর্থিক স্বনির্ভরতার টোপ- ফেলে হিজাব ও ভাষা থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্য করেছে সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র । চালিয়ে যাচ্ছে তাদের রচে নিরাপদ স্থান গৃহ থেকে মাঠে নামানোর অপচেষ্টা। বাস্তবতার মাথা স্বাথান্ধ

একদল সেকুলার বলে যাচ্ছে যে, ইসলাম নাকি নারী সমাজকে শেকল পরিয়ে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে রেখেছে। ইসলাম নাকি সরিয়ে রেখেছে নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে শত সহস্র কিলোমিটার দূরে। তাদের উপর নাকি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে যুলুমের বোঝা। নাউজুবিল্লাহ! নারী সম্পৃক্ত এক ধরনের হাজারো অভিযোগ আজ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইসলামের উপর। নামানো হচ্ছে বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মতো বিষোদগারের ঢল । (But is this the reality?) কিন্তু এটাই কি বাস্তবতা? না । বরং বাস্তবতা হলো- এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব আমরা বলব, কেবলমাত্র ইসলামই এমন দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা, যা স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে দিয়েছে নারী জাতিকে তাদের ন্যায্য অধিকার। সমাচীন করেছে সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে। আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি নারীদের সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়ে দিয়েছেন গোটা বিশ্বের বুকে। যদি আমরা ইসলামের পূর্বে আইয়ামে জাহেলিয়াত ও ইসলামের পরবর্তী সময়ে নারীদের অবস্থা ও অবস্থানের দিকে তাকাই তবে বিষয়গুলো দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

তুমি মেয়ে!!

আর সেই তুমিই সম্মানিতা তাই নিজের সম্মান হারিও না,

যুগের সাথে তাল মেলাতে যেযেও না !!

আমার প্রিয় মা ও বোনেরা একটু বোঝার চেষ্টা করুন

ইসলামে নারীর জন্মের অধিকার:

কন্যা শিশু হলেই তুমি, তেলে বেগুনে জ্বলো,

কোন পুরুষের গর্ভে তুমি, জন্ম নিয়েছ বলো?

আজকে তুমি নিজে পুরুষ, সেই অবদান কার!

নারীর পেটে জন্ম নিয়েই, ধরছো নারীর ঘাড় ।

কোন শিশুটা পুরুষ হবে, কোন শিশুটা নারী,

সৃষ্টিকর্তা ঠিক করে দেন, ঠিক করেন না নারী ।

কন্যা শিশুর দায়টা কেনো, নারীর ঘাড়ে দাও !

অত্যাচারী পুরুষ তুমি জাহান্নামে যাও ।

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজে নারীদের সামাজিক মর্যাদা তো দূরের কথা। তাদের বেঁচে থাকার অধিকার ও ছিল না । কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণের কথা শ্রবণে তাদের মুখ কালো হয়ে যেত । নিমিষেই উধাও হয়ে যেত মুখের উপর ভেসে থাকা আলোকরশ্মি । সে-ই নবাগত কন্যা সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলার জন্য সকলে এক ধরনের আয়োজনে ব্যতিবস্তু হয়ে উঠতো। এবং এই কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করতে পারাকে নিজের জন্য সম্মান, মর্যাদা, পূন্য ও গৌরবের কাজ মনে করতো। জাহেলী যুগের সে অমানবিক ও ভয়ানক কথা তুলে ধরে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

“আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়। সে থাকে দুখে ভারাক্রান্ত । তাকে যে, দুঃখের সংবাদ দেওয়া হয়েছে সে কারণে, সাম্প্রদায় থেকে আত্মগোপনে থাকে । অপমান সত্বেও কি একে রাখবে? না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? শুনে রাখ, ওরা যে ফয়সালা করে তা খুবই নিকৃষ্ট” (সূরা নাহাল,আয়াত ৫৮-৫৯)

ইসলাম পূর্বে আরব সমাজে নারীর অবস্থা এমনই মূল্যহীন ছিল। ইসলাম আসার পর নারীর প্রতি অবহেলা, অবমূল্যায়ন, অমানবিকতা সবকিছু বিদূরিত করে মান মর্যাদায় তাদেরকে করে তুলল আকাশচুম্বী। অথচ আমরা ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই যে, সেসব ধর্মে নারী জাতিকে কোন ধরনের মূল্যায়ন করা হয়নি। দেওয়া হয়নি তাদেরকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা। সেসব ধর্মে নারীর অবস্থান নিয়ে আমি আগেই আলোচনা করেছি । একমাত্র ঐশী ধর্ম ইসলাম এসে ধাপে ধাপে নারী জাতিকে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, সম্মান ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন । এবং সম্মানের সর্বোচ্চ মাকামে সমোচিত করেছেন । যে সমাজে নারীর জন্মই পাপ ছিল, সে সমাজে ইসলাম সর্বপ্রথম নারী জন্মের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এবং নারী সন্তানকে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে,

কী অপরাধে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল?

“আর স্মরণ করো সেই দিনের কথা যখন জীবন্ত কবরস্থ করা কন্যা সন্তানকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে? । (সূরা আত তাকভীর, আয়াত ৮-৯)

আরবে প্রথা ছিল, পিতা নিজ কন্যাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্দয়ভাবে জীবন্ত-প্রোথিত করে ফেলত। কেউ কেউ দারিদ্র ও বিয়ে-শাদির খরচাদির ভয়ে এই কাজ করত । আর কতক এ বিষয়টিকে লজ্জাস্কর মনে করত যে, কারো কাছে মেয়ে বিয়ে দিলে তাকে আমার জামাই বলা হবে! পবিত্র কুরআন অবহিত করল যে, সেই মজলুম শিশু-কন্যাদের সম্বন্ধেও জিজ্ঞেস করা হবে- কোন অপরাধে তাদের হত্যা করেছিল । আমাদের সন্তানাদি বলে আমাদের যা ইচ্ছা, তাই করব- এই মনে করলে চলবে না। বরং আপন সন্তান হওয়ার কারণে অপরাধ আরো বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। (তাফসীরে উসমানী)

তুমি নারী,

তোমার অধিকার আছে,তাই বলে কি

অর্ধ উলঙ্গ হয়ে রাস্তাঘাটে বেহায়ার মত চলবে!?

ইসলামে, (মা) হিসেবে নারীর অধিকারঃ

পৃথিবীতে সবচেয়ে মধুর শব্দটি হচ্ছে মা। কবির ভাষায়, “যেখানে দেখি যাহা, মায়ের মত আহা, একটি কথায় এত শুধা মেশা নাই” । জগৎ সংসারের শত দুঃখ-কষ্টের মাঝে যে মানুষটির একটু সান্তনা আর স্নেহ-ভালোবাসা আমাদের সব বেদনা দূর করে দেয়, তিনি হলেন মা । পৃথিবীতে যত ভালবাসা আছে সব- ভালোবাসা স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ । শুধুমাত্র মা-বাবার ভালোবাসায় নিঃস্বার্থ। মায়ের চেয়ে আপনজন পৃথিবীতে আর কেউ নেই। প্রতিটি মানুষ পৃথিবীতে আসা এবং বেড়ে ওঠার পেছনে প্রধান ভূমিকা একমাত্র মায়ের। মায়ের তুলনা অন্য কারো সঙ্গে চলেনা। মায়ের সঙ্গে সন্তানের নাড়ির সম্পর্ক; যা একটুখানি আঘাত পেলেই সবাই ‘মা' বলে চিৎকার করে জানান দিয়ে থাকে। ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে সবার কাছে তার মা অতি মূল্যবান হয়ে থাকে। শুধু মানুষ কেনো? পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীই তার মায়ের কাছে

ঋণী। সে ঋণ শোধ করার কোন যথাযথ উপকরণ আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় সৃষ্টি করেননি। মা সন্তানের জন্য যে ত্যাগ তিতিক্ষার নজির স্থাপন করে, তার কোন তুলনা হয়না- হয়না কোন উদাহরণও। সন্তানের জন্য তুলনামূলক ভাবে মা-ই বেশি ত্যাগ স্বীকার করে থাকে । গর্ভধারণ, দুগ্ধপান, রাত জেগে সন্তানের তত্ত্বাবধানসহ নানাবিদ কষ্ট একমাত্র মা-ই সহ্য করেন। আল্লাহ রাবুবল আলামীন কুরআন কারীমে এরশাদ করেন,

"আমি মানুষকে মা-বাবার সঙ্গে সদাচারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতি কষ্টে গর্ভধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুগ্ধপান ছারানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে, এবং বছরে বছরে উপনীত হয়, তখন বলে, হে আমার রব! আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার ও আমার মা-বাবার ওপর যে নেয়ামত দান করেছো, তার যেন কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি । আমি যেন ভাল কাজ করতে পারি, যা তুমি পছন্দ করো । আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে তওবা করলাম । আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত"। (সূরা আহকাফ, আয়াত ১৫)

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাআলা নিজ হকের সঙ্গে মাতা পিতার হক বর্ণনা করেছেন । কেননা, প্রকৃত অস্তিত্বদানকারী তো আল্লাহই, কিন্তু উপায়-উপকরনের জগতে মাতাপিতাই সন্তানের অস্তিত্বের বাহ্যিক কারণ এবং তারা আল্লাহ তায়ালার 'শানে রুবুবিয়্যতের' বিশেষ প্রকাশস্থল হয়ে থাকে। এখানেও প্রথমেআয়াতে আল্লাহ তায়ালার হক সমূহের কথা উল্লেখ ছিল । আলোচ্য আয়াতে মাতা পিতার হক বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, সে যেন, মাতা পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে এবং তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা, মহব্বত ও খেদমতকে নিজের সৌভাগ্য মনে করে ।

অন্যত্র (লুকমান : ১৫) বলা হয়েছে, যদি মাতা পিতা মুশরিক হয়, তবুও তাদের সঙ্গে দুনিয়াতে সদ্ব্যবহার করতে হবে, বিশেষত মায়ের সেবা সুশ্রজা । কেননা, কয়েক কারণে মাতার হক পিতার ঊর্ধ্বে, যেমন বিভিন্ন হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থাৎ গর্ভ যখন কয়েক মাসের হয়ে যায়, তখন তার ভার অনুভূত হতে থাকে। এ অবস্থায় এবং প্রসবের সময় মাতা কত কষ্ট ই না সহ্য করে। এরপর শিশুকে স্তন্যপান করায় এবং একাধারে কয়েক বছর তার সব রকমের সেবা যত্ন করে। নিজের আরাম- আয়েশকে সন্তানের জন্য উৎসর্গ করে দেয়। পিতা ও বিভিন্নভাবে এসব কষ্টের ভাগী হয় এবং সন্তান লালন-পালনের উপকরণের ব্যবস্থা করে।

অবশ্যই এসব কাজ স্বভাবের তাড়নায় হয়ে থাকে বটে। কিন্তু এই মানব স্বভাবেরই দাবি, সন্তান যেন মাতা পিতার উক্ত স্নেহ-মমতাকে উপলব্ধি করে এবং তাদের পরিশ্রমের ও স্বীয় আরামের চেয়ে সন্তানের আরাম কে অগ্রগণ্য রাখার যে চেষ্টা, তার মূল্যায়ন করে।

বি.দ্র. হাদিসে (বুখারী : ৫৯৭১) মায়ের খেদমতের ব্যাপারে তিনবার নির্দেশ দান করে পিতার খেদমতের নির্দেশ একবার দেওয়া হয়েছে । আরো উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে পিতার উল্লেখ মাত্র একবার শব্দের মধ্যে করা হয়েছে, কিন্তু মায়ের উল্লেখ তিন শব্দে তিনবার করা হয়েছে।

সম্ভবত অধিকাংশ ক্ষেত্রের হিসাবে ত্রিশ মাসের কথা বলা হয়েছে। হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'ছেলে যদি হৃষ্টপুষ্ট হয়, তবে তার দুধ ছাড়তে একুশ মাস এবং মাতৃগর্ভে নয় মাস, মোট ত্রিশ মাস সময় লাগে' ।

অথবা এরূপ বলা যায়, মাতৃগর্ভে কমপক্ষে ছয় মাস এবং দুধ ছাড়াতে সাধারনত দুই বছর, সর্বোমোট ত্রিশ মাস দুধপানের সময় এর চেয়ে বেশি কদাচিৎ হয়ে থাকে । চল্লিশ বছর বয়সে সাধারন মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও নৈতিক শক্তি পরিপক্ব হয়ে যায়। এজন্যই আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে নবুয়াত চল্লিশ বছরের পূর্বে দান করা হতো না ।

অর্থাৎ সৌভাগ্যবান ও নেক মানুষের স্বভাব এই যে, তার প্রতি এবং তার মাতাপিতার প্রতি আল্লাহ তায়ালার যেসব অনুগ্রহ হয়েছে, সে আল্লাহর কাছে সেসবের শোকর আদায় করার তাওফিক চায় এবং ভবিষ্যতে নেক আমল করার তাওফিকও প্রার্থনা করে । অধিকন্তু নিজের সন্তানসন্ততির জন্যও নেকীর দোয়া করে । আর আল্লাহর হক ও বান্দাদের হক আদায়ে যে ত্রুটি হয়েছে, তা থেকে সে তওবা করে এবং বিনীতভাবে নিজ দাসত্ব ও আনুগত্য প্রকাশ করে।

বি. দ্র. সাহাবা (রা) আনহুমের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এ কারণে বড় সৌভাগ্যবান ছিলেন যে, স্বয়ং তিনি, তার মাতাপিতা ও সন্তান-সন্ততি ঈমানের সাথে নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবত লাভ করেন। সাহাবিদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আর কারো ভাগ্যে জুটেনি ।

তুমি নারী,

তোমার অধিকার আছে, তাই বলে কি

পুরুষের মত শার্ট প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াবে!!

ইসলামে মায়ের মর্যাদা অতুলনীয়

ইসলাম ধর্মে মাকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছে। করা হয়েছে তার মর্যাদাকে মহিমান্বিত । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

“আমি মানুষকে তার মা-বাবার সঙ্গে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে গর্ভধারন করে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। সুতরাং আমার শুকরিয়া ও তোমার মা-বাবার শুকরিয়া আদায় কর। (সূরা লোকমান, আয়াত ১৪) বিশ্ব মানবতার অগ্রদূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বোঝা গেল, মায়ের হক বাপের চেয়েও বেশি । কেননা তিনি কয়েক মাস ধরে সন্তানের ভার পেটে বহন করেছেন। তারপর প্রসবের পর দুই বছর পর্যন্ত দুগ্ধ পান করিয়েছেন । এ সময়ের মধ্যে আরও কত রকম কষ্ট ক্লেশ সহ্য করে শিশুকে লালন -পালন করেছেন । নিজ আরাম তার আরামের জন্য বিসর্জন দিয়েছেন । সেজন্য মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, সে যেন প্রথমত আল্লাহ তাআলার এবং দ্বিতীয়ত মাতাপিতার, বিশেষত মায়ের হক সম্বন্ধে সচেতন হয় । অর্থাৎ সে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে এবং মাতাপিতার খেদমত ও অনুগত্যে যথাসম্ভব রত থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহর নাফরমানি হয়। কেননা, আল্লাহ তাআ'লার হকই অগ্রগণ্য এবং তাঁরই সামনে সকলকে হাযির হতে হবে । মানুষের মনে মনে চিন্তা করা উচিত, কোন মুখ নিয়ে তাঁর নিকট যাব। বি, দ্র, দুগ্ধপানের বয়স যে এখানে দুই বছর বলা হয়েছে, এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ও সাধারণ নিয়ম হিসাবে (কোন ক্ষেত্রে এর আগে দুধ ছাড়ানো হলে তারও অবকাশ আছে) আর ইমাম আবু হানীফা (র) যে বেশির পক্ষে আরাই বছর বলেন, তো তাঁর নিকট অন্য কোনো দলীল থেকে থাকবে। তবে অধিকাংশ ইমামদের নিকট দুগ্ধপানের সর্বোচ্চ সময় দু' বছরই। আল্লাহই ভাল জানেন । (তাফসীরে উসমান)

“মা-বাবাই হলো তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম” । (ইবমে মাজাহ, হাদিস ৪২১)

আরো বলেন, 'যখন কোন অনুগত সন্তান নিজের মা-বাবার দিকে অনুগ্রহের নজরে দেখে, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে হজ্বের সওয়াব দান করেন'। (বায়হাকি, হাদিস ৪২১)

মা হিসেবে ইসলামে একজন নারীর অবস্থান অকল্পনীয়। ইসলামে বাবার চেয়ে মায়ের মর্যাদা তিনগুণ বেশি। পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মায়ের কথা আলাদা ভাবে উল্লেখ করে মাকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। যেমন- আল্লাহ বলেন,

“তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তার সঙ্গে কাউকে শরীক করোনা । এবং পিতামাতা, আত্মীয় - স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট - প্রতিবেশী, দূর - প্রতিবেশী, সঙ্গী সাথী, মুসাফির ও তোমাদের

অধিকারভুক্ত দাস - দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে। (সূরা নিসা, আয়াত ৩৬)

একবার এক লোক এসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহর রাসুল! আমার থেকে সদাচরন পাওয়ার সর্বাধিক অধিকার কার? তিনি বললেন, "তোমার মায়ের। সে আবার ও প্রশ্ন করল অতঃপর কার? তিনি দ্বিতীয় বার ও উত্তর দিলেন, "তোমার মায়ের। সে আবার ও প্রশ্ন করল, অতঃপর কার? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, "তোমার মায়ের। সে আবারও একই প্রশ্ন করল, অতঃপর কার হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? রাসুল চতুর্থ বারে বললেন, "তোমার পিতার"। (বুখারী, হাদিস ৫৬২৬) উক্ত হাদিস শরীফ দ্বারা স্পষ্ট প্রতিয়মান হল, বাবার চেয়ে মায়ের অধিকার তিন গুণ বেশি। মায়ের এই মর্যাদা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক নবীদের যুগে সংরক্ষণ করেছেন। যেমন ছোট বেলায় হজরত ঈসা আলাইহিমুসসালাম-এর মুখে আল্লাহ তায়ালা ভাষা ফুটিয়ে দিলে তিনি বলেছিলেন, "আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করি, (অনুগত ও বাধ্য থাকি) আমাকে করা হয়নি উদ্ধত অবাধ্য ও দুর্ভাগা হতভাগ্য" । (সুরা মারিয়াম, আয়াত ৩০-৩২) বনী ইসরাইলের নবী হজরত মুসা আলাইহিমুসসালাম-এর প্রতিও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। যেমন- আল্লাহ বলেন, "আমি বনী ইসরাইলের থেকে এ অঙ্গিকার নিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে"। (সুরা বাকারা, আয়াত ৮৩)

একজন মা সন্তানের কাছে কেবলমাত্র সম্মানের পাত্র তা না । বরং মা সন্তানের সম্পদের অধিকারী ও উত্তরাধিকারিনীও । তার যাবতীয় ব্যয়ভার, খোরপোষ ও দেখভাল সন্তানের ওপর আবশ্যক । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "মৃতের সন্তান থাকলে পিতা মাতার জন্য (সন্তানের) সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ; আর সন্তান না থাকলে পিতা মাতাই ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হবে। এমতাবস্থায় মায়ের জন্য এক-তৃতীয়াংশ" । (সুরা নিসা,আয়াত ১১)

আমাদের বর্তমান আধুনিক যুগে একটা পশ্চিমা সংস্কৃতি হচ্ছে, মা-বাবা বৃদ্ধা হয়ে গেলে তাদেরকে ঘরে রাখা হয়না, বরং তাদের বসবাসের জন্য সিলেক্ট করা হয় (Old age homes invented by Westerners) "পশ্চিমাদের আবিষ্কৃত বৃদ্ধাশ্রম"-কে । কিন্তু এখানে ইসলামের সৌন্দর্য কি দেখেন, "কুরআন ও হাদিসের মধ্যে সবসময় মা- বাবার সেবা-যত্নের কথা তুলে ধরে গোটা বিশ্বের সন্তানদেরকে মা-বাবার সেবা-যত্নের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে বৃদ্ধাবস্থায় কেননা, বৃদ্ধা হয়ে গেলে সাধারনত

সন্তানের সেবার ওপর মা-বাবা বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ সময় মায়ের সুবিধা- অসুবিধাও প্রয়োজনের প্রতি খুব যত্নশীল ও দায়িত্বশীল হওয়া কর্তব্য। একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সে দুর্ভাগ্য! সে দুর্ভাগ্য! সে দুর্ভাগ্য! উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল সে কে? প্রতোত্তরে তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি মাতা পিতা উভয়কে অথবা যেকোন একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও (তাদের সেবা করে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না"। (মুসলিম,হাদিস ৬২৭৯) হাদিসটি কতইনা চমৎকার তাইনা? সত্যি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি বানী হিরা মুক্তার চেয়েও মূল্যবান। মায়ের সেবা করা, মায়ের যত্ন নেওয়া এবং মাকে খুশি করার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে"। (কানজুল উম্মাল, হাদিস ৪৫৪৩৯) বিশিষ্ট তাবীঈ- হযরত উয়াইস আল কারনিকে কে না চিনে? তিনি ইয়ামেনের অধিবাসী একজন যুগশ্রেষ্ঠ বড় মাপের বুজুর্গ ছিলেন। তিনি ৩৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি তার । কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা ছিল । তার বৃদ্ধ মা ছিলেন, মায়ের সঙ্গে তিনি সদাচরন করতেন। মায়ের সেবা-যত্নের কারনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়নি। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে চিনতেন। হাদিস শরীফে এসেছে, হজরত উমর (রাঃ) বলেন, "রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "ইয়ামেন থেকে উয়াইস নামে এক ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে। ইয়ামেনে মা ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই । তার শরীরে শ্বেত রোগ ছিল । সে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে, আল্লাহ তার রোগ ভালো করে দেন। কিন্তু তার শরীরের একটি স্থানে এক দিনার অথবা এক দিরহাম পরিমান স্থান শ্বেত অবস্থায় থেকে যায় । তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাঁর সাক্ষাৎ পেয়ে যায়, সে জেন তাকে নিজের জন্য ইস্তেগফার করতে বলে" । (মুসলিম, হাদিস ২৫৪২) মা-বাবার সেবা যত্নের প্রতি গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ তা'য়ালা নিজের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই উল্লেখ করেছেন, মাতা পিতার অধিকারের কথা। কুরআনে উল্লেখ হয়েছে, "তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না । এবং মাতা পিতার সঙ্গে সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটি ও বলো না। এবং তাদেরকে ধমক দিওনা। তাদের সঙ্গে আদবের সাথে কথা বলো। (সুরা বনী ইসরাইল, আয়াত ২৩) আরেক হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তা'য়ালা মায়ের অবাধ্য হওয়াকে তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন"। (মুসলিম, হাদিস ৪৫৮০)

ইসলামে (কন্যা) হিসাবে নারীর অধিকার

সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে এটা নির্ধারণ করেন সকল সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা । তিনি যাকে চান ছেলে দান করেন। যাকে চান মেয়ে দান করেন। আবার যাকে চান ছেলে মেয়ে উভয় ধরনের সন্তান দান করেন। আবার কাউকে কাউকে নিঃসন্তান ও রেখে দেন। সুতরাং, নিঃসন্তানের তুলনায় কন্যা সন্তানের অবিভাবকগণ যে কত অকল্পনীয় মর্যাদার অধিকারী, ও কন্যা সন্তান যে সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান তার দিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনুল কারিমে পুত্রের পূর্বে কন্যা সন্তানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ রাবুবল আলামীন বলেন, "নভোমণ্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহ তা'আলারই তিনি যাকে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন"। (সুরা শূরা, আয়াত ৪৯) এখানে পুত্রের পূর্বে কন্যাকে উল্লেখ করার কারণ হিসেবে আল্লামা আলূসী (রহঃ) তাঁর তাফসীরে কতিপয় মত উল্লেখ করেছেন । তন্মধ্যে থেকে দুটি মত হলো- (এক) তিনি তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেন যে, নারীদের দুর্বলতার ভিত্তিতে তাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য প্রকাশের জন্য তাদেরকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর বিশেষ করে তারা একসময় জীবন্ত কবরস্থ হওয়ার নিকটতম যুগে ছিলেন । (দুই) তাদের পিতাদেরকে সান্ত্বনা প্রদানের নিমিত্তে- তাদেরকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে- কেননা, তাদেরকে শুরুতে উল্লেখ করা তাদের সম্মানের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর নামান্তর । আর তারা সম্মানের উপযুক্ত হওয়ার কারণ হলো, "নিশ্চয়ই তারা মহান আল্লাহ তায়ালার মাখলুক (বান্দা-বান্দি) বৃদ্ধির মাধ্যম। (তাফসীরে রুহুল মা'আনী ২৫/৫৪) ইমাম ইবনুল কাইয়ুম (রহঃ)এ ব্যাপারে উক্ত দুটি মত উল্লেখ করার পর লিখেন, "আমার নিকট আরো একটি কারণ ফুটে ওঠে, তা হলো- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঐ সত্তাকে পূর্বে উল্লেখ করেন, যে-সত্তা (নারীদেরকে) জাহেলি যুগের সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠী পশ্চাত্যে রাখত । যেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন বর্ণনা দেওয়া যে, তোমাদের নিকট পরিত্যক্ত সেই তুচ্ছ সত্তা আমার নিকট বর্ণনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। (তুহফাতুল মাওলুদ, ২৭)

বিশ্ব মানবতার অগ্রদূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জীবনী অধ্যায়ন করলে পাওয়া যায়, তিনি মেয়েদের অনেক বেশি সোহাগ করতেন। মেয়েরা ছিল তাঁর আদরের দুলালী ও নয়নের মনি। তিনি নিজেও ছিলেন চারজন কন্যা সন্তানের বাবা । তিনি তাঁদের ভরণপোষণ থেকে শুরু করে প্রতিটি সেক্টরে উচ্চ সম্মান ও অগ্রাধিকার দিয়ে আজীবন ভালোবেসে গেছেন। এবং কন্যা সন্তান প্রতিপালনের প্রতি অন্যদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। সেই সাথে গোটা বিশ্বের মানব সম্প্রদায় যেন কন্যা সন্তান লালন-পালনের প্রতি উৎসাহিত ও উজ্জীবিত হয়, সেই প্রত্যাশায় চিরন্তন সত্য বাণী হাদিস শরীফে তার বর্ণনা দিয়ে ভরপুর করে রেখেছেন। যে হাদিসগুলো একত্রিত করলে অনেক বড় পুস্তিকা হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ সেসব হাদিসের ভান্ডার থেকে কয়েকটি হাদিস তুলে ধরলাম।

(এক) বিশ্ব মানবতার অগ্রদূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হযরত আনাস (রাঃ)থেকে বর্ণনা "যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তানকে তারা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কিয়ামতের দিন আমি এবং সে এই দু'টি আঙ্গুলের মতো পাশাপাশি আসবো। (অতঃপর তিনি তার আঙ্গুলগুলি মিলিত করে দেখালেন।) (মুসলিম, হাদিস ২৬৩১/তিরমিজি, হাদিস ১৯১৪) (দুই) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যার ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল, অতঃপর ঐ ব্যক্তি সে কন্যা সন্তানকে কষ্ট দেয় নি, মায়ের উপর ও অসন্তুষ্ট হয়নি-এবং পুত্রসন্তানকে তার ওপর প্রাধান্য দেয়নি । তাহলে ঐ কন্যার কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে

জান্নাতে প্রবেশ করাবেন” । (মুসনাদ আহমদ, হাদিস ১/২২৩) (তিন) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “ঐ নারী বরকতময়ী ও সৌভাগ্যবান, যার প্রথম সন্তান মেয়ে হয় । কেননা, (সন্তানদানের নেয়ামত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে) আল্লাহ তাআলা মেয়েকে আগে উল্লেখ করে বলেন, তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন” । (কানযুল উম্মাল, হাদিস ১৬/৬১১) (চার) উম্মুল মু'মিনিন আম্মাজান হযরত আয়শা (রাঃ) বলেন, “আমার কাছে এক নারী এলো। তার সঙ্গে ছিল তার দুইটি মেয়ে। আমার কাছে সে কিছু প্রার্থনা করলো । কিন্তু আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া কিছুই ছিল না । আমি তাকে সেটি দিয়ে দিলাম। সে তা গ্রহণ করল। এবং তা দুই টুকরো করে তার দুই মেয়ের মাঝে ভাগ করে দিল । তা থেকে সে নিজে কিছুই খেলনা । অতঃপর নারীটি ও তার মেয়ে দু'টি উঠে পরল এবং চলে গেলো। ইত্যবসরে আমার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। আমি তার কাছে ঐ নারীর কথা বললাম। তিনি বললেন, “যাকে কন্যা দিয়ে কোন কিছুর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়, আর সে তাদের প্রতি প্রতি যথাযথ আচরণ করে, তবে তা তার জন্য সে কন্যা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী হবে” । (মুসলিম, হাদিস ৬৮৬২, মুসনাদ আহমদ, হাদিস ২৪৬১৬) (পাঁচ) হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “কারও যদি তিনটি মেয়ে কিংবা বোন থাকে অথবা দু'টি মেয়ে বা বোন থাকে, আর সে তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাদের সঙ্গে সদাচরণ করে, তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে” । (মুসনাদ আহমদ, হাদিস ১১৪০৪) (ছয়) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যার তিনটি কন্যা সন্তান থাকবে এবং সে তাদের কষ্ট-যাতনায় ধৈর্য ধরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে” । (মুহাম্মদ ইবনে ইউনূসের বর্ণনায় এ হাদিসে অতিরিক্ত অংশ হিসেবে এসেছে) এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি দু'জন হয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দু'জন হলেও । লোকটি আবার প্রশ্ন করলো, যদি একজন হয় হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, একজন হলেও। (বাইহাকি,শুয়াবুল ঈমান, হাদিস ৮৩১১) (সাত) হযরত আউফ বিন মালেক আশজায়ি (রাঃ) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে রয়েছে, যাদের ওপর সে অর্থ খরচ করে, বিয়ে দেওয়া অথবা মৃত্যু পর্যন্ত। তবে তারা তার জন্য আগুন থেকে মুক্তির কারণ হবে। তখন এক নারী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আর দুই মেয়ে হলে? তিনি বললেন, দুই মেয়ে হলেও। (বাইহাকি, শুয়াবুল ঈমান, হাদিস ৮৩১৩)

উল্লিখিত হাদীস শরীফ গুলো থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয়, কন্যা সন্তানের বাবা/অভিভাবক হলে তিনটি লাভ। এক) আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন। দুই) জান্নাত দান করবেন, যা চূড়ান্ত নিয়ামত ও আরাম-আয়েশের স্থান । তিন) আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য দান করবেন যে নিয়ামতের কোন তুলনা হয়না, যা সফলতার সর্বোচ্চ চূড়া।

তুমি নারী,

তোমার অধিকার আছে,তাই বলে কি

নিজের দেহটাকে বেগানা পুরুষদেরকে দেখাবে!!

ইসলামে, (বোন) হিসাবে নারীর অধিকার

মানুষ সামাজিক জীব, সমাজ ও সভ্যতার "প্রাথমিক ইউনিট" হচ্ছে পরিবার । সাধারণত একটি পরিবারে একসঙ্গে বসবাস করে থাকেন, মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী সহ প্রভৃতি রক্ত ও বৈবাহিক সম্পর্ক (Relative's) "আত্মীয়-স্বজন" । এদের পরস্পরের মধ্যে রয়েছে "বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য" । রক্ত সম্পর্কীয় একান্ত আপনজনের মধ্যেই ভাই-বোনের সম্পর্ক হলো, সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও মাধুর্য। "ভাই বোন মানে, এমন এক অদ্ভুত মধুর সম্পর্ক, যার মধ্যে হাজার ঝগড়া অভিমানের পরেও ফাটল ধরে না"। "ভাই-বোনোর সম্পর্ক মানেই শত রাগ-অভিমানের পরেও কথা না বলে থাকতে না পারা"। অতুলনীয় এই মধুর সম্পর্ককে আরো ডেডিকেট করে তুলে, আনলিমিটেড ঝগড়া, আনলিমিটেড কেয়ারিং, আনলিমিটেড ভালোবাসা" । পৃথিবীতে একমাত্র ধর্ম ইসলাম। যে কিনা এই ভালোবাসার বন্ধনকে সুদৃঢ়-মজবুত করতে উৎসাহিত করার সাথে সাথে এটাকে অনাদী ও চিরস্থায়ী স্থান জান্নাত পর্যন্ত বিস্তৃত করার তরে বেশ কিছু উপকরণ ও উপাদান স্থির করার পাশাপাশি, বোনদের দায়িত্ববোধ ভাইদের উপর ন্যস্ত করেছেন । যেমন- জন্মসূত্রে একজন সন্তানের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন ইসলাম, বাবা নামের সেই বটবৃক্ষের ছায়ার উপর। কিন্তু নিয়তির লিখন ও রবের ইচ্ছায় কোন কোন সন্তান অসময়ে সেই বটবৃক্ষের ছায়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। পিতৃহীন হয়ে এতিমের বেদনাদায়ক তিক্ত স্বাদ তাদেরকে গ্রহন করতে হয়। ঠিক এই সময়ে একটা মেয়ের অভিভাবক হিসেবে পিতার অবর্তমানে দায়িত্ব অর্পণ করে ইসলাম ভাই নামের সেই শান্তির আশ্রয়স্থলের উপর। বোনের লালন-পালন, ভরনপোষণ থেকে শুরু করে সেবাশুশ্রূষা পর্যন্ত একজন ভাইয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়ায়। বাবার অপারগতা ও অবর্তমানে বোনের লালন পালন-ভরন পোষন, উপযুক্ত পাত্র দেখে বিয়ে দেওয়া ভাইদের উপর একান্ত দায়িত্ব । বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যার তিনটি মেয়ে রয়েছে, বা তিনজন বোন রয়েছে, অতঃপর সে তাদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করে ও উত্তম পাত্র দেখে বিয়ে দেয়, এবং তাদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত" (তিরমিজি, হাদিস ১৯১৬)

অন্যত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার সারমর্ম হচ্ছে, "ভাইদের কর্তব্য হলো, বোনদের দায়িত্বের প্রতি সর্বদা সচেষ্ট হওয়া। সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় বোনদের পাশে থাকা। বিশেষভাবে বাবার অপারগতা বা তার অবর্তমানে বোনের লালন-পালন, উপযুক্ত পাত্র দেখে বিয়ে দেওয়াও ভাইয়ের দায়িত্ব। (বুখারী, হাদিস ৫১৩০)

তুমি নারী,

তোমার অধিকার আছে,তাই বলে কি

পরপুরুষের হাত ধরে পার্কে পার্কে ঘুরে বেড়াবে!!

ইসলামে, বোনের সন্তুষ্টি ছাড়া তাকে বিয়ে বা তালাকে বাধ্য করা যাবেনা

অনেক মেয়েরা আছে-যারা স্বামীর অমানুষিক নির্যাতনের শিকারে অতিষ্ঠ হয়ে আশ্রয়ের জন্য ভাইয়ের বাড়িতে চলে আসে। কিন্তু অনেক ভাইয়েরা স্বামীর অব্যাহত নির্যাতনের পরেও ভরণ পোষণের ভয়ে স্বামীর বাড়িতে জোর করে পৌঁছে দিয়ে থাকে। কোনো কোনো পরিবার মেয়েদের দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত রাখে। আবার অনেকে তালাকের পরেও তাদের সম্পর্ক পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইসলামি

দৃষ্টিকোণ থেকে এসব বিষয়ে বোনের উপর বল প্রয়োগের অধিকার ইসলাম ভাইকে দেয়নি। প্রায় দেখা যায়, তালাক প্রাপ্তা বোনেরা ভাইয়ের সংসারে অবঙ্গা ও নিগ্রহের শিকার হয়। তাদের ঈমান নিয়ে প্রশ্ন উঠাই স্বাভাবিক। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "(তালাক ও ইদ্দতের পর) পূর্ব স্বামীদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুসারে বিয়ে করতে তাদের বাধা দিওনা। এই উপদেশ তাকেই দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে। (সুরা নিসা, আয়াত ২৩২)

ইসলামে, "স্ত্রী" হিসেবে নারীর অধিকারঃ

নারীর জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ গুলির মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে, স্ত্রীর আসন। ইসলাম নারী জাতি/সমাজকে অপমান ও অবহেলার অতল গহ্বর থেকে উত্তরন করে স্ত্রীর মর্যাদায় করেছে অধিষ্ঠিত । অথচ জাহেলি সমাজ মনে করতো, নারী মানে হাতের পুতুল, অনিবার্য পাপ ও ভোগ-বিলাসের পণ্য। তারা মনে করতো শয়তান যত পাপ কাজ সম্পাদন করে, অপকর্মের জন্য মানবজাতিকে উদ্বুদ্ধ করে, তা সব নারীর মাধ্যমে । অপরদিকে ইসলাম নারীকে মর্যাদা দিয়েছে, প্রেয়সী, শ্রেয়সী ও মহীয়সী হিসেবে। সম্মানের পাত্র বানিয়েছে জন্মসূত্রে। করেছে পুরুষের সহধর্মিনী। নির্ধারণ করেছে

পুরুষের চরিত্র রক্ষার অত্যন্ত দৃঢ় ঢাল ও অবৈধ সম্পর্ক থেকে রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। যেমন- বিশ্ব মানবতার মুক্তির অগ্রদূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ের সামর্থ্য রাখে তারা যেন বিয়ে করে নেয়। এবং যারা বিয়ের সামর্থ্যহীন তারা যেন রোজা রাখে। এই রোজা তাদের যৌগিক চাহিদা কন্ট্রোলের জন্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে"। (বুখারী শরীফ, হাদিস ৫০৬৫)

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! উক্ত হাদিসের প্রথম অংশে যুবকদের এই প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয়েছে যে, একমাত্র বিয়ের মাধ্যমে দৃষ্টির সংরক্ষণ ও চরিত্রের পবিত্রতা বজায় রাখা সম্ভব। অন্যত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "বান্দা যখন বিয়ে করে, তখন সে তার অর্ধেক ঈমান (দ্বীন) পূর্ণ করে। অতএব বাকি অর্ধেকাংশে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে" । (আল জামিউস সগীর, হাদিস ৬১৪৮)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে অন্য একটি বর্ণনায় আসছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ যাকে পূর্ণময়ী স্ত্রী দান করেছেন, তাকে তার অর্ধেক দ্বীনে সাহায্য করেছেন, সুতরাং বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে তার জন্য উচিত আল্লাহকে ভয় করা" । (তাবরানী ৯৭২/হাকেম ২৬৮১/বাইহাকী ১৯১৬) উক্ত হাদিসদ্বয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহের প্রতি যুব সমাজকে উজ্জীবিত করার জন্য অলংকারপূর্ণভাবে বিবাহকে দ্বীনের অর্ধেক বলে ঘোষণা করেছেন । কেননা-বিয়ে মানুষের চারিত্রিক সংযম বজায় রাখা ও অশ্লীল কর্ম থেকে নিজেকে দূরে রাখার বড় মাধ্যম। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, বিবাহ দ্বীনের অর্ধেক হওয়ার অর্থ হচ্ছে, "বিবাহ মানুষকে যিনা-ব্যভিচার থেকে পবিত্র রাখে" । আর এই পবিত্রতা ঐ দুই স্বভাবের অন্যতম যার হেফাজত-সংরক্ষণ করতে পারলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের নাজাতের জামিনদ্বার হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেমন- তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আমার (সন্তুষ্টির) জন্য তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থান (জিহ্বা) এবং দুই রানের মধ্যবর্তী স্থান (লজ্জাস্থান) হেফাজত করবে আমি তার জন্য জান্নাতের জামিনদার হবো" । (বুখারী ৬৪৭৪/মিশকাত ৪৮১২)

পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারীদেরকে কল্যাণের প্রতীক হিসেবে ঘোষণা করে বলেন, "হে মুমিনগণ! এটা তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হবে। এবং প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ব্যতীত তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করিয়াছ উহার কিয়দংশ গ্রহণের জন্য তাদেরকে বাধ্য করোনা। এবং তাদের সাথে সৎ ভাবে স্বমর্যাদায় অবস্থান কর। কিন্তু যদি অপছন্দ কর, তাহলে তোমরা যে বিষয়ে অপছন্দ কর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেটাকে প্রচুর কল্যাণকর করতে পারেন" । (সূরা নিসা, আয়াত ১৯) মূলত নারী এবং পুরুষ ইসলামী পরিভাষায় (সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিভাষায় নয়) বালেগ/প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর থেকে উভয়ের মধ্যে পূর্ণতা চলে আসে । এই পূর্ণতাকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করার জন্য ইসলাম ব্যবস্থা করেছে সুন্দর এক সিস্টেমের। যেটা সমকালীন যুগের মত অশ্লীল রীতিনীতি, বেহায়াপনার ধূম্রজাল, লিভ টুগেদার, ফ্রি মাইন্ড এর মতো ধর্মদ্রোহী ও অমানবিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নয় । বরং তার জন্য সিলেকশন করেছে ইসলাম বিবাহের মত চমৎকার সেতুবন্ধন। আর এই সেতুবন্ধনটি নারীকে সম্মানের বাতাস দিয়ে করে তুলেছে আকাশচুম্বী । উপহার দিয়েছে সুন্দর জীবনের ক্লেশহীন নিরাপত্তা। অধিষ্ঠিত করেছেন সম্মান ও মর্যাদার শীর্ষ চূড়ায়। আল্লাহ রাবুবল আলামীন বলেন, "তিনি সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এক ব্যক্তি থেকে। এবং তার থেকে বানিয়েছেন তার সঙ্গিনীকে। যেন সে তার নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পারে"। (সূরা আরাফ, আয়াত ১৮৯) একমাত্র বিবাহের মাধ্যমে মানব জাতি তাদের প্রাকৃতিক চাহিদা বৈধ পন্থায় পূরণ করতে পারে। পারিবারিক জীবনে লাভ করতে পারে সীমাহীন প্রশান্তি। যেমন- আল্লাহ রাবুবল আলামীন বলেন, "আর তার নির্দেশনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নির্দেশনাবলি রয়েছে, তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে" । (সুরা রূম, আয়াত ২১)

অন্যত্র বলেছেন, "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য পরিধেয়, আর তোমরা তাদের জন্য পরিধেয়" (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৭)

বিবাহের মাধ্যমে দুটি পরিবারের মধ্যে গড়ে ওঠে আত্মিক সম্পর্ক। নারী পুরুষের ইজ্জত সম্ভ্রম হয় হেফাজত। পারিবারিক শান্তি, সামাজিক অবয়ব ও সুন্দর জীবন করা হয় লাভ। কারণ, "বিবাহ মানেই নারী পুরুষের মাঝে একটি সুমধুর সম্পর্ক"। যেই দুই জনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে আরো হাজার প্রাণের মাঝে এক ধরনের ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ ও আন্তরিকতার মায়া বন্ধন । এছাড়া বিবাহের মাধ্যমে আরো অনেক সামাজিক সুফল অর্জিত হয়। তাইতো মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভরণপোষণে সক্ষম সকল যুব সমাজকে বিয়ের প্রতি উজ্জীবিত করেছেন । যার আলোচনা আমি পূর্বে করে আসছি।

তুমি নারী

তোমার অধিকার আছে, তাই বলে কি

বেগানা পুরুষের সাথে আড্ডায় নিজেকে মজিয়ে রাখবে!!

নারীর মহরানা লাভের অধিকার:

এ কথা চিরন্তন সত্য যে, বৈবাহিক জীবনে নারী পুরুষ উভয়ে যৌন সম্ভোগের ক্ষেত্রে সমানভাবে উপকৃত হয়। উপভোগ করে দুজনি যুগল জীবনের সুখ ও যৌবিক প্রশান্তি ! মানব জীবনের এই সেক্টরে ও অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় পুরুষের তুলনায় নারীকে অগ্রাধিকার দিয়েছে ইসলাম। যেমন- মহরানার বিষয়টা ধরে নেওয়া যাক। স্ত্রী দাবি করা মাত্র স্বামী ধর্ম ও আইনগত তা আদায় করতে বাধ্য। অথচ পুরুষের জন্য নারীর কাছে এমন কোন আর্থিক চাওয়া পাওয়া নেই, যেটা স্বামী দাবি করলেই স্ত্রীকে দিতে হবে । সেটা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হোক বা আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে । অথচ যুগল প্রেমের স্বাদ দুজনি সমান ভাবে ভোগ করে। অপরদিকে ভরণপোষণের ক্ষেত্রে ও ইসলাম নারীকে দিয়েছে ধর্মীয় ও আইনি অধিকার । তথা নারীকে জীবন সঙ্গীনী বা স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার পর। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান সবকিছু বহনের দায়িত্ব অর্পণ করেছে স্বামীর উপর। আর এটা স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর উপর কোন করুণা নয়, বরং এটা তাদের পাওনা, এটা তাদের হক, এটা তাদের অধিকার। কথা চলছিল দেনমোহর নিয়ে, ইসলাম নারীকে যেসব অধিকার প্রদান করেছেন তার মধ্যে অন্যতম একটি হল, “বিবাহের সময় স্ত্রীর দেনমোহরের অধিকার” । এটা নারীর অগ্রিম অর্থনৈতিক নিরাপত্তা । এবং সংকটকালে দেনমোহরের মাধ্যমে একটি সম্মানজনক অর্থবহ ব্যবস্থা। এটা তাদের বৈবাহিক জীবনের একচ্ছত্র অধিকার । ইসলাম ধর্মে বিবাহের আগে নারীর জন্য মোহরনা নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মোহরনায় ইসলামী নারীদের জন্য বৈধ বিবাহের সনদ। ইসলামী আইনমত দেনমোহর বিয়ে সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম শর্ত। এই শর্ত অনুযায়ী বিয়ের সময় মর্যাদার প্রতীক হিসেবে স্বামী কতৃক স্ত্রী যে অর্থ-সম্পদ পাওয়ার অধিকার রাখে সেটিই দেনমোহর বা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সম্মাননা। যা স্ত্রীর মান-মর্যাদার মূল্যায়ন হিসেবে স্বামীর উপর অর্পণ করেছে ইসলাম। দেনমোহরের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনের প্রথম ভালোবাসার বীজ বপন করা হয় । শুরু করা হয় অপরিচিত দুজনের এক অজানা গন্তব্যের দিকে অজানা পথ চলা। মোহর প্রাপ্তির নিশ্চয়তা স্ত্রীর মাঝে এই আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রশান্তি তৈরি করে যে, দুদিনের ভোগের জন্য স্বামী তাকে বিয়ে করেনি। দেহের স্বাদ ফুরিয়ে গেলে তাকে রাস্তায় ফেলে অন্য নারীর সন্ধানে দেবদাস হয়ে ঘুরবেনা। ধর্মীয় বিধান মতে বিবাহের সূচনা লগ্নে দেনমোহর সিলেক্ট করা/আদায় করা জরুরী। আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবেও মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ অনুসারে একথা লেখা আছে যে, “স্ত্রীচাহিবা মাত্র স্বামী তাকে দেনমোহর আদায় করতে বাধ্য থাকিবে” । ইসলামী বিধি মোতাবেক নেকাহের পর স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে স্বামীর মৃত্যু হলে সম্পূর্ণ মোহরানা পরিশোধ করতে হবে। আর যদি স্পর্শ করার পূর্বে তালাক হয় তবে অর্ধেক মোহরানা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। ইসলামের নীতিমালা অনুযায়ী বিয়ের শুরুতে দেনমোহর প্রদানের কথা উল্লেখ আছে । স্ত্রী যখনই দাবি করবে, তখনই স্বামী তা আদায় করতে বাধ্য। এক্ষেত্রে মোহরানা দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, এক অংশ বিয়ের সময়, আর এক অংশ বিচ্ছেদের পর। অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর, যা স্ত্রীকে প্রদান করা একান্ত জরুরী। কেননা সেটা তার ধর্মীয় ও মানবিক অধিকার । স্ত্রীর দেনমোহর ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সে চাইলে তা আদায় করে নেওয়ার জন্য স্বামীর সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবে। এমনকি যতক্ষণ পর্যন্ত তা প্রদান করা হয় না, ততক্ষণ স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত স্বামীর দাম্পত্য জীবনের প্রবেশের অধিকার রাখেনা । সঙ্গত কারণে ইসলাম অতিরিক্ত দেনমোহর সিলেক্ট করতে বারণ করেছেন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী দেনমোহন নির্ধারণের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যেন যথাযথ ভাবে প্রদানে স্বামী অপারগ না হয় । এই প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা, “নিশ্চয়ই সবচেয়ে বেশি

বরকতময় ও কল্যাণকর বিয়ে হচ্ছে সেটি, যার মধ্যে খরচ কম হয়/মোহরানা অল্প হয়। (বায়হাকী) এই দেনমোহরের প্রচলন ইসলামে নতুন নয়, বরং ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাক ইসলামের যুগেও এর রেওয়াজ ছিল। তবে সিস্টেম ছিল ভিন্ন। সেকালে, জাহেলি যুগে মেয়ে পক্ষকে সদকা দেওয়ার প্রচলন ছিল । কিন্তু তার মালিক হতো মেয়ের অভিভাবক/পিতা মাতা। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রথার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটিয়ে নিয়ে আসে চমৎকার এক সংস্করণ । মেয়ের অভিভাবকদের দেওয়া অর্থ প্রথাকে সংশোধন করে দেনমোহরের সাথে সম্পৃক্ত করে দেন, নারীর যুগল জীবনের গুরুত্বপূর্ণ এই ধাপটিকে। সেই সাথে অভিভাবকের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করে এই সম্পদের উপর । ঘোষণা করেন স্ত্রীর একক প্রাপ্য ও অধিকার বলে । মুসলিম নারীর জন্য দেনমোহর এমন একটি বিশেষ অধিকার- যার নজির অন্য ধর্মে বিরল । হাদিসে আসছে, হযরত আমির বিন রাবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা- তিনি বলেন, "বনু ফাজরা সাম্প্রদায়ের কোন স্ত্রীকে একজোড়া জুতার বিনিময়ে বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি তোমার দেহ এবং সম্পদের বিনিময়ে এক জোড়া জুতায় সন্তুষ্ট হয়েছ? মহিলাটি উত্তর দিল হ্যাঁ। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। (তিরমিজি, হাদিস ১৯৪৭) আরেক হাদিসে আসছে, হযরত ওকবা বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- বিবাহের মধ্যে সর্বপ্রথম যে শর্ত পূরণীয় তা হল মোহর যা দ্বারা গুপ্তাঙ্গ বৈধ করা হয়েছে। (বুখারী, হাদিস ২৭৪১) ইসলামী আইন অনুসারে একটি বিয়ের শুদ্ধ বৈধতার জন্য পাঁচটি শর্ত পূরণ করতে হয়। মোহর প্রদান পাঁচটি শর্তের একটি শর্ত। মোহর ছাড়া বিয়ে পুরোপুরি বাতেল না হলেও এক ধরনের ফাসেদ বা ত্রুটিযুক্ত থেকে যায়। যেকোন সময় বাতেল না হলেও এক ধরনের ফাসেদ বা ত্রুটিযুক্ত থেকে যায়। যেকোনো সময় মোহর নির্ধারণ পরিশোধ করা হলে বিয়েটি ত্রুটিহীনতায় পৌঁছে নিরেট অবস্থানে উপনীত হয়। মোহর বিয়ের আগে পরে বা বিয়ের সময়ও নির্ধারণ করা যায়। বিয়ের সময় যদি মোহর নির্ধারিত না থাকে, বা মোহরের শর্ত না থাকে, তবুও মোহর আদায় করতে হবে। স্বামী কোন অজুহাত দেখিয়ে স্ত্রীকে মোহর দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারবে না। মোহরনার ব্যাপারটি যতক্ষণ পর্যন্ত না ফয়সালা হচ্ছে, ততক্ষণ কোন বিয়ে ইসলামে আইন মতে বৈধ হতে পারে না। কেননা- মোহরনা একটি ফরজ বিধান, আর ফরজ বিধানকে কাটাপ করে কোন বিষয় স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। সাধারণত বিয়ের সময় মোহরানা পুরোটা পরিশোধ করা যায়। আবার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন- ব্যক্তিগত খরচাপাতি, গহনা, অলংকার ইত্যাদির মাধ্যমেও পরিশোধ করা যায়। স্বামীর জন্য এই সুযোগও রয়েছে যে, সংসার জীবনের ধীরে ধীরে পরিশোধ করবে। তবে যখনই স্ত্রী স্বামীকে দেনমোহর আদায় করতে বলবে, তখনই স্বামীর উপর আদায় করা বাধ্য হয়ে দাঁড়াবে । আর স্ত্রী যদি স্বামীকে দেনমোহরের কথা না বলে, তবে স্বামীর ওপর দায়িত্ব হলো- স্বেচ্ছায় স্ত্রীর দেনমোহর আদায় করে দেওয়া। মোহর সে পরিমাণই পরিশোধ করতে হবে, যে পরিমাণ উল্লেখ থাকবে । সামান্য পরিমাণ কম করলেও মোহর আদায় হবে না। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় স্বামীর উপর অনুগ্রহ পূর্বক মোহর কমিয়ে দেন তাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ এটা স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর উপর এক প্রকারের দয়া, একপ্রকারের দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতার বেড়াজাল থেকে নিষ্কৃতি । দেনমোহরের একমাত্র স্বত্ব মালিকানা স্ত্রীরই । স্ত্রী চাইলে স্বামীকে পুরো দেনমোহর ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু স্বামী কতৃক চাপে বাধ্য করে দেনমোহর কমানো বা মাফ করে নেওয়ার কোন চান্স নেই। এইভাবে মাফ করার মাধ্যমে স্বামীও দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাবেনা। বিচ্ছেদের সময় স্ত্রীর দেনমোহর আদায় করে দেওয়া স্বামীর উপর একান্ত অপরিহার্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি কোন নারীকে মোহর দানের শর্তে বিয়ে করেছে, অথচ মোহর আদায়ের নিয়ত ও ইচ্ছে তার মধ্যে নেই সে ব্যভিচারী” । (তিরমিজি, হাদিস ২৪৬১)

লোক দেখানো বা মাত্রাতিরিক্ত দেনমোহর সিলেক্ট না করে, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী দেনমোহর নির্ধারণ করা এবং তা পরিপূর্ণ আদায় করা ইসলামের নির্দেশ । কোন অবস্থায় মোহর এত বেশি হওয়া উচিত নয়, যা স্বামীর পক্ষে পরিশোধ করা অসম্ভব। আবার এমন কম হওয়া ও উচিত নয়, যা স্ত্রীর আর্থিক নিরাপত্তা দিতে অক্ষম। এজন্য বিয়েতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত মহরে ফাতেমী নির্ধারণ করা শ্রেয়।

তুমি নারী,

তোমার অধিকার আছে তাই বলে কি

তুমি এত বেশি মহর নির্ধারণ করবে যা একজন পুরুষের দেওয়া সম্ভব না!

ইসলামে, বিধবা নারীর এক্সট্রা অধিকার

সম্মানজনক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সব অধিকার ইসলাম বিধবা নারীকে প্রদান করেছে। বিধবা নারীকে ইসলাম যেসব সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার দিয়েছে তার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি হলো,
(এক) সম্পদের উত্তরাধিকার; ইসলাম বিধবা নারীকে স্বামীর সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। একজন বিধবা মহিলা তার সন্তান ও সন্তানের সঙ্গে স্বামীর সম্পদের এক অষ্টমাংশের মালিক হয়। আর সন্তানও সন্তানের সন্তান না থাকলে এক চতুর্থাংশের মালিক হয় । পবিত্র কুরআনে মহান রাব্বুল আলামীন বলেন, “তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের স্ত্রীদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক অষ্টমাংশ । তোমরা যে অসিয়ত করবে তা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। (সুরা নিসা, আয়াত ১২)

বিধবা নারী সন্তানহীন হলে অথবা অন্যত্র বিয়ে করলেও সে মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদের ভাগীদার হবে। কিন্তু আমাদের সমাজ এই বিষয়টি স্বীকার করে না কেমন জানি এক ধরনের ধামাচাপা দিয়ে বিষয়টি পরিহার করে যেতে চায়। আমাদের সমাজে বর্তমান প্রচলিত আছে যে, বিধবারা উক্ত দুই অবস্থায় স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদের অংশই পাবেনা । মনে রাখতে হবে, এই সামাজিক রীতিটা ইসলামের সাথে পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক বিধায় এটা স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত। উক্ত অবস্থাদ্বয়েও তাদের সম্পদ তাদেরকেই দিয়ে দিতে হবে।

(দুই) সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা; মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাদিক বিধবা নারীকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে তাদের প্রতি সামাজিক অবহেলা ও অবজ্ঞার পথ চিরতরে রহিত করে দেন। সেই সাথে তিনি মুসলিম উম্মাহকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, যেন তারা বিধবা নারীকে সম্মানের চোখে দেখে এবং তাদের সাথে সদয় আচরণ করে । যেমন- বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্র বর্ণনা- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বিধবা ও মিসকিনদের জন্য খাদ্য জোগাড়ে চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায় । অথবা রাতে সালাত আদায়কারী ও দিনে সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির ন্যায়। (সহি বুখারি, হাদিস ৫৩৫৩) অন্য হাদিসে আসছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অসহায় ও বিধবার সাথে পথ চললে তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন। (নাসায়ী, হাদিস ১৪২৫)

(তিন) বিয়ে ও নতুন জীবন: ইসলাম বিধবা নারীকে শুধু বিয়ের অনুমতি দেয়নি, বরং উৎসাহিত ও করেছে। স্বামীর মৃত্যু বা তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর নির্ধারিত সময় ইদ্দত পালন করে বিধবা মহিলা নিজের পছন্দ অনুযায়ী যে কোন পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে। এক্ষেত্রে কেউ তাকে বাধ্য করতে বা বাঁধা দিতে পারবেনা। আল্লামা আশ্রাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন, "চরম মূর্খতার কারণে বেশিরভাগ মানুষ বিধবা নারীর দ্বিতীয় বিয়েকে দোষের মনে করে। অথচ কখনো কখনো বিধবা মেয়ের উপর দ্বিতীয় বিয়ে ফরজ হয়ে যায়। যেমন- বিধবা যুবতী হলে তার বিভিন্ন আচরণে বিয়ের চাহিদা প্রকাশ পেলে, বিয়ে না দিলে ফেতনার ভয় থাকলে, আর্থিক সংকটে নিমজ্জিত হলে, দারিদ্রতার কারণে দ্বীন ধর্ম ও সম্ভ্রম নষ্ট হওয়ার ভয়ে থাকে এমন নারীর জন্য দ্বিতীয় বিয়ে ফরজ। এমন অবস্থায় বিধবা নারী বিয়ে না করতে চাইলেও তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। (সূত্র: মুসলিম বর কনে, ইসলামী বিয়ে ৬১-৬৩)

(চার) সন্তানের দায়িত্ব শুধু বিধবা নারীর নয়; সাধারণত সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে বিধবা নারী তার জীবন যৌবন সবকিছু বিসর্জন দিয়ে দেয়। অথবা সন্তানের দোহাই দিয়ে তাকে দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত রাখা হয়। কিন্তু আমাদের একথা খেয়াল রাখতে হবে যে, ইসলাম বিধবা নারীকে সন্তানের একক দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি প্রদান করেছে। ইসলামী শরিয়াহ মতে সম্পদ ও ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে পিতার অবর্তমানে দাদা সন্তানের অবিভাবক। এবং তার অবর্তমানে ইসলামী বিধান মতে রাষ্ট্রের বিচারক সন্তানের অভিভাবক সিলেক্ট করে দেবে। অবশ্যই মা সন্তান লালন পালন করবে যতক্ষন না সে অন্যত্র বিয়ে করে । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তুমি তোমার সন্তানের ব্যাপারে বেশি হকদার যতক্ষণ না তুমি বিয়ে কর। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ২২৭৬) সুতরাং, সন্তান প্রতিপালনের অজুহাত দেখিয়ে মায়ের জীবন ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যাধিগ্রস্থ করার কোন সুযোগ নেই। যেমন- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "কোনো মাকে তার সন্তানের জন্য এবং কোনো পিতাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবেনা" । (সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৩)

তাছাড়া বিধবা নারী ও তার সন্তানের প্রতিপালন মুসলিম সমাজ ও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে মত দিয়েছেন ইসলামী স্কলার ও গবেষকরা। সঙ্গত কারণে সন্তান লালন পালনের অজুহাত দেখিয়ে বিধবা নারীর বিয়ের পথে প্রাচীর স্থাপন করে দেওয়ার কোন মানে হয়না ।

তুমি নারী,

তোমার অধিকার আছে তাই বলে কি

তুমি নির্লজ্জের মত বখাটে যুবকের কোলে মাথা রাখবে!!

ইসলামে, স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার

বিয়ে-শাদী মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। কেননা, নারী-পুরুষ সৃষ্টিগত ভাবে একে অপরের পরিপূরক ও সহায়ক। পুরুষকে মাইনাস করে যেমন একজন নারীর জীবন অসম্পূর্ণ । ঠিক তদুপরি একজন নারীকে কাটাপ করেও একজন পুরুষের জীবন শূন্য। বিয়ে একটি ধর্মীয় কাজ, মানবিক প্রয়োজন, সামাজিক বন্ধন, রাষ্ট্রীয় ভারসাম্য ও আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত। একজন মানুষের উৎকৃষ্ট ও পুতঃপবিত্র জীবন যাপনের ক্ষেত্রে বিয়ে নামের সম্পর্কটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এক কথায়

বলা যায়, বৈবাহিক জীবনকে পরিহার করে কোন মানুষ শালীন, সভ্য, সুন্দর, সততা ও ধার্মিক জীবন পাড়ি দিতে পারেনা। স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে স্থির থাকতে পারে না আসমানী বিধানের উপরও। আর এই যুগল জীবনের সূচনা হয়, পরস্পর বিরোধী দুটি লিঙ্গের মাধ্যমে, নির্মিত হয় একটি মধুময় চূড়ান্ত পর্যায়ের সেতুবন্ধন। এই বন্ধনটি ক্ষনিকের নয়, বরং দীর্ঘকালের। এই সম্পর্কটা শুরু হয় একটা কবুল শব্দের মাধ্যমে। যার উপর ভিত্তি করে অপরিচিত দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠে সুমধুর ভালবাসা, অদ্ভুত প্রেম, সীমাহীন আস্থা ও অফুরন্ত মহব্বত। যা শুধু ইহকালীন জীবনের সাথে সম্পৃক্ত তা নয়, বরং ক্ষণিকের এই ভুবন ডিঙিয়ে অনাদিকালীন জান্নাত পর্যন্ত হবে বিস্তৃত । অতএব এই যুগল জীবন মানে, একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্লাইওভার, যার উপর ভিত্তি করে দম্পতিদ্বয় সহ শত সহস্র, হাজারো অজস্র মানুষের পথচলা। সঙ্গত কারণে যদি কোনক্রমেই এই ফ্লাইওভারের ভিত্তিটা অকেজো বা দুর্বল হয়, তাহলে একাধিক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। মানবিকভাবে একটা মহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে । সুতরাং আদর্শ পরিবার ও দাম্পত্য গঠনের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের জন্য ভালো পাত্রী নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট। কারণ, একজন স্ত্রী মানে পুরুষ জীবনের সহধর্মিনী, অর্ধাঙ্গিনী, সন্তানদাত্রী, জীবনসঙ্গিনী, গৃহের গৃহিণী, হৃদয়ের শান্তিদায়িনী । তেমনই একজন নারীর জন্য ভালো পাত্র নির্বাচন করাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়ের আওতাভুক্ত। কেননা, শুধু প্রেম, ভালোবাসা, উশৃংখলতা ও আবেগ দিয়ে নয় বরং বিবেক, বুদ্ধি দিয়ে সব বিষয় চিন্তা করে তার হবু স্বামীর প্রভাব, প্রতিপত্তি, মান-মর্যাদা, যশ, খ্যাতি, ধন-সম্পদ, কুলীন বংশ, মনোলোভাস্বরূপ, সৌন্দর্য প্রভৃতি দেখে স্বামী নির্বাচন করতে হবে। কারণ, এই স্বামী নামের বটবৃক্ষটি তার শুধু ক্ষণস্থায়ী এ জীবনের সঙ্গী হবে তা নয়। বরং অনাদিকালের শান্তির আশ্রয়স্থল জান্নাত পর্যন্ত হবে তাদের এই সম্পর্কের দীর্ঘায়াতন । বাজারের পণ্যের ন্যায় একবার ব্যতিক্রম হলে বা মিসটেক করে ফেলে দ্বিতীয়বার চেঞ্জ করা সংশোধনের কোন চান্স থাকে না। তবে এক্ষেত্রে দ্বীনদার ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান গরিমার দিকটিকে সবচেয়ে বেশি প্রাইউরিটি দিতে হবে স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন নারীকে । কেননা কোন কোন সময় একজন পুরুষের কাছে বাড়ি, গাড়ি, অর্থকড়ি, ধন-সম্পদ সবকিছু বিদ্যমান থাকার পরেও একটা নারীর জন্য তার সংসারের চাকা অচল হয়ে যায়। এবং দাম্পত্য জীবন হয়ে ওঠে তিক্ত, শুধু স্বামীর মধ্যে দ্বীনদার ও উত্তম চরিত্র না থাকার কারণে । যেমন- কথায় আছে যার চরিত্র নষ্ট, তার সবকিছুই নষ্ট । কিন্তু বর্তমান সমাজে একতরফা ভাবে শুধু পাত্রীর গুনাগুন বিচার করে যুগল জীবনের সম্পাদনা করা হয়, হোক সেটা ইসলামী পরিবার বা আধুনিক পরিবার। অপরদিকে পাত্রীর পক্ষ থেকে পাত্রের গুণাগুণ বিষয়টি বিচার বিশ্লেষণে তেমন প্রাধান্য পায় না। অথচ আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে বিশ্ব মানবতার অগ্রদূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের জন্য পাত্রী নির্বাচনের যেমন নির্দেশনা দিয়েছেন । তেমনি পাত্রীর জন্য পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট নীতি ও প্রেসক্রিপশন সিলেক্ট করে গেছেন। বরং স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীকে যেসব বিষয়গুলো প্রাধান্য দিতে হবে, সে প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়ে বলেন, "যখন তোমাদের নিকট এমন কোন ব্যক্তির বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসা হয়, যার চরিত্র ও দ্বীনদারীতে তোমরা (পাত্রীরা) সন্তুষ্ট হবে। তবে তোমরা তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও। যদি তোমরা তা না কর, তবে তা পৃথিবীর মধ্যে বিপর্যয় ডেকে আনবে । এবং ব্যাপক বিশৃঙ্খলার কারণ হবে" । (তিরমিজি, হাদিস ১০৮৪)

নারীবাদ তত্ত্বের আবির্ভাব/অবতারনার ইতিহাসঃ

বিশ্বজুড়ে নারীবাদী আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে উঠে যদিও উনিশ শতকের দিকে; তবে এর উৎপত্তি মূলত আরও কয়েকশত বছর আগের ইউরোপের সামাজিক প্রেক্ষাপটে। যেখানে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের ন্যূনতম বালাই ছিল না। নারীর সাথে আচরণ করা হতো কৃতদাসীর মতো, বাজারে বিক্রি হতো নারী। কিন্তু সেই সময়ের মুসলিমবিশ্বের নারীদের অবস্থা ছিল ইউরোপীয় নারীদের জন্য ঈর্ষার কারণ। ১৮ শতকের ইউরোপীয় পর্যটক, নাট্যকার ও লেখিকা লেডি এলিজাবেথ কর্তৃক তৎকালীন তুর্কি নারীদের সম্পর্কে একটি বিবরণ থেকে এমনটাই অনুমেয় হয়। মূলত ইসলাম তার জন্মলগ্ন থেকেই নারীর সামাজিক মর্যাদা অধিকারের বিষয়ে যারপরনাই গুরুত্ব দিয়েছে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে এর জ্বলজ্যান্ত সাক্ষী।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ইউরোপের নারীবাদী আন্দোলন মুসলিম ভূখণ্ডে কেন ছায়া বিস্তার কল? কোন প্রেক্ষাপটে? মূলত মুসলিম ভূখণ্ডে ইউরোপের শত বছরের বেশি ঔপনিবেশিক শাসন এই ভূখণ্ডগুলোকে মধ্যযুগীয় ইউরোপের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। ফলে তৎকালীন ইউরোপ নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে যেসব মতবাদ তৈরি করেছিল, উপনিবেশিত মুসলিম জনগোষ্ঠীও সেইসব মতবাদের মধ্যেই নিজের মুক্তি খুঁজতে শুরু করেছে। এরই নাম দেওয়া হয়েছে প্রগতিশীলতা। এই চিন্তাই মূলত উত্তর ঔপনিবেশিক মুসলিমদের সামগ্রিক উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে, এখন অবধিI ফেমিনিজম, নারী অধিকারের চটকদার বুলিসর্বস্ব এই তথাকথিত মুভমেন্টের দাবি- দাওয়াগুলো শুনতে মধুর হলেও এই নামের আড়ালেই রয়েছে জমাটবাঁধা অন্ধকার।

ইসলাম ও পাশ্চাত্য নারীবাদের তুলনামূলক দৃশ্যপটঃ

ইসলাম একজন নারীর সম্পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একচুল পরিমাণও ছাড় দেয়নি; বরং সর্বোচ্চ পরিমাণে সতর্কতামূলক সকল প্রকার ব্যবস্থা ইসলাম গ্রহণ করেছে। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে একজন নারীর সতীত্বের মূল্য অপরিমাপযোগ্য । ইসলাম বলছে, একজন নারীর সম্ভ্রম, ইজ্জত, সতীত্ব, সৌন্দর্য সহজলভ্য কোনো বিষয় নয়। যেখানে-সেখানে এই সম্ভ্রম হারলে তা আর কখনোই ফিরে পাওয়া যায় না। ইসলাম মানুষকে শেখায় যে, টাকা-পয়সা বা ধন-দৌলত নয়; বরং বাবা-মায়ের কাছে সবচেয়ে অমূল্যবান জিনিস হওয়া উচিত তাদের ঘরে যদি কোনো কন্যা থেকে থাকে, সেই কন্যার ইজ্জত। এই সতীত্ব যেন বাবা-মায়ের বেখেয়ালিপণার কারণে নরপিশাচ কোনো আত্মীয় বা কোনো অনাত্মীয় দ্বারা নষ্ট না হয়, সে ব্যাপারে ইসলাম আগে থেকেই প্রত্যেকটা বাবা-মাকে সতর্ক হয়ে থাকতে বলছে ।

যেসব বিষয়গুলো একটা মেয়ের জন্য ভবিষ্যতে ০.০০০০০০০০০০০১% ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, সেসব বিষয়কে ইসলাম শিকড় থেকেই উপড়ে ফেলেছে।

ধর্ষণের শিকার হওয়া তো বহু পরের কথা, যে সকল ঘটনার কারণে ছোটো একটা মেয়ের যৌন হয়রানি হওয়ার কিঞ্চিৎ পরিমাণও সম্ভাবনা রয়েছে, সে সকল ঘটনা ঘটার সম্ভাব্য পথগুলোকে ইসলাম শুরুতেই বন্ধ করে দিয়েছে।

মোটকথা, একটা অমূল্যবান জিনিসকে আমরা যেভাবে আগলে রাখি, ইসলাম সেভাবেই একটা মেয়েকে ছোটোবেলা থেকে আগলে রাখা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়-

সারা বিশ্বে ১৯.৭% মেয়ে ১৮ বছরে পদার্পণের আগেই যৌন নিপীড়নের শিকার হয় ।

প্রতিবেদনটিতে The Centers for Disease Control (CDC) এবং the US Department of Justice-এর সম্মিলিত একটি জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় যে, উচ্চবিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত যুক্তরাষ্ট্রের ১১% মেয়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পার্শ্ববর্তী দেশ মেক্সিকোতে ১৮.৭% কিশোর বয়সি ছেলেমেয়ে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে । নিপীড়নের শিকার হওয়া এসব ছেলেমেয়ের ৫৮ শতাংশ-ই হলো মেয়ে ।

দক্ষিণ আমেরিকার সুপরিচিত দেশ ব্রাজিলে ২০০৯ সালের একটি জরিপে দেখা যায় ৫.৬% কিশোরী মেয়ে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে । যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়া এই কিশোরী মেয়েদের ৬০% এরই বয়স ছিল ১২ বছরের নিচে ।

তার মানে বোঝা গেল, এই সমাজ, সমাজের এই ব্যবস্থা, এই আইন, এই কানুন, এই সভ্যতা, এই বিশ্ব আর এই বিশ্বের মানুষের কাছে কম বয়সি মেয়েরা মোটেও নিরাপদ নয় ।

আমি শুরুতেই বলেছি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে একজন নারীর সতীত্বের মূল্য অপরিমাপযোগ্য । একটা মাত্র কম বয়সি কিশোরী মেয়ে ধর্ষিত হয়েছে, এই ঘটনাটি আপনার বা আমার তেমন মাথাব্যথা সৃষ্টি না করলেও যে মেয়েটা ধর্ষিত হয়েছে, সে জানে এই দুর্বিষহ জীবনের যন্ত্রণা আসলে কতটা । একটা মেয়েকে যদি বলা হয়– তোমাকে ধর্ষণ করা হবে অথবা তোমাকে হত্যা করা হবে, আমি শতভাগ নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি, সচ্চরিত্রা প্রত্যেকটা মেয়ে মৃত্যুর পথটাই বেছে নেবে। অথচ এই সমাজ আর এই সমাজের আইন মেয়েদের প্রতিনিয়ত ধর্ষণের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে

ইসলাম কিন্তু আপনাকে বলেনি ৬-১০ বছরের

মধ্যেই মেয়েকে বিয়ে দেওয়া বাধ্যতামূলক। ইসলাম আপনাকে বলছে, আপনার মেয়ের মধ্যে যখন থেকেই মানসিক ও শারীরিক কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আপনি দেখতে পাবেন, তখন থেকেই আপনি অধিক সতর্ক হোন। সতর্ক আপনাকে সবসময়ই থাকতে হবে। তবে বিশেষ করে আপনার মেয়ে যখন বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছবে, তখন সতর্কতা আরও বাড়াতে হবে। কারণ, এই সময়টাই আপনার মেয়ের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সময়। আপনার বেখেয়ালিপণার জন্য যেন অপূরণীয় কোনো ক্ষতি আপনার মেয়ের জীবনে না হয়ে যায়। আপনি যদি তার পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারেন, তবে সেক্ষেত্রে তাকে ভালো কোনো স্বামীর হাতে তুলে দিন; তবুও যেন আপনার মেয়ের পবিত্র শরীরে কোনো নরপিশাচের হাত না পরে । শুধু ধর্ষিত হওয়াটাই বড়ো অঘটন নয়। শারীরিকভাবে হেনস্তার শিকার হওয়াটাও অনেক বড়ো অঘটন। কারণ একটা মেয়ের ইজ্জত, সম্ভ্রম, সতীত্ব এই পৃথিবীর সব সম্পদ দিয়েও কেনা যাবে না । আরেকটা কথা ভুলে যাবেন না, আপনার কন্যা সন্তান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কর্তৃক আপনার কাছে আমানত সরূপ । সুতরাং সাবধান! আমানতের খেয়ানত যেন না হয়ে যায় ।

ছেলেদের ক্ষেত্রে ইজ্জত, সম্ভ্রম, সতীত্ব হারানোর ভয় না থাকলেও, উঠতি বয়সের উন্মত্ত কিছু ছেলে যৌন চাহিদা মেটানের জন্য অবৈধ কোনো পথে যেন পা না বাড়ায়, সেজন্য এই ধরনের ছেলেদের আগে আগেই বিয়ে করিয়ে দেওয়া উচিত। সমাজের তথাকথিত প্রগতিশীল ও তথাকথিত নারীবাদীরা ঠিক এই কাজটাই করে। এরা বন্ধুর বেশে এসে স্বাধীনতা ও অধিকারের কথা বলে ভুলিয়ে- ভালিয়ে একটা মেয়েকে পথে নামায় । পথে নামানোর আগে একটা মেয়েকে ওরা শেখায়–

-তুমি যেভাবে করে পারিবারিক একটা অনুশাসনে আছো, সেটা তোমার পরাধীনতা।

–তুমি রাতে বাসা থেকে একা বের হতে পার না, এটা তোমার পরাধীনতা । তুমি বাসার বাহিরে গেলে একজন অভিভাবকের সাথে যেতে হয়; কিন্তু একটা ছেলে অভিভাবক ছাড়াই বাহিরে যেতে পারে, এটা তোমার পরাধীনতা। –একটা ছেলে অনায়াসে তার বন্ধুর বাসায় গিয়ে রাত কাটাতে পারে; কিন্তু তুমি একটা মেয়ে হয়েছ বলে তোমার অভিভাবক তোমাকে কোনো বান্ধবীর বাসায় গিয়ে রাত কাটাতে দেয় না, এটা তোমার পরাধীনতা।

-নিজের ইচ্ছেমতো খোলামেলা আকর্ষণীয় পোশাকে বাহিরে যেতে পার না, এটা তোমার পরাধীনতা ।

-স্বামী নিজে অর্থ উপার্জন করে বলে তাকে তার স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল হতে হয় না। কিন্তু তুমি নিজে অর্থ উপার্জন কর না বলে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে আছো। ফলে স্বামীর কাছে তোমার প্রত্যেকটা কাজের কৈফিয়ত দিতে হয়। এটা তোমার পরাধীনতা ।

ু একটা ছেলে নামকরা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য পরিবার ছেড়ে দূরে গিয়ে একা থাকার অনুমতি পায়, কিন্তু তোমাকে অনুমতি দেওয়া হয় না, এতে তোমার অধিকার কেড়ে নেওয়া হলো ।

-একটা ছেলে যেখানে খুশি সেখানে চাকুরি করতে পারে কিংবা ব্যবসায়ের কাজে বাহিরে যেতে পারে, কিন্তু তুমি পার না, এতে তোমার অধিকার কেড়ে নেওয়া হল ।

তুমি বাহিরে গিয়ে চাকুরি করে অর্থ উপার্জন করার পরিবর্তে সংসারের রান্নাবান্না করে আর সন্তান লালন-পালন করে নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছ।

এবার চলুন দেখি, যারা এসব স্বাধীনতা ও অধিকারের কথা বলে নারীদের ঘরের বাহিরে নিয়ে এলো, এরা কি সেই নারীদের শতভাগ নিরাপত্তা দিতে পেরেছে কি না।

এই সমাজের নারীরা বাস্তবিকই কি শতভাগ নিরাপদ, নাকি সর্বদা একটা অনিরাপত্তার মধ্যে থাকে, সেটার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠবে শুধুমাত্র একটা তথ্য

থেকেই। সেটা হলো–সারাবিশ্বে প্রতিবছর, প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে কতজন নারী ধর্ষিত হচ্ছে, সেটার পরিসংখ্যান করে দেখ যুক্তরাষ্ট্রঃ

২০১৯ সালে Criminal Victimization ২০১৮ শিরোনামে আমেরিকার US Departments of Justice, Office Justice Programs কর্তৃক পরিচালিত National Crime Victimization Survey (NCVS) কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। গত পাঁচ বছরে আমেরিকাতে কতজন নারী ধর্ষিত হয়েছে প্রতিবেদনে সেটা উঠে আসে। প্রতিবেদনে দেখা যায়–

২০১৪ সালে ২,৮৪,৩৫০ জন, ২০১৫ সালে ৪,৩১,৮৪০ জন, ২০১৬ সালে ২,৯৮,৪১০ জন, ২০১৭ সালে ৩,৯৩,৯৮০ জন, ২০১৮ সালে ৭,৩৪,৬৩০ জন।

শুধু ২০১৮ সালের ধর্ষিত নারীদের সংখ্যাকে যদি আরও একটু ভেঙে তুলে ধরি, তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে, প্রতিদিন প্রায় ২০১৩ জন আর প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৮৪ জন নারী ধর্ষিত হয়েছে ।

যুক্তরাজ্য :

২০১৮ সালে Sexual Offences in England and Wales : Year Ending March ২০১৭' শিরোনামে ইংল্যান্ডের Office for National Statistics (ONS) কর্তৃক পরিচালিত Crime Survey of England and Wales (CSEW) কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনে উঠে আসে বর্তমানে ইংল্যান্ডের ২০% নারী অর্থাৎ ৩.৪ মিলিয়ন (৩৪ লাখ) নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে। শুধু ২০১৭ সালেই ৫,১০,০০০ জন নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে ।

An Overview of Sexual Offending in England and Wales' শিরোনামে Ministry of Justice, Home Office Ges Office for National Statistics (ONS) সম্মিলিতভাবে একটি জরিপ করে। জরিপের প্রতিবেদনে দেখা যায় ২০০৯/১০, ২০১০/১১, ২০১১/১২ এই তিন বছরের প্রতিবছর গড়ে ৪,০৪,০০০ নারী যৌন হয়রানির শিকার এবং প্রতিবছর গড়ে ৮৫,০০০ নারী ধর্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২৩৩ জন আর প্রতি ঘণ্টায় গড়ে প্রায় ১০ জন ব্রিটিশ নারী ধর্ষিত হয়েছে।

ওই একই প্রতিবেদনের একটা বিশেষ অংশে নারীদের যৌন নির্যাতনের অপরাধ সংঘঠিত হওয়া থেকে নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো, পুলিশ কর্তৃক অপরাধীকে আটক করা, আদালতে মামলা কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া এবং আসামিকে শাস্তি প্রদানের সর্বমোট সংখ্যার আলাদা একটি পরিসংখ্যান ছিল । এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়–

প্রতিবছর যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে গড়ে ৫,১৭,০০০ জন নারী । পুলিশের কাছে অভিযোগ রয়েছে ৫৪৩১০টি যৌন নির্যাতনের। পুলিশ আটক করেছে ১৬৪৫০ জন অপরাধীকে। আদালতে মামলা পরিচালিত হয়েছে ৯৯৫০টি ঘটনার। শেষমেশ চূড়ান্ত বিচারে সাজা পেয়েছে মাত্র ৫,৬২০ জন অপরাধী। একইভাবে– প্রতিবছর ধর্ষিত হয়েছে গড়ে ৯৫,০০০ জন । পুলিশের কাছে অভিযোগ রয়েছে ১৫,৬৭০টি ধর্ষণের। পুলিশ আটক করেছে ৩,৮৫০ জন ধর্ষককে। আদালতে মামলা পরিচালিত হয়েছে ২,৯১০ জন ধর্ষকের বিরুদ্ধে।

চূড়ান্ত বিচারে আদালত কর্তৃক সাজা পেয়েছে মাত্র ১০৭০ জন ধর্ষক। অর্থাৎ বিপুলসংখ্যক অপরাধী কোনো শাস্তিই পায় না এমন ঘৃন্য অপরাধ করা সত্ত্বেও। তথ্যগুলোতে একটু ভালো করে চোখ বোলালে দেখা যাচ্ছে– যতসংখ্যক নারী যৌন হয়রানি এবং ধর্ষণের শিকার হয়েছে, তার থেকে অনেক

কমসংখ্যক নারী পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। এর কারণটা বলে দিচ্ছে পরবর্তী তথ্যগুলো। একটু খেয়াল করুন, যতগুলো অভিযোগ পুলিশের কাছে এসেছে, গ্রেফতার করা হয়েছে তার চেয়েও কম সংখ্যক অপরাধীকে এটা অস্বাভাবিক নয় । তবে অভিযোগের সংখ্যা আর আটকের সংখ্যার মধ্যে এত তফাত থাকাটা স্বাভাবিকও নয়।)। আদালতে গ্রেফতারকৃতদের মামলা পরিচালিত হয়েছে তার চেয়েও কমসংখ্যক। শেষমেশ সাজাপ্রাপ্ত হয়েছে একেবারেই হাতেগোনা কয়েকজন। অর্থাৎ, নারীরা যৌন হয়রানি ও ধর্ষণের শিকার হয়ে বিচার চেয়েও বিচার পায় না বলেই পুলিশের কাছে সবাই অভিযোগ জানায় না।

এই নারীরা আদালত কর্তৃক সুষ্ঠু বিচার কেন পায় না, সেটার উত্তর আর একটু পরে দিচ্ছি। এর আগে ধর্ষণের আরও কিছু তথ্য তুলে ধরছি

যেই সমাজে একজন নারীও ধর্ষিত হয়, সেই সমাজ আর যেমনই হোক না কেন–সেই সমাজ কখনোই নারীর জন্য নিরাপদ হতে পারে না । যেই সমাজে দিনের পর দিন নারীদের ধর্ষিত হওয়ার ঘটনাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়া হচ্ছে, সেই সমাজ যত আধুনিকই হোক না কেন–সেটা একটা অসভ্য-বর্বর সমাজ। কারণ, যেই সমাজ নারীকে তার যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিতে জানে না, সেটা কক্ষনো একটা সভ্য সমাজের উদাহরণ হতে পারে না ।

যেই সমাজের পুরুষরা তাদের নারীদের ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচাতে সক্ষম হয় না, সেই সমাজের পুরুষ নামক কাপুরুষগুলোর আত্মহুতি দেওয়া উচিত। আর যেই সমাজের পুরুষরা নিজেদের নারীদের ধর্ষিত হওয়া থেকে বাঁচাবে তো দূরের কথা, উলটো সেই সমাজের পুরুষরা নিজেরাই নিজেদের নারীদের প্রতিনিয়ত ধর্ষণ করছে; পাশাপাশি সেই ধর্ষকদের এদের প্রচলিত আইনে

কোনো শাস্তিও দেওয়া যাচ্ছে না–সেই সমাজকে আমি আসলে সমাজ বলতে পারছি না । এটা নিঃসন্দেহে একটা বন্য জীবনযাপন ।

কখনো কি দেখেছেন, সুশীলরা প্রচারমাধ্যমে বা সভা-সমাবেশে এসব ধর্ষণের বিরুদ্ধে জোরালোভাবে প্রতিবাদ করছে বা কথা বলছে? বললেও একটু-আধটু; প্রায় না বলার মতোই । ভাবুন তো এটা কি কোনো একটু-আধটু বিষয় কি না? একজন ধর্ষিতা নারীই শুধু বোঝে–ধর্ষিত হওয়ার কষ্ট কতটা। ধর্ষিতা সেই নারী বেঁচে থেকেও তিলে তিলে প্রতিদিন একটু একটু করে মরে ।

নামধারী প্রগতিশীলরা আর দালাল গণমাধ্যম অবিবাহিত নারীদের ধর্ষিত হওয়া নিয়ে কথা না বললেও 'বৈবাহিক ধর্ষণ' নামে একটা স্লোগান তোলে প্রায়ই। বিবাহ এবং ধর্ষণ সম্পূর্ণ বিপরীত দুটো বিষয় হওয়া

সত্ত্বেও এই ধান্দাবাজরা শব্দ দুটোকে একসাথে জোড়া দিয়ে বিবাহের মতো পবিত্র সম্পর্ককে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাইছে বহু আগে থেকেই। বিবাহ এবং ধর্ষণের বৈপরীত্য নিয়ে এ পর্যন্ত অনেকেই অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। তাই আমি আর সেদিকে না গিয়ে ধান্দাবাজদের দুটো ধান্দাবাজিমূলক কাজ হাতেনাতে ধরিয়ে দিই দেখুন–

বিবাহ নারী-পুরুষের বৈধ একটা সম্পর্ক। এ ধরনের সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি যে ভালোবাসা থাকে, সেটা বৈধ। অর্থাৎ বিবাহিত স্বামী- স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের বৈধ ভালোবাসার সঙ্গী। দাম্পত্যজীবনে ঝগড়া কিংবা কথা কাটাকাটি হতেই পারে। আজকে ঝগড়া হয়েছে কালকে মিলে যাবে; এখন ঝগড়া হয়েছে একটু পরে মিলে যাবে। স্ত্রীর রাগ ভাঙাতে একজন স্বামী অনেকভাবেই চেষ্টা করে থাকে। সেক্ষেত্রে রোমান্টিক বা আবেগজড়িত উপায়ে আদর-সোহাগ দিয়ে একজন স্বামী তার স্ত্রীর রাগ ভাঙাতে চাইতেই পারে।

এর বিপরীতে গিয়ে যদি ভাবতে চান, তবে ব্যাপারটা দাঁড়াবে–স্ত্রী তার স্বামীর ওপর রাগ করে বা অন্য যেকোনো কারণে স্বামীর স্পর্শ একেবারেই চাইছে না। ফলে স্বামী যখন রোমান্টিক বা আবেগজড়িত উপায়ে স্ত্রীর রাগ ভাঙাতে যায় কিংবা জোরপূর্বক তার অধিকার আদায় করতে যায়, তখন নামধারী প্রগতিশীল আর দালাল গণমাধ্যমের ভাষায় সেটা হয়ে যায় ধর্ষণ

শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ কোনো স্বামী বা স্ত্রী তার জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করতে পারে না । একজন মানুষকে যেমন খাবার খেতেই হয়, নিশ্বাস নিতেই হয়, জৈবিক চাহিদা পূরণও

তেমনই অপরিহার্য একটা বিষয়। তা ছাড়া বিবাহ করার প্রধানতম কারণ হলো–বৈধ উপায়ে যৌন ক্ষুধা নিবারণ করা এবং নিজের পরবর্তী প্রজন্মকে পৃথিবীতে নিয়ে আসা। একজন স্ত্রী মানসিক বা শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকলে ভালোবাসার মানুষ হিসেবে তার স্বামীর অবশ্যই সেটা বোঝা উচিত এবং তাদের মাঝে সুন্দর সম্পর্ক বজায় থাকলে স্বামী সেটা বুঝবেও । কোনো কারণ ছাড়া একজন স্ত্রী তার বিবাহিত সঙ্গীর সাথে যৌন সম্পর্ক করতে না চাওয়ার মানে হলো, সেই স্ত্রী অবৈধ কোনো সম্পর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে । তা ছাড়া স্বামীও যদি পরকীয়ায় জড়ায়, তখন সেও তার স্ত্রীকে উপেক্ষা করে চলে। এসব ক্ষেত্রে স্ত্রী শক্তির দিক থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে দুর্বল হওয়ায় স্বামীর ওপর কোনো জোর খাটিয়ে নিজের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে পারে না। যদি পারত, তবে অবশ্যই আদায় করে নিত। উলটোদিকে স্বামী কিন্তু ঠিকই জোর খাটিয়ে নিজের প্রাপ্য অধিকার আদায় করে নেয়। তা ছাড়া

পরকীয়ায় জড়ানো এসব দম্পতির মাঝে সুন্দর সম্পর্ক থাকা তো দূরের কথা; বরং সব সময় একটা সন্দেহপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করে। যেটা একটা দাম্পত্যজীবনের জন্য শুধুই অশান্তি, অশান্তি আর অশান্তি।

পরকীয়ার মতো এমন জঘন্যতম একটা কাজে জড়িয়ে থাকা কোনো স্ত্রীর ওপর স্বামী যদি জোরপূর্বক তার অধিকার আদায় করতে যায় আর সেটাকে ধর্ষণ বলে চালানো হয়, তবে তো স্বামীর শাস্তি হওয়ার আগে স্ত্রীকে শাস্তির সম্মুখীন করা উচিত। কারণ, স্ত্রী জেনে বুঝে প্রতিনিয়ত প্রতারণা করছে তার স্বামীর সাথে। তিলে তিলে গড়ে তোলা একটা সুন্দর পরিবার ভেঙে তছনছ করছে, সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে। কি একমত হতে পারবে দালাল- সুশীলরা আমার এই কথার সাথে? এরা একমত হতে পারবে না, এরা পরকীয়ায় জড়ানো স্ত্রীর শাস্তি চাইবে না; বরং এরা পরকীয়াকে বৈধ বলে আইন করে। বিশ্বের **নারীবাদী** উন্নত ও উন্নয়নশীল অধিকাংশ দেশে পরকীয়াকে বৈধ করা হয়েছে সেসব দেশের নীতিহীন আদালত কর্তৃক। অধিকারের দোহাই দিয়ে এসব নামধারী সুশীলরা পরকীয়াকে বানিয়েছে স্বাভাবিক কাজ। আর পরিবার-বিধ্বংসী পরকীয়ায় জড়ানো স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী জোরপূর্বক তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে চাওয়াকে বানিয়েছে ধর্ষণ অন্যদিকে, বিবাহবহির্ভূত প্রেম নারী-পুরুষের অবৈধ একটা সম্পর্ক। এ ধরনের সম্পর্কে প্রেমিক-প্রেমিকা একে অপরের প্রতি যে ভালোবাসা থাকে, সেটা অবৈধ। অর্থাৎ বিবাহবহির্ভূত প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পর পরস্পরের অবৈধ ভালোবাসার সঙ্গী । তা একটা অবৈধ প্রেমের সম্পর্কে কি প্রেমিকা তার প্রেমিকের সাথে প্রতারণা করে না? অবশ্যই করে, এবং অহরহ ঘটছে এসব। তো এসব ক্ষেত্রে পুরোনো প্রেমিক কি তার প্রেমিকার সাথে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক করে না? অবশ্যই করে এবং অহরহ ঘটছে এসব।

এখন আমার প্রশ্ন হলো– এই ধরনের জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ককে কি ধর্ষণ বলা যায় না? না, এই জায়গায় এসে দালালগুলো মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে । এটাও যদি ধর্ষণ হয়ে থাকে, তবে এই ধরনের বিবাহবহির্ভূত অবৈধ প্রেমের ধর্ষণ নিয়ে এসব তথাকথিত সুশীলদের মুখ থেকে আজ পর্যন্ত কয়টা বাক্য শুনেছেন? একটিও শোনেননি; কিয়ামত পর্যন্ত শুনবেন না নিশ্চিত থাকুন। কারণ, এদের প্রচেষ্টা হলো অবৈধকে বৈধ করা আর বৈধকে অবৈধ করা। শৃঙ্খলাবদ্ধ দাম্পত্যজীবনের নিয়মকে ধ্বংস করতে পারলে একটা সুন্দর পরিবার হবে না; একটা সুন্দর পরিবার না থাকলে সুসন্তান জন্ম নেবে না; সুসন্তান না থাকলে একটা সমাজ এবং গোটা জাতিই ধ্বংস হয়ে যাবে । সুতরাং 'বৈবাহিক ধর্ষণ' কথাটি শব্দের অপব্যবহার ।

নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকারের নাম ভাঙিয়ে যেসব নামধারী প্রগতিশীল ও সুশীলরা এমন বন্য জীবনযাপনের দিকে নারীদের ডেকে নিয়ে যাচ্ছে, এদের আসল পরিচয় হলো–এরা এদের প্রভুদের

নোংরা যৌনক্ষুধা নিবারণের অবৈধ পথ বের করার দালাল । বৈধ বিবাহের মাধ্যমে তৈরি হওয়া পরিবারপ্রথা ভেঙে একজন নারীকে অনিশ্চিত জীবনের দিকে ঠেলে দিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে শেষমেশ এদের প্রভুদের হাতে তুলে দিচ্ছে এরা। বিনিময়ে এরা এদের প্রভুদের কাছ থেকে অর্থ কামিয়ে নিচ্ছে। এসব দালালদের এই পন্থায় অর্থ উপার্জনের বিষয়টি বিশ্বাস করতে না পারলে খোঁজ নিয়ে দেখুন, এদের অর্থের উৎস কী। চটি মার্কা পত্রিকায় খবর ছাপা, সভা, সেমিনার আর গোলটেবিল বৈঠক করে প্রভুদের শিখিয়ে দেওয়া সমাজ বিধ্বংসী বুলিগুলো আওড়ানো ছাড়া এদের আর অন্য কোনো পেশা আছে কি?

নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকারের নাম ভাঙিয়ে এদের অযৌক্তিক দাবিগুলোকে মনের চোখ খুলে একটু খেয়াল করলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি আগেই বলেছি, এদের সবগুলো দাবিই একজন নারীকে একাকী বাহিরে বের হতে পারাকে ঘিরে। এই সুশীলরা নারী অধিকার ও নারী স্বাধীনতার টোপ দিয়ে নারীদের প্রথমে পথে নামাল, এরপর এদের প্রভুদের আর প্রভুদের

সাঙ্গপাঙ্গদের দিয়ে নারীদের ভুলিয়ে ভালিয়ে, নানা প্রলোভন দিয়ে ধর্ষণ করালো, পাশাপাশি এরা নিজেরাও ধর্ষণ করল

সবারই মনে থাকার কথা, কিছুদিন আগে বাংলাদেশে 'গা ঘেঁষে দাঁড়াবেন না' নামে একটা স্লোগান তুলেছিল এই তথাকথিত নারীবাদীরা। বড়ো কোনো কাজ করার আগে ছোটোছোটো ওই ধাঁচের কাজ করে নিজেকে দক্ষ করে তুলতে হয় । বাংলাদেশের নারীবাদীরাও এখন ঠিক সেই একই প্রস্তুতি নিচ্ছে। নিজেদের দক্ষ করে তুলছে ছোটোছোটো প্রতিবাদ করার মাধ্যমে। কারণ, আগামী দিনগুলোতে তাদের আরও বড়ো কোনো অধিকারের দাবিতে রাস্তায় নামতে হবে। এখন যেমন তারা বলছে 'গা ঘেঁষে দাঁড়াবেন না' আগামীতে বলতে হবে, 'ধর্ষণের বিচার চাই ।"

সমগ্র পশ্চিমের নারীবাদীরা এখন দ্বিতীয় স্লোগানটি নিয়ে রাস্তায় নেমেছে । কারণ, তারা এখন ধর্ষণের বিচার পায় না। একসময় পশ্চিমা নারীবাদীরাও বাংলাদেশের নারীবাদীদের মতো প্রথম স্লোগানটি নিয়ে রাস্তায় নামত ।

দিন বদলাতে বদলাতে আজকে পশ্চিমের নারীবাদীরা 'Slut Walk' বা 'বেশ্যার হাঁটা' নামে সভা-সমাবেশ করে । যারা সভা-সমাবেশ করে তারা কিন্তু সবাই বেশ্যা না । ধর্ষিত হওয়ার পর বিচার চেয়েও

বিচার পায়নি ওরা । শেষে নিজেদের নাম দিয়েছে Slut বা বেশ্যা । তাদের Slt Walk বা বেশ্যার হাঁটার একটা স্লোগান হচ্ছে 'No Means No' পুরো স্লোগানটি হলো– 'Whatever We Wear, Wherever We Go, Yes Means Yes, No Means No' (আমরা যা-ই পরিধান করি, আমরা যেখানেই যাই, হ্যাঁ মানে হ্যাঁ, না মানে না) । এই স্লোগানের উদ্দেশ্য হলো–ধর্ষণ থেকে ওরা বাঁচতে চায়। মানে কোনো মেয়ে যদি 'না' বলে, তাহলে যেন তাকে জোর করে যৌন সম্পর্ক না করা হয় । আর ধর্ষণের কারণ হিসেবে যেন উলটো মেয়েদের পোশাককে দায়ী করা না হয় ।

পশ্চিমা ছেলেমেয়েরা খুব সহজেই একে অপরের সাথে বার বা ক্লাবে গিয়ে মদপান করতে পারে। রাতে এক সাথে আড্ডা দিতে পারে। মদ্যপ হয়ে মেয়েরা ছেলেদের গা ঘেঁষে নাচতে পারে। মাতাল অবস্থায় ছেলেটি বেশি কিছু করে ফেলতে চাইলে মেয়েটির অনিচ্ছা থাকলেও বাধা দেওয়ার শক্তি থাকে না। কারণ, মেয়েদের শক্তি এমনিতেই কম; তার ওপরে আবার মেয়েটি মাতাল। আর এমন পরিবেশে গিয়ে ধর্ষিত হওয়ার পর পুলিশের কাছে অভিযোগ করলে পুলিশ সেটা গ্রহণ করে না। তখন উলটো মেয়েটিকে বলা হয়–তুমি সেচ্ছায় ছেলের সাথে ক্লাবে বা বারে গিয়ে মদপান করেছ, তুমি অশালীন পোশাক পরেছ ইত্যাদি। এই জন্যই তাদের স্লোগান হলো–'আমরা যা-ই পরিধান করি, আমরা যেখানেই যাই, হ্যাঁ বললে হ্যাঁ, না বললে না।' তাই বিচার না পেয়ে পশ্চিমা নারীবাদীরা এখন বলছে, সমগ্র পশ্চিমা সমাজজুড়ে এখন Rape Culture বা ধর্ষণের সংস্কৃতি চলছে । মানে তারা বলতে চাইছে, যেহেতু তারা যেখানে-সেখানে যখন-তখন ধর্ষণের শিকার হয়ে ধর্ষণের বিচার পাচ্ছে না; উলটো নিজেরাই দোষী হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং ধর্ষণ করাটা পশ্চিমা সমাজের সংস্কৃতি । একটু ভাবতে পারেন চাকচিক্যময় ওই সমাজে নারীদের অবস্থান আজকে কোথায় নেমে এসেছে!

ভয়ংকর ব্যাপার হলো, Lauren Southern নামের এক কানাডিয়ান তরুণী এই নারীবাদীদের বিপক্ষে রাস্তায় নেমেছে। সে সেচ্ছায় রাস্তায় নেমেছে, নাকি নারী স্বাধীনতার কথা বলে রাস্তায় নামিয়ে এনে নারীদের ধর্ষণ করা ওই আড়ালের ঠাকুররা ওদের বিশ্বস্ত রক্ষিতা হিসেবে Lauren Southern-কে রাস্তায় নামিয়ে আসল ঘটনা ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে, সেটা ভেবে দেখার বিষয়। Lauren Southern ওর কথায় একটা বিষয়ই বারবার বোঝাতে চেয়েছে যে, নারীবাদীরা Rape Culture' নাম দিয়ে তাদের সমাজের যে বাস্তবিক চিত্রকে তুলে ধরতে চাইছে, এটা নাকি ভুল দাবি করছে, এটা নাকি মিথ্যে অপবাদ! একটু ভেবে দেখুন, Lauren Southern একজন নারী হয়েও নারীদের বিপক্ষেই কাজ করছে। ওকে দিয়ে অবশ্য কাজটা করানো হচ্ছে। কারণ, ধর্ষণের বিষয়ে একটা মেয়ে

নিজেই যখন অন্য ধর্ষিতা মেয়েদের বিপক্ষে মতামত দেবে, তখন সমাজের চোখে অভিযোগকারী মেয়েদের অভিযোগের গুরুত্বটা কমে যাবে।

বাংলাদেশের কথা বলতে গিয়ে এতক্ষণ যাবৎ বললাম পশ্চিমাদের কথা । কেন জানেন? কারণ, বাংলাদেশসহ অন্যান্য মুসলিম দেশের নারীবাদীরাও ওই একই পথে হাঁটছে । তারা সব ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্যের অনুকরণ ও অনুসরণ করে । নতুন নতুন আধুনিকতার ছোঁয়া পেলে যে কেউ-ই বাঁধনহারা হবে–এখন সেটা ছেলেই হোক অথবা মেয়েই হোক। কিন্তু আদৌ কি তারা আধুনিক হতে পেরেছে কি না সেটা একটু ভেবে দেখতে হবে আমাকে। তারা যেটাকে আধুনিকতা বলে, সেটাই যদি প্রকৃত আধুনিকতা হয়, তাহলে আমাকে নতুন করে আধুনিকতার সংজ্ঞাটা শিখতে হবে আবার।

আধুনিকতার সংজ্ঞা যদি তাদেরটাই সঠিক হয়, তবে বাংলাদেশি নারীবাদীরা পশ্চিমা নারীবাদীদের থেকে অনেক সেকেলে । কেন বললাম? কারণ, সর্বপ্রথম কানাডাতে এই Slut Walk' বা 'বেশ্যার হাটা' প্রচারণা শুরু হয় ২০১১ সালে। পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা বিশ্বের বেশ কয়েকটি উন্নত দেশে এই প্রচারণা ছড়িয়ে পড়ে। এর মানে ধরে নিন, আরও প্রায় ২০ বছর আগে থেকে পশ্চিমা দেশেগুলোতে Rape Culture বা ধর্ষণ সংস্কৃতি চলছে। বিচার না পেয়েই ওরা রাস্তায় নেমেছে শেষমেশ। এদিক থেকে পশ্চিমা নারীবাদীদের সাথে তুলনা করলে বাংলাদেশের নারীবাদীরা নির্যাতিত হওয়া এবং বিচার না পাওয়ার দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে । (মানে এখনও বাংলাদেশের নারীবাদীরা পশ্চিমা নারীবাদীদের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি।) বাংলাদেশের নারীবাদীরা মাত্র ‘গা ঘেঁষা' বিষয় নিয়ে রাস্তায় নেমেছে । অন্যদিকে পশ্চিমা নারীবাদীরা তাদের থেকে কয়েকধাপ এগিয়ে ধর্ষিত হয়ে বিচার না পেয়ে Slut Walk বা ‘বেশ্যার হাটা' প্রচারণা করছে।

সমস্যা নেই, দিনশেষে এসব পথিকদের গন্তব্য একই হয়–ধর্ষিত হবে, এরপর বিচার চেয়ে বঞ্চিত হবে, এরপর Slut Walk করবে, এরপর ‘No Means No' স্লোগান দেবে, এরপর বলবে– আমাদের সমাজে Rape Culture চলছে। এরপর দেখা যাবে Lauren Southern নামের কোনো এক সত্যিকারের বেশ্যা এসে রাস্তায় নেমে বলবে, বাংলাদেশের নারীবাদীরা মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছে!

নারীবাদীরা আমার কথায় আবার রেগে যেতে পারে। আমার কথা না বুঝে রেগে গেলে আমার কিছুই করার নেই। আমিও চাই নারীবাদীরা তাদের অধিকার পুরোপুরিভাবে পাক। তবে একটা কথা কী, আমি চাই তারা তাদের প্রকৃত অধিকার কোনটা, সেটা আগে খুঁজে বের করুক। অশ্লীল পোশাক পরিধান করে রাস্তায় বের হওয়াটা কোনো নারী অধিকারের মধ্যে পড়ে না। রাতেরবেলা একা একা বাড়ির বাহিরে বের

হওয়াটা কোনো নারী অধিকারের মধ্যে পড়ে না। ছেলেরাও রাতে বাহিরে থাকলে বাবা-মা দুশ্চিন্তিত হয়, বাধা দেয়, বকাঝকা করে ।

নেড়ি কুকুর ধরনের অনেক ছেলে আছে–মেয়েদের দেখলে যাদের জিহ্বা কুকুরের মতো নিচের দিকে ঝুলে পড়ে, আমি সেটা অস্বীকার করছি না। রাস্তায়, জনসাধারণের স্থানে, আর গণপরিবহনগুলোতে এই কুকুররাই মূলত মেয়েদের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। এরাই রাস্তাঘাটে, দোকানপাটে মেয়েদের শ্লীলতাহানি করে। চরিত্রহীন এসব ছেলেমেয়েদের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়–এটা অবশ্যই একটা বিরাট সমস্যা। সমস্যাটাকে গোঁড়া থেকে কেটে ফেলা উচিত প্রতিবাদ করতে যখন রাস্তায় নেমেছেন, প্রতিবাদের ভাষাটা একটু পরিবর্তন করে ফেলুন। 'গা ঘেঁষে দাঁড়াবেন না' এটা না বলে বলতে পারতেন 'মেয়েদের জন্য আলাদা পরিবহন ব্যবস্থা চাই', 'মেয়েদের জন্য আলাদা যাত্রীছাউনি চাই' । যেসব স্থানে বখাটেরা বেশি সুযোগ নেয়, আপনাদের কর্তৃপক্ষদের বলুন, ওইসব স্থানে গুলোতে নিরাপত্তা বাড়িয়ে দিতে ।

গেঞ্জিতে প্রতিবাদী কথা লিখে রাস্তায় নামাটা কখনোই প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে না। বিশ্বে Slut Walk নামে যে প্রচারণা হয়, সেখানেও দেখা যায়– ধর্ষিতা নারীরা প্রায় অর্ধনগ্ন । আবার কিছু আছে পুরো নগ্ন হয়ে হাতে প্রতিবাদী প্ল্যাকার্ড বা প্রচারপত্র নিয়ে বা নিজের নগ্ন শরীরের ওপর রং দিয়ে প্রতিবাদী কথা লিখে রাস্তায় হেঁটে হেঁটে মিছিল করে ।

শিকারির মনভোলানো কথায় পটে গিয়ে ভুল পথে পা বাড়িয়ে নিজেই নিজের সমস্যা সৃষ্টি করেছে। সেই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে গিয়ে অশালীন পোশাক পরিধান করে, নগ্ন শরীরের ওপর প্রতিবাদী কথা লিখে রাস্তায় নেমে প্রচারণা করছে । ফলে সমস্যা সমাধানের সঠিক একটা পথ খুঁজে পাওয়া তো দূরে থাক; বরং আরও নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে বসল তারা। রাস্তার ময়লা

পরিষ্কার করার জন্য যারা রাস্তায় নেমেছে, উলটো তারাই আবার নতুন করে রাস্তায় ময়লা ফেলে রাস্তা নোংরা করছে। কতটা হাস্যকর ব্যাপার!

এমন অবিবেচকের মতো কাজ পশ্চিমা সমাজের সাধারণ মানুষগুলোও ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। ফলে দেখা গেছে, 'যৌনতার ব্যাপারে উদার ও ভ্রুক্ষেপহীন' সমাজের সেসব মানুষগুলোও একটু বাকা চোখে প্রতিবাদকারীদের দিকে তাকিয়েছে। অবশ্য পশ্চিমারা ছলচাতুরী একটু ভালো পারে। বস্তুত এই ধর্ষিতা মেয়েগুলোর ভুল পথে চলে যাওয়ার পেছনে 'যৌনতার ব্যাপারে উদার ও ভ্রুক্ষেপহীন' সমাজের এই সাধারণ মানুষগুলোও অনেকাংশে দায়ী । এরা সবই জানে, সবই বোঝে যে, সমাজে আসলে কী কী ঘটছে। তবুও এরা চোখ বড়ো বড়ো করে, চোয়ালের নিচের পার্টি আরও নিচের দিকে নামিয়ে, এমন

একখানা ভাব ধরবে, যেন এরা এইমাত্র আকাশ থেকে পরল, কিছুই জানে না। ফলে দেখা গেল, যা ক্ষতি হওয়ার দিনশেষে এই ধর্ষিতা মেয়েগুলোরই হলো । সমাজের সস্তা জনপ্রিয়তার আশায়ই হোক কিংবা 'আধুনিকতার' তকমা পাওয়ার আশায়ই হোক, নকল স্বাধীনতা ও নকল অধিকার আদায় করতে গিয়ে অনিরাপদ জীবনযাপন করে ধর্ষিত হলো, শেষমেশ এই সমাজই তাদের ছুড়ে ফেলে দিলো।

ভুল পন্থায় এমন প্রতিবাদ দেখে কিছু সচেতন মুসলিম একটু ক্ষেপে গিয়েছিলেন। ভাই শুনুন, আমরা যারা ইসলামের দিকনির্দেশনা মেনে চলি, আমরা তো আর তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়াই না বা তাদের ধর্ষণ করি না; বরং আমরা তো উলটো তাদের দিকে চোখ পড়লে চোখ নিচে নামিয়ে ফেলি পর্দা করার জন্য । তাই তাদের এই প্রতিবাদী কথা ও প্রচারণাগুলো যে আমাদের মতো সচেতন মুসলিম তরুণদের বিরুদ্ধে নয় এটা আমি শতভাগ নিশ্চিত। তাদের এই প্রতিবাদী কথা ও প্রচারণা গুলো ওইসব দালালগুলোর বিপক্ষে, যেই দালালগুলো তাদের স্বাধীনতা ও অধিকারের কথা বলে রাস্তায় নামিয়ে এনে ধর্ষণ করিয়েছে, করেছে।

এখন বলতে পারেন, ওরা আমার বোন । ওরা ভুল পথে যাচ্ছে। ওদের থামাবো না? জি ভাই, তাদের অবশ্যই থামাবেন। তাদের সঠিক পথ দেখাবেন। তবে সেসব বোনদের জন্যই কষ্ট করবেন, যেসব বোনদের অভিধানে লাজুকতা, শালীনতা, সচ্চরিত্রতা শব্দগুলো আছে, যেসব বোনেরা আপনার-আমার কথা একটু হলেও শোনে ও মানে ।

ঘটনা এখানেই শেষ না । মেয়েরা দেশের বাহিরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিভাবক ছাড়া একা একা পড়াশোনা করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত ধর্ষিত হচ্ছে । এখানেও সেই একই অবস্থা । ধর্ষিত হয়ে বিচার পাওয়াতো বহু দূরের কথা, বিচার চাইতে কার কাছে যাবে, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সেসবের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের শিকার হওয়া মেয়েদের অধিকাংশই বিদেশি নাগরিক । বিদেশি এই মেয়েগুলোকে ধর্ষণ করা সবচেয়ে সহজ ও নিরাপদ । কারণ যে দেশে মেয়েটি পড়াশোনা করতে গিয়েছে সেখানে তার পরিবারের কোনো সদস্য নেই, কোনো আত্মীয়স্বজন নেই । তাই যৌন হয়রানি বা ধর্ষণের শিকার হওয়ার পর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে ওই দেশটির নাগরিক কোনো মেয়ে আশপাশ থেকে যেটুকু সহযোগিতা পাবে, বহিরাগত কোনো মেয়ের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয় না । কারণ, বহিরাগত মেয়েরা সেখানাকার অনেক কিছুই জানে না। পরে নানান জনের সাহায্য চেয়ে খোঁজখবর নিয়ে অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নিতে দেখা যায়, ততদিনে পরিস্থিতি ঠান্ডা হয়ে গেছে। আরও কষ্টদায়ক হলো, তারা বাবা-মাকেও ধর্ষণের দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানাতে পারে না । কারণ বাবা-মায়েরা শুনলে আতঙ্কিত হবে, ভেঙে পড়বে । পুলিশকে অভিযোগ জানালে পুলিশ বলে দেয় পরবর্তী সময়ে চলাচলের

সময় সাবধান থাকতে । মানে এদের কাছে ধর্ষণ বিষয়টা সাধারণ কোনো চুরি বা ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা যা পরবর্তী সময়েও ঘটতে পারে। তো শেষমেশ দেখা যায়, বুকের ভেতরে না-বলা কষ্টগুলো চেপে রেখে বাকি জীবনটা কাটাতে হয় ।

নারীকে কর্মক্ষেত্রে নিয়ে আসার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতয়ানকে বাস্তবায়ন করার এই চিন্তা খুব অসাধারণ রকমের প্রগতিবাজি। কারণ, নিরক্ষর বেকার ছেলেদের সংখ্যা নাহয় বাদই দিলাম, যোগ্যতাসম্পন্ন লাখ লাখ শিক্ষিত ছেলে বেকার হয়ে বসে আছে। কেউ কেউ নামে মাত্র বেতনে চাকরি করছে, কারও কারও বেতনের তুলনায় পরিশ্রম অনেক বেশি। উন্নয়নশীল, অনুন্নত, দরিদ্র, কমবেশি প্রায় সব দেশেই বেকারত্ব আছে। এই দেশগুলোর বেকারত্বের পরিসংখ্যান নাহয় বাদই দিলাম, খোদ উন্নত দেশগুলোতেই বেকারত্ব রয়েছে এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে এসব দেশের বেকারত্বের হার দিনকে দিন বেড়েই চলছে।

স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত মহৎ একটা পেশার নাম মাতৃত্ব । পুরুষ জাতিটা মানুষ গড়ার মতো এমন মহৎ কাজের যোগ্য নয় বিধায় স্রষ্টা নারীকেই এই পেশায় নিয়োজিত করেছেন। স্রষ্টা চাইলে পুরুষকেও গর্ভধারণ করাতে পারতেন । তবে পুরুষকে যে সকল বৈশিষ্ট্য তিনি দিয়েছেন, নারীকে দিয়েছেন এর চেয়েও উন্নত বৈশিষ্ট্য। ফলে নারীরা ১০ মাস গর্ভে সন্তান ধারণ থেকে নিয়ে সন্তান জন্ম দেওয়ার মতো অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করা, দুটো বছর নির্ঘুম রাত পার করে সন্তানকে লালন-পালন করা, বড়ো হওয়ার পর সন্তানকে

তুচ্ছ অনেক, তাই না? তবে এখন যদি কেউ বলে যে, নিঃস্বার্থভাবে সমাজসেবার কোনো অর্থনৈতিক মূল্য নেই, তখন সেই প্রশ্নকারী ব্যক্তির মনুষ্যত্ব আছে কি না, সেটা নিয়ে কি মনে প্রশ্ন জাগবে না? অবশ্যই জাগবে । আসলে নিজেদের বিবর্তনের ফসল মনে করা পশুদের কাছে মনুষ্যত্বের খোঁজ করাটা শুধু বোকামিই নয়; বরং সেটা পাগলামিও বটে। এরা তো মানুষের মতো হাত-পা আর চেহারা থাকা সত্ত্বেও চিন্তা-চেতনায় সেদিনই পশু হয়ে গিয়েছে, যেদিন থেকে এরা নিজেদের বানরের উত্তরসূরি ভেবেছে।

আজ যারা 'নারীর সম্পদের অধিকার', 'নারীর সম্পদের অধিকার' বলে চিল্লাফাল্লা করতে করতে ইসলামের সম্পদ বন্টনের দিকে আঙুল তোলে, এরা কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতেও নারীদের সম্পদের ভাগ দিত না। সম্পদের ভাগ দেবে তো বহু পরের ব্যাপার, 'নারী সম্পদ আইন'-ই এরা পাশ করেছে এই তো সেদিন ।

যুক্তরাষ্ট্র 'নারী সম্পদ আইন' পাশ করে ১৮৩৯ সালে (ছি ছি! লিখতেও তো লজ্জা লাগছে । কতটা ব্যাকডেইটেড ওরা!)। পরবর্তী সময়ে আবার যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রাজ্য এই আইন বাতিলও করে দিয়েছিল । এর এক দশক পরে এসে নারীকে সম্পদের ভাগ দিলেও নারীরা নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী সেই সম্পদ বিক্রি করা, ভাড়া দেওয়া এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না। সুতরাং ইসলাম নারীকে অধিকার বঞ্চিত করেনি, করেছে ওরা ।

যুক্তরাজ্য 'নারী সম্পদ আইন' পাশ করেছে ১৮৭০ সালে (ছি ছি। লিখতেও তো লজ্জা লাগছে। কতটা ব্যাকডেইটেড ওরা!)। ব্রিটিশ বলে কথা, এরা মার্কিনিদের থেকেও আরও বড়ো ঠগবাজ হওয়াটাই স্বাভাবিক । একজন নারী যেভাবেই অর্থ-সম্পদ উপার্জন করুক; হোক সেটা কাজ করে বেতন পাওয়া, বিনিয়োগ করে মুনাফা পাওয়া, উপহার হিসেবে অর্থ-সম্পদ পাওয়া কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থ-সম্পদ পাওয়া্বিয়ের পর তার সব সম্পদ স্বামীর অধীনে চলে যেত । এমনকি বিয়ের পর সে তার নিজের সম্পদের ওপর কোনো দাবিও রাখতে পারত না । এমনকি কোনো নারী যদি কোনো গ্রন্থ রচনা করত, সেই গ্রন্থস্বত্বও স্বামীর অধীনে চলে যেত । তবে ভূমি, দালানকোঠা এই ধরনের সম্পদে তার অধিকার থাকলেও সেগুলো বিক্রি করা, ভাড়া দেওয়া, নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ক্ষমতা তার থাকত না । অথচ এগুলো তার নিজের সম্পদ ছিল, স্বামীর থেকে পাওয়া সম্পদ নয়। সুতরাং ইসলাম নারীকে অধিকার বঞ্চিত করেনি, করেছে ওরা ।

তুচ্ছ অনেক, তাই না? তবে এখন যদি কেউ বলে যে, নিঃস্বার্থভাবে সমাজসেবার কোনো অর্থনৈতিক মূল্য নেই, তখন সেই প্রশ্নকারী ব্যক্তির মনুষ্যত্ব আছে কি না, সেটা নিয়ে কি মনে প্রশ্ন জাগবে না? অবশ্যই জাগবে । আসলে নিজেদের বিবর্তনের ফসল মনে করা পশুদের কাছে মনুষ্যত্বের খোঁজ করাটা শুধু বোকামিই নয়; বরং সেটা পাগলামিও বটে। এরা তো মানুষের মতো হাত-পা আর চেহারা থাকা সত্ত্বেও চিন্তা-চেতনায় সেদিনই পশু হয়ে গিয়েছে, যেদিন থেকে এরা নিজেদের বানরের উত্তরসূরি ভেবেছে।

আজ যারা 'নারীর সম্পদের অধিকার', 'নারীর সম্পদের অধিকার' বলে চিল্লাফাল্লা করতে করতে ইসলামের সম্পদ বন্টনের দিকে আঙুল তোলে, এরা কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতেও নারীদের সম্পদের ভাগ দিত না। সম্পদের ভাগ দেবে তো বহু পরের ব্যাপার, 'নারী সম্পদ আইন'-ই এরা পাশ করেছে এই তো সেদিন ।

যুক্তরাষ্ট্র 'নারী সম্পদ আইন' পাশ করে ১৮৩৯ সালে । পরবর্তী সময়ে আবার যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রাজ্য এই আইন বাতিলও করে দিয়েছিল । এর এক দশক পরে এসে নারীকে সম্পদের ভাগ দিলেও নারীরা

নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী সেই সম্পদ বিক্রি করা, ভাড়া দেওয়া এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না। সুতরাং ইসলাম নারীকে অধিকার বঞ্চিত করেনি, করেছে ওরা ।

যুক্তরাজ্য 'নারী সম্পদ আইন' পাশ করেছে ১৮৭০ সালে। ব্রিটিশ বলে কথা, এরা মার্কিনিদের থেকেও আরও বড়ো ঠগবাজ হওয়াটাই স্বাভাবিক । একজন নারী যেভাবেই অর্থ-সম্পদ উপার্জন করুক; হোক সেটা কাজ করে বেতন পাওয়া, বিনিয়োগ করে মুনাফা পাওয়া, উপহার হিসেবে অর্থ-সম্পদ পাওয়া কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থ-সম্পদ পাওয়াবিয়ের পর তার সব সম্পদ স্বামীর অধীনে চলে যেত । এমনকি বিয়ের পর সে তার নিজের সম্পদের ওপর কোনো দাবিও রাখতে পারত না । এমনকি কোনো নারী যদি কোনো গ্রন্থ রচনা করত, সেই গ্রন্থস্বত্বও স্বামীর অধীনে চলে যেত । তবে ভূমি, দালানকোঠা এই ধরনের সম্পদে তার অধিকার থাকলেও সেগুলো বিক্রি করা, ভাড়া দেওয়া, নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ক্ষমতা তার থাকত না । অথচ এগুলো তার নিজের সম্পদ ছিল, স্বামীর থেকে পাওয়া সম্পদ নয়। সুতরাং ইসলাম নারীকে অধিকার বঞ্চিত করেনি, করেছে ওরা ।

তুচ্ছ অনেক, তাই না? তবে এখন যদি কেউ বলে যে, নিঃস্বার্থভাবে সমাজসেবার কোনো অর্থনৈতিক মূল্য নেই, তখন সেই প্রশ্নকারী ব্যক্তির মনুষ্যত্ব আছে কি না, সেটা নিয়ে কি মনে প্রশ্ন জাগবে না? অবশ্যই জাগবে । আসলে নিজেদের বিবর্তনের ফসল মনে করা পশুদের কাছে মনুষ্যত্বের খোঁজ করাটা শুধু বোকামিই নয়; বরং সেটা পাগলামিও বটে। এরা তো মানুষের মতো হাত-পা আর চেহারা থাকা সত্ত্বেও চিন্তা-চেতনায় সেদিনই পশু হয়ে গিয়েছে, যেদিন থেকে এরা নিজেদের বানরের উত্তরসূরি ভেবেছে।

আজ যারা 'নারীর সম্পদের অধিকার', 'নারীর সম্পদের অধিকার' বলে চিল্লাফাল্লা করতে করতে ইসলামের সম্পদ বন্টনের দিকে আঙুল তোলে, এরা কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতেও নারীদের সম্পদের ভাগ দিত না। সম্পদের ভাগ দেবে তো বহু পরের ব্যাপার, 'নারী সম্পদ আইন'-ই এরা পাশ করেছে এই তো সেদিন ।

যুক্তরাষ্ট্র 'নারী সম্পদ আইন' পাশ করে ১৮৩৯ সালে পরবর্তী সময়ে আবার যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রাজ্য এই আইন বাতিলও করে দিয়েছিল । এর এক দশক পরে এসে নারীকে সম্পদের ভাগ দিলেও নারীরা নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী সেই সম্পদ বিক্রি করা, ভাড়া দেওয়া এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না। সুতরাং ইসলাম নারীকে অধিকার বঞ্চিত করেনি, করেছে ওরা ।

যুক্তরাজ্য 'নারী সম্পদ আইন' পাশ করেছে ১৮৭০ সালে। ব্রিটিশ বলে কথা, এরা মার্কিনিদের থেকেও আরও বড়ো ঠগবাজ হওয়াটাই স্বাভাবিক । একজন নারী যেভাবেই অর্থ-সম্পদ উপার্জন করুক; হোক সেটা কাজ করে বেতন পাওয়া, বিনিয়োগ করে মুনাফা পাওয়া, উপহার হিসেবে অর্থ-সম্পদ পাওয়া কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থ-সম্পদ পাওয়াবিয়ের পর তার সব সম্পদ স্বামীর অধীনে চলে যেত । এমনকি বিয়ের পর সে তার নিজের সম্পদের ওপর কোনো দাবিও রাখতে পারত না । এমনকি কোনো নারী যদি কোনো গ্রন্থ রচনা করত, সেই গ্রন্থস্বত্বও স্বামীর অধীনে চলে যেত । তবে ভূমি, দালানকোঠা এই ধরনের সম্পদে তার অধিকার থাকলেও সেগুলো বিক্রি করা, ভাড়া দেওয়া, নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ক্ষমতা তার থাকত না । অথচ এগুলো তার নিজের সম্পদ ছিল, স্বামীর থেকে পাওয়া সম্পদ নয়। সুতরাং ইসলাম নারীকে অধিকার বঞ্চিত করেনি, করেছে ওরা ।

এই গেল পশ্চিমা পালের দুই গোদার অবস্থা।

জার্মানিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেও সম্পদের মালিক হওয়ার কোনো অধিকার নারীদের ছিল না। পরবর্তী সময়ে নারীকে সম্পদের মালিক হওয়ার অনুমতি দিয়ে আইন করা হলেও সেটা করা হয়েছিল কোনো পুরুষ অভিভাবকের অধীনে উক্ত সম্পদ পরিচালনার ক্ষমতা রেখে।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতেও স্পেনের নারীরা যেকোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কিংবা সম্পদের মালিক হতে চাইলে স্বামীর অনুমতি নিতে হতো। ফ্রান্স নারীকে সম্পদের অধিকার দিয়েছে ১৭৯১ সালে, আর রাশিয়া দিয়েছে ১৭৩১ সালে ।

২००৫ সালের আগে হিন্দু আইনে তো মেয়েরা বাবার সম্পদ কিছুই পেত না । সে হিসেবে ভারত আসলেই 'মহাভারত' ।

অথচ সেই ১৪০০ বছর আগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর শেষ কিতাব পবিত্র কুরআনুল কারিমে নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার কড়ায় গন্ডায় বুঝিয়ে দিতে আদেশ দিয়েছেন এবং এত কড়াকড়ি আদেশ এটুকেউ তা ঠিকমতো পালন না করলে তার ঠিকানা হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

'মাতা-পিতা ও আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে, আর মাতা-পিতা ও আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; তা অল্পই হোক আর বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ। '(সূরা নিসা : ৭) ৭ নং আয়াতের পরের আয়াগুলো সম্পদ কীভাবে বণ্টন করবে, কে

কতটুকু সম্পদ পাবে, সেটা নিয়ে আলোচনা আছে। এরপর ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন–

‘এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত, তারা তাতে চিরবাসী হবে এবং এটা বিরাট সাফল্য ।’(সূরা নিসা : ১৩)

ঠিক এর পরের আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানি করবে এবং তাঁর নিরি সীমালঙ্ঘন করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন। সে াতে চিরবাসী হবে এবং সে অবমাননাকর শাস্তি ভোগ করবে !” (সূরা নিসা : ১০০)

অর্থাৎ, উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া নারীর সম্পদ নারীকে ঠিকঠাকমতো বুলিয়ে দিলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সম্পদ বণ্টনকারীকে জান্নাতে দাখিল করবেন, অন্যথায় তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত । শুধু তা-ই নয়, সেখানে সে সারাজীবন থাকবে । মানে একসময় শাস্তি শেষ করে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নেওয়া হবে না তাকে। এককথায় যাকে বলে চিরস্থায়ী শাস্তি, চিরস্থায়ী জাহান্নাম। অর্থাৎ নারীদের সম্পদের অধিকার রক্ষায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কতটা কঠোর হলেন! ফরজ সলাত কত রাকাত পড়তে হবে, ফরজ সিয়াম কয়টা রাখতে হবে, পবিত্র কুরআনুল কারিমে সেটা স্পষ্ট উল্লেখ করা না থাকলেও, পিতা-মাতার সম্পদ ছেলে সন্তান, মেয়ে সন্তানরা কে কতটুকু পাবে, সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারিমে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন। ইসলাম এই বিষয়টা কতটা গুরুত্বের সাথে দেখেছে, বুঝতেই পারছেন ?

যাহোক, এগুলো নিয়ে এই পর্যন্ত অনেক বড়োবড়ো ইসলামি-বুদ্ধিজীবীরা অনেক বক্তব্য রেখেছেন। তারা যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন, ইসলামের সম্পদ বন্টন আইন কতটা নিখুঁত ও যৌক্তিক। তাই নতুন করে একই আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করাটা সময়ের অপচয় হবে। যারা সত্যিকারেই যুক্তিবাদী তারা অবশ্যই ইসলামের আইনের সামনে মাথা নত করবে। আর যারা গোঁয়াড়, তাদের হাজারটা যুক্তি দেখালেও ইসলামের দিকে আঙুল তুলবেই । আমি বরং সত্যকে অন্বেষণ করা প্রকৃত যুক্তিবাদী মানুষগুলোকে ইসলামের সম্পত্তি বণ্টনের বিষয়টাকে একটু ভিন্নভাবে দেখতে শেখানোর চেষ্টা করি ।

‘পিতার সম্পত্তির অংশ ভাই যেই পরিমাণ পায়, বোন কেন তার অর্ধেক পায়?” তর্কটা তো এটা নিয়েই, তাই না?

তার আগে বলুন তো, অর্থ উপার্জন করে কিংবা সম্পদ দিয়ে কী করা হয়? সংসার খরচ যেমন–খাবার, পোশাক, বাড়িভাড়া, সন্তানের লেখাপড়ার খরচ, চিকিৎসার খরচ, ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ, ভ্রমণ, আনুষঙ্গিক আরও নানা খরচ এই তো?

আচ্ছা, কখনো কি এমন হয়েছে যে, স্বামী দামি গাড়িতে একাই চড়ে, কিন্তু স্ত্রীকে সেই গাড়িতে চড়তে না দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়? কিংবা দামি একটা বিছানায় স্বামী একাই ঘুমায়, কিন্তু স্ত্রীকে মাটিতে ঘুমাতে দেয়? কিংবা শীতাতপ নিয়ন্ত্রকের ঠান্ডা বাতাস স্বামী একাই ভোগ করে, স্ত্রীকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস খেতে হয়; কিংবা আলিশান বাড়িতে স্বামী একাই থাকে, কিন্তু স্ত্রীকে রেখেছে চিলেকোঠায়; কিংবা বাগানে স্বামী একাই বসে অবসর সময়টা উপভোগ করে, কিন্তু স্ত্রীকে বসে থাকতে হয় খুপড়ী কোনো ঘরে; কিংবা স্বামী কিনেছে দামি পোশাক, কিন্তু স্ত্রীকে পোশাক কিনে দিয়েছে কম দামী; কিংবা স্বামী সব সময় রাজকীয় খাবার খায়, কিন্তু স্ত্রীকে সব সময় চাকর-চাকরানির খাবার খেতে হয়?

না কখনই এমন হয়নি, এমন হয় না, আর কখনো এমনটা হবেও না। (ব্যতিক্রম কিছু যদি ঘটে, তবে সেটা উদাহরণ হিসেবে ধর্তব্য হওয়া উচিত না।)

অর্থাৎ সম্পদ যার-ই হোক, অর্থ উপার্জন যে-ই করুক, সেগুলো সমানভাবে ভোগ করে স্বামী-স্ত্রী দুজনই । স্বামী কখনই স্ত্রীকে বলে না যে, এটা আমার, এটা তুমি ধরবে না; ওটা আমার ব্যক্তিগত, ওটা ব্যবহার করবে না; ওই খাবারটা শুধু আমি একাই খাব । বরং স্বামী একটা নতুন বাড়ি করলে স্ত্রী বলে, আমাদের একটা নতুন বাড়ি করেছে। ঠিক যেমনটা সে বিয়ের আগে বাবার বাড়িতে থাকার সময় তার বাবা কোনো কিছু কিনে আনলে বলত, এটা আমাদের।

এরই নাম দম্পতি, এক জোড়া পাখির মতো। এদের দেহ দুইটা, হৃদয় একটা। গরিব দম্পতির শোবার বালিশ যদি একটা থাকে, তবে স্বামীর বুকে মাথা রেখেই স্ত্রী দিব্বি ঘুমাতে পারে, এই ঘুমটা আরও বেশি আরামের হয়। খাবার যদি একজনের থাকে, সেই খাবার দুজনে দুই ভাগ করে খেয়ে পেট না ভরলেও অন্তরটা ভালোবাসায় ভরে থাকে । ‘অভাবে ভালোবাসা জানালা দিয়ে পালায়'–এটা ভিত্তিহীন কথা। যদি তা-ই হতো, তবে ধনী দম্পতিদের বিবাহবিচ্ছেদ হয় কী জন্য?

তাই মিলেমিশে থাকা এমন দম্পতির মাঝে ভেদাভেদ তো বহু দূরের ব্যাপার, উলটো ওরা একে অপরের মাঝে নিজেকে খুঁজে পায়। ওদের চোখ আলাদা হলেও দৃষ্টি হয় একটা। ওদের ভালো লাগা, মন্দ লাগা

সবই এক, পছন্দ- অপছন্দ সবই এক । ওরা হাসে-কাঁদে একসাথে; আনন্দ, ফুর্তি, দুঃখ, বেদনা, দুশ্চিন্তা–সবকিছুই ওদের একসাথে ।

স্বামী-স্ত্রীর এমন মধুর ভালোবাসায় ভরা দাম্পত্যজীবনের বিপরীত অন্যরকম কোনো দাম্পত্যজীবন কি কল্পনা করা যায়? কস্মিনকালেও না। কারণ, তখন আর সেটা দাম্পত্যজীবন থাকবে না। দম্পতি মানেই একে অপরের অর্ধেক । দম্পতি মানেই দুটো শরীর একটি মন। দম্পতি মানেই ভালোবাসার ভাগাভাগি–যেখানে দুটো মানুষকে আলাদাভাবে দেখার কোনো অবকাশ নেই । তাই টোনাটুনির সংসারে সম্পদ বলতে যা-ই থাকুক না কেন, সেটার ভাগাভাগি হবে সমান সমান, অধিকারও হবে সমান সমান।

এই বাস্তবতাগুলো মাথায় রেখে আর দৃষ্টি ভঙ্গিকে সামান্য একটু পালটে সামনের কথাগুলোতে মনোযোগী হোন। দৃষ্টিভঙ্গি পালটানোর মানে এই নয় যে, আপনাদের নতুন কোনো তত্ত্ব গিলতে বলছি । বরং যে বিষয়টাকে এতদিন ভুলভাবে দেখতে শেখানো হয়েছে, সেটাকে সঠিকভাবে দেখানোর চেষ্টা করছি।

স্বামী তার বাবার কাছ থেকে পেল ১ ভাগ সম্পত্তি, আর স্ত্রী তার বাবার কাছ থেকে পেল আধা ভাগ সম্পত্তি; দুইজনে মিলে হলো দেড় ভাগ সম্পত্তি । এই দেড় ভাগ সম্পত্তি কি দুইজনে মিলে সমানভাবে ভোগ করবে না? অবশ্যই । তাহলে ভাই পেল ১ আর বোন পেল আধা, এভাবে কেন ভাবেন? স্বামী পেল ১, স্ত্রী পেল আধা, এরপর তারা একসাথে মিলেমিশে সুখে জীবনযাপন করলো–এভাবে ভাবা যায় না? আসলে সমস্যাটা হলো যারা আপনাকে মুক্তচিন্তার বুলি শোনায়, এরা নিজেরাই আপনার নিজস্ব ভাবনার জগৎটাকে ওদের হাতের মুঠোতে নিয়ে এসেছে। জি, আপনি মানসিক দাসত্ব করছেন। আপনি একজন মানসিক দাস। যারা অন্যের মগজ দিয়ে ভাবে, তারাই মানসিক দাস । একবিংশ শতাব্দীতে এখন আর চাবুকের আঘাতে দাস বানানো হয়না। খুব কৌশলে বুদ্ধির দাসত্ব করাতে পারলে শারীরিক দাসত্বটা এমনি এমনিই পাওয়া যায়।

প্রাপ্তবয়সে (ইসলামের দৃষ্টিতে প্রাপ্তবয়স) একটা মেয়েকে বিয়ের পর স্বামীর সংসারেই থাকতে হয়। সেই হিসেবে একটা মেয়ে তার জীবনের বেশিরভাগ সময় স্বামীর সংসারেই কাটায় । মেয়ে তার বাবার সম্পদের নির্দিষ্ট একটা অংশ নিয়ে স্বামীর বাড়ি চলে যায়। স্বামী তার বাবার সম্পদের নির্দিষ্ট একটা অংশ নিয়ে স্ত্রীর সাথে থাকে । ব্যতিক্রম ঘটনা বাদ দিলে, প্রতিটা মেয়েই কারও না কারও স্ত্রী হয়, আর প্রতিটা ছেলেই কারও না কারও স্বামী হয় । মেয়ে হিসেবে বাবার কাছ থেকে যা পেল, কারও স্ত্রী হওয়ার পর স্বামীর সংসারে গিয়ে স্বামীর সম্পদের সাথে সেটা মিলে হচ্ছে দেড়। একইভাবে ছেলে হিসেবে বাবার কাছ থেকে যা পেল, বিয়ের পর স্ত্রীর সম্পদের সাথে সেটা মিলে হয় দেড়। উভয় দিকেই সমান সমান । সুখী দাম্পত্য জীবন।

অথচ ‘ছেলে পেল এক, মেয়ে পেল আধা' অথবা ‘বোন কেন ভাইয়ের তুলনায় অর্ধেক সম্পত্তি পায়', এসব বলে বলে বিষয়টাকে অযৌক্তিকভাবে সামনে তুলে এনে স্বামী-স্ত্রীর এমন সুন্দর, মধুর, পবিত্র একটা সম্পর্ককে নষ্ট করার পাঁয়তারা করছে পশ্চিমা লেজকাটারা। মুসলমানদের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে ওদের পোষা সাংবাদিক, নামধারী প্রগতিশীল, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী আর সুশীল নামক ধূর্ত শেয়ালদের।

অথচ সাধারণ মানুষ না জেনে না বুঝে পশ্চিমাদের সঠিক পথপ্রদর্শক মনে করে ওদের পায়ে ভর করে পথ চলছে, ওদের চোখে ওদের মতো করে স্বপ্ন দেখতে শিখছে, ওদের আদর্শ বানিয়ে ওদের মতো করে জীবনকে সাজাতে চাইছে

দর্শক ও প্রদর্শক

আচ্ছা একটা প্রশ্নের উত্তর দিন তো, একজন পুরুষ অপরিচিত কোনো নারীর দিকে তাকিয়ে কী দেখে? লজ্জা লাগছে উত্তর দিতে? ভাবতেও লজ্জা লাগছে, তাই না? মুখে উচ্চারণ না করলেও উত্তরটা আমরা সবাই জানি । এখন কথা হলো, চোখ দিয়ে অপরিচিত কোনো নারীর শরীরের সৌন্দর্য উপভোগ করাটাকে কি কোনোভাবে ভালো কাজ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে? কখনোই না। একটা বাস্তব উদাহরণ দিচ্ছি।

ধরুন ‘ক’ এবং ‘খ’ নামক দুজন ব্যক্তির দুজনই শারীরিকভাবে সব দিক থেকে সুস্থ এবং তাদের শরীরের প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যক্ষমতা ঠিকঠাকমতো আছে । শুধু ব্যক্তি 'ক' এর চোখ দুটো অন্ধ । একদিন এই দুজন ব্যক্তিকে দুজন সুন্দরী নারীর সাথে বিবাহ দেওয়া হল ।

এখন সাধারণ জ্ঞান থেকে সহজ একটা প্রশ্নের উত্তর দিন তো দেখি, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তিটি তার স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে তুলনামূলকভাবে বেশি সুখ ও শান্তি পাবে?

স্বাভাবিকভাবেই সহজ উত্তরটা হবে ব্যক্তি ‘খ’ । কারণটা নিশ্চয়ই আর ভেঙে বোঝাতে হবে না । চাইলে আলোচনার এই পর্যায়েই কথা শেষ করে দেওয়া যায় শুধু এই বলে যে, ‘বুঝেছেন নারীদের পর্দা করে ঘরের বাহিরে বের হতে হয় কেন?”

তবে আমার কথা আমি এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি না । আমি আমার কথা আরও কিছুটা সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছি শুধু কিছু প্রশ্ন করব বলে। ইসলামের সমালোচকদের অজ্ঞতাপূর্ণ প্রশ্ন অনেক

শোনা হয়েছে। এবার আমরা প্রশ্ন করব, আর ওরা সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে। কারণ, ওরা সব সময় কল্পনার জগতের মধ্যে থেকে বাস্তবিক জগৎটাকেও কল্পনার জগৎ বানিয়ে ফেলছে।

নারীদের পর্দাহীন পোশাক ভালো চরিত্রের পুরুষের মনকেও প্রভাবিত করে। কারণ সে পুরুষ। তবে এই ভালো চরিত্রের পুরুষরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ভয়ে নিজেকে অবৈধ কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখে । এমনকি চলার পথে কোনো নারীর দিকে যদি চোখ পড়েও যায়, তবে সেই নারীকে নিয়ে ভালো চরিত্রের পুরুষরা দ্বিতীয়বার ভাবতেও ভয় পায় । আর এই কাজটাই বদ চরিত্রের পুরুষরা করতে পারে না । যার ফলে এই বদ চরিত্রদের মধ্য থেকে অতি বদ চরিত্রের পুরুষরা (কাপুরষরা) কুকুরের মতো কোনো অসহায় নারী কিংবা কোনো বদ নারীর ওপর হামলে পরে।

তবে একটা জিনিস দেখে খুব অবাক হই যে, 'পবিত্র কুরআনে পুরুষের চোখের পর্দার আদেশ আগে দেওয়া আছে'এই ব্যাপারটা ততটা প্রচারিত হয় না, যতটা প্রচরিত হয় নারীদের পর্দার বিষয়টা। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রথমে পুরুষদের পর্দার আদেশ দিয়েছেন, এরপর নারীদের। আদেশ আগে যার ওপরে আসে তাকেই প্রথমে পালন করতে হয়। তাই, প্রথমে পুরুষের চোখের দৃষ্টি নিচে থাকবে। পাশাপাশি নারীদের দৃষ্টিও নিচে থাকবে, এবং নারীরা নিজেদের সম্পূর্ণ ঢেকে রাখবে ।
পাশাপাশি–

১. জনসম্মুখে ধর্ষকের শাস্তি শিরশ্ছেদ করে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে ।

২. নারী-পুরুষের শিক্ষপ্রতিষ্ঠান, পরিবহন, কর্মস্থল, বিপণিবিতান, হাসপাতাল ইত্যাদি আলাদা হবে ।

৩. পর্নোগ্রাফি তৈরি ও প্রচার বন্ধ করতে হবে । এগুলো যারা তৈরি করে এবং যারা প্রচার করে, এদের কঠোর শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

,

৪. নারীদের দিয়ে নাটক, চলচ্চিত্র, গান, বিজ্ঞাপন ও মডেলিংয়ের মতো অশ্লিল কাজ বন্ধ করতে হবে । এসব অশ্লীল কাজ যারা করে এবং যারা প্রচার করে, এদের কঠোর শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

৫. পতিতালয় গুলো বন্ধ করতে হবে এবং এগুলো যারা পরিচালনা করে, এদের কঠোর শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

৬. ছেলেমেয়ে সাবালক হলেই বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে। '১৮ বছরের নিচে বিয়ে করা যাবে না' এসব অবৈজ্ঞানিক, মনগড়া, অকার্যকর ও ভিত্তিহীন আইন বাতিল করতে হবে ।

৭. বিবাহকে সহজ করে দিতে হবে, যেন ছেলেমেয়েরা স্বল্প খরচে বিয়ে করতে পারে। বিয়ের প্রচলিত কুপ্রথা ভেঙে সুন্নাহমতো কম খরচে বিবাহের ব্যবস্থা

করতে হবে।

৮. পুরুষের একাধিক বিবাহকে সমর্থন করতে হবে।

৯. বিবাহবহির্ভূত অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা নিষিদ্ধ করে এগুলোকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে। অবিবাহিত কেউ জিনা-ব্যভিচার করলে ১০০ বেত্রাঘাতের আইন থাকতে হবে ।

১০. বিবাহিত কেউ জিনা-ব্যভিচার করলে পাথর ছুড়ে হত্যার আইন থাকতে হবে।

১১. নারীরা পুরুষ অভিভাবক ছাড়া অনেক দূরত্বের পথ একা ভ্রমণ করবে না । অর্থাৎ, এই সংক্রান্ত সবগুলো ইসলামিক আইন একত্রে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর যদি আইনগুলোর আংশিক প্রয়োগ করে বলা হয়–ইসলামি আইন কাজে দিচ্ছে না, তখন সেটা হবে 'ডাক্তারের পরামর্শ আংশিক মেনে ডাক্তারের চিকিৎসা কাজে দেয়নি' বলার মতো।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পর্দার বিধান দিয়ে আসলে একজন বিবাহিত পুরুষকে শিখিয়েছেন যে, কী উপায়ে তার স্ত্রীকে সে প্রচণ্ড রকম ভালোবাসবে। আমি বহুবার ভেবে দেখেছি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পর্দার বিধান না দিলেও আমার ভেতরের প্রকৃতি আমাকে বলত, তোর স্ত্রীকে ঢেকে রাখ। কারণ আমার স্ত্রীকে কেউ দেখলে সেটা আমি কক্ষনো সহ্য করতে পারব না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর সৃষ্টিকে খুব ভালো করেই জানেন। তিনি জানেন স্ত্রীকে প্রচন্ড রকমের ভালোবাসা আধা-পাগল স্বামীগুলোর বুকের জ্বলুনি কমানোর জন্য পর্দার বিধান দিতে হবে। অন্যথায় এই স্বামীগুলো হিংসার জ্বলুনিতে জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যাবে । আর এখন পর্দার বিধান আছে বিধায়, কোনো স্ত্রী পর্দা করতে না চাইলে এই আধা-পাগল স্বামীগুলো জোর করে হলেও স্ত্রীকে পর্দা করাতে পারবে, অথবা এই স্ত্রীরাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ভয়ে পর্দা করে চলবে । আমরা জানি যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর একটা নির্দেশ দিয়ে অনেক কিছুর সমাধান দিয়ে থাকেন। বিয়ের পর এবং বয়স বাড়ার

সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই মেয়েদের সৌন্দর্য কমতে থাকে। একজন নারীকে ৪০ বছর বয়সে যতটা বয়স্ক লাগে, সেই তুলনায় একজন পুরুষকে ৪০ বছর বয়সে ততটা বয়স্ক লাগে না । মাঝে মাঝে ব্যতিক্রমও হয়; তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটে ।

যাহোক, এখন দেখা গেল–পর্দার বিধান সমাজে প্রয়োগ না করার ফলে কম বয়সি কোনো বেপর্দা মেয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, আর স্বামীও চোখের পর্দা না করার কারণে সেই বেপর্দা মেয়েকে দেখে তার মনে কুভাবনা আসছে । অথবা দেখা গেল, নায়িকা নামক চলচ্চিত্রের অর্ধ-উলঙ্গ বেশ্যার নাচের প্রতি স্বামী খুবই আসক্ত । অথবা দেখা গেল, সাইনবোর্ডের বিজ্ঞাপনে কোনো আধা-বেশ্যা

সুন্দরী নারীকে দেখে স্বামী মোহগ্রস্ত। তখন দেখা যাবে, বাড়িতে তার স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে তার স্ত্রীর প্রতি ততটা আকৃষ্ট হতে পারবে না, যতটা আকৃষ্ট সে হয়েছে ওই অপরিচিত বেপর্দা মেয়ে, বেশ্যা আর বিজ্ঞাপনের আধা-বেশ্যা সুন্দরী নারীর প্রতি । কারণ তার স্ত্রীর বয়স বেড়েছে, স্ত্রীর সৌন্দর্য আর আগের মতো নেই। আর মানুষের একটা চিরাচরিত স্বভাব হলো, কোনো জিনিস প্রতিদিন পেলে সেটার প্রতি অনাগ্রহী হওয়া। আর সহজে যেটা পাওয়া যায়, সেটার প্রতি আকর্ষণ কম থাকাটা মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি ।

ফলে দেখা গেল, ঘরে ফেরার পর সেই স্বামী তার স্ত্রীর দিকে ফিরেও তাকায় না । বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব স্বামীরা অবৈধ পরকীয়ায় জড়ায় ।

উলটো দিকে, কোনো স্ত্রী তার চোখের পর্দা না করার কারণে অন্য কোনো অবিবাহিত যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। স্ত্রীর বেপর্দা চলাফেরার কারণে চোখের পর্দা না করা কোনো অবিবাহিত যুবকও অন্যের এই বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়। দেখা যায়, কাজের চাপে বা সংসারের ঘানি টানতে গিয়ে স্ত্রীর সাথে তেমন আবেগপূর্ণ কথা বলার সময় হয় না স্বামীর । সেই সুযোগটা কাজে লাগায় দুশ্চরিত্রা এসব স্ত্রীরা । এই সমাজে এমন কিছু ধান্দাবাজ লুইচ্চা-লম্পট ধরনের যুবক আছে, যাদের ধান্দাই হলো পরের স্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক করা। কারণ, এতে বহু লাভ আছে। একে তো সেই নারীকে বিয়ে করার কোনো চাপ থাকবে না, তাই যেভাবে খুশি সেভাবে মেলামেশা করতে পারবে । এতে যদি ওই নারীর পেটে অবৈধ বাচ্চাও চলে আসে, তবে সেটাকে ওই কপাল পোড়া স্বামীর সন্তান বলে জানবে সবাই। আর দ্বিতীয়ত, সেই নারীর স্বামী যদি পয়সাওয়ালা হয়, তবে তো সোনায় সোহাগা। স্বামীর উপার্জন করা পয়সা সেই অবৈধ প্রেমিকের পেছনে দেদারসে ভাঙবে ওই নারী । এই লম্পট, দুশ্চরিত্রদের জন্য এরচেয়ে লাভজনক আর কী হতে পারে! বিনামূল্যে নারীর দেহও পেল, সাথে টাকাও পেল ।

শেষমেশ দেখা যায়, পরিবারে আসে অশান্তি। একসময় পুরো পরিবারটাই ধ্বংস হয়ে যায় l

এই স্বামীরা যদি চোখের পর্দা করত আর ওই বেপর্দা মেয়েগুলো_ যারা পতিতা কিংবা নায়িকা নামক বেশ্যা কিংবা বিজ্ঞাপনের মডেল নামক আধা-বেশ্যা নয়– যদি পর্দা করে চলত; আর অশ্লীলতা বেহায়াপনা যদি সমাজ থেকে বন্ধ হতো; পাশাপাশি স্ত্রীরা যদি চোখের ও শরীরের পর্দা করত, আর ওই ধান্দাবাজ

লুইচ্চা-লম্পট ছেলেগুলো যদি চোখের পর্দা করে চলত, তবে গল্পগুলো কিন্তু এমন হতো না । পরিবারগুলো অন্তত টিকে থাকত ।

তখন দেখা যেত, ১৫-২০ বছরের দাম্পত্যজীবন পার হওয়ার পর বয়সের কারণে স্ত্রীকে দেখতে যেমনই দেখাক না কেন, স্বামী ঘরে ফিরে স্ত্রীর রূপের প্রশংসা করছে, আর স্ত্রীও স্বামীর ব্যস্ততার অবর্তমানে নিজেকে অন্যের কাছে বিলিয়ে দেয়নি। ফলে স্বামীর চোখে নিজের স্ত্রীর রূপের মূল্য যেমন থাকত, স্ত্রীর কাছেও স্বামীর চোখের চাহনির মূল্যও তেমন থাকত । তখন স্বামী যেমন ভাবত– আমি ছাড়া আমার স্ত্রীকে কেউ দেখতে পারবে না, স্ত্রীও তেমন ভাবতুআমার স্বামীর চোখ দুটো শুধু আমাকেই দেখবে। ফলে দুজনের প্রতি দুজনের শ্রদ্ধা ও মূল্যায়ন থাকত অনেক বেশি। এমন ধরনের সংসারগুলো ভাঙবে তো বহু দুরের ব্যাপার; বরং একে অপরকে আগলে রাখবে বছরের পর বছর, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ।

কারণ ওই যে আগেই বললাম, কারও কাছে যেই জিনিস যত মূল্যবান, সেই জিনিসকে সে তত বেশি আগলে রাখে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেখানে পর্দার বিধান দিয়ে একজন নারীর মর্যাদা সর্বোচ্চ করে দিলেন, তথাকথিত নারীবাদীরা সেখানে বলছে– ইসলাম নাকি নারীকে পর্দা করতে, বলে নারীর মর্যাদা নষ্ট করে দিয়েছে, নারীর অধিকারকে হরণ করে নিয়েছে। আচ্ছা, কাপড় খুলে চলাচল করলে মর্যাদা বাড়ে কীভাবে আর অধিকারই-বা রক্ষা হয় কীভাবে–আমাকে একটু বলবেন কেউ? নারীর অধিকার রক্ষা আর মর্যাদা বাড়ার সাথে উলঙ্গ হওয়ার কী সম্পর্ক?

নারীদের পর্দা করে শরীর ঢাকতে বলা হয় দেখে ইসলামের বিপক্ষে কথা বলা হয়। অথচ তথাকথিত সভ্য পশ্চিমা সমাজে হরহামেশাই নারীদের দিয়ে পতিতাবৃত্তি করিয়ে আর পর্নোগ্রাফি বানিয়ে নারীদের শুধু ভোগের বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে

একজন নারীকে ওরা ভোগের বস্তু মনে করে বলেই মিস ওয়ার্ল্ড নামক চটকদারি বিজ্ঞাপন দিয়ে নারীর শরীরের প্রদর্শনী করায় । ওরাই কিনা আবার নারীদের অধিকার, সম্মান, মর্যাদা বৃদ্ধি কীভাবে হবে, সেটা নিয়ে নানান কর্মসূচি দেয়, সভা-সমাবেশ করে। এ যেন শেয়ালের মায়াকান্না!

এই মায়াকান্না কাঁদতে গিয়ে ওরা বলে যে, ইসলাম নাকি পর্দা করার বিধান দিয়ে নারী স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে। ওদের কথা অনুযায়ী, কোনো নারী পর্দা করতে না চাইলে সেই নারীকে পর্দা করতে বাধ্য করাটা ওই নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে।

নারীদের মাথার তাজ বানিয়ে রেখেছে একেবারে। আপনি কি জানেন, লিবারেলিজম, সেক্যুলারিজম, ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন, ফ্রিডম অফ চয়েস, ফ্রিডম অফ স্পিচ, উইমেন্স রাইটস, উইমেন্স এম্পাওয়ারম্যান্ট নামক এসব শব্দের খেলা যারা দেখায়। (ইউরোপের প্রথম সারির দেশগুলোর প্রায় সবগুলোতেই মুসলিম নারীদের বোরকা পরিধান করাকে আদালত কর্তৃক আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুসলিম নারীরা মুখ ঢেকে পর্দা করে চলাচল করতে পারবে না । কিছু দেশ মুসলিম নারীদের প্রতি এতটাই কঠোর–যদি কোনো মুসলিম নারী এই আইন না মেনে বোরকা পরে রাস্তায় বের হয়, তবে সেই নারীকে উচ্চ হারে জরিমানা করা হয় ।

কোনো নারী নিজের ইচ্ছে থেকে পর্দা করতে না চাইলে, তাহলে সেই নারীকে পর্দা করতে বাধ্য করাটা যদি ওই নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়, তাহলে কোনো নারী নিজের ইচ্ছে থেকে পর্দা করতে চাইলে, সেই নারীকে পর্দা না করতে বাধ্য করাটা কি ওই নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে না? না, তা হবে না। এই ক্ষেত্রে এসে ওদের লিবারেলিজম, সেক্যুলারিজম, ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন, ফ্রিডম অফ চয়েস, ফ্রিডম অফ স্পিচ, উইমেন্স রাইটস, উইমেন্স এম্পাওয়ারম্যান্ট নামক যত ফাঁকা বুলি আছে সব একবারে জিন্দা দাফন হয়ে যাবে।

ওরা এতটা সাম্প্রদায়িক! এতটা অসহিষ্ণু! এতটা কট্টরপন্থি! এতটা মৌলবাদী যে, নারীর সামান্য একটা পোশাক পরিধানকে ওরা সহ্য করতে পারে না। অবৈধ আইন করে, জরিমানা করে, বলপ্রয়োগে নারীর মার্জিত পোশাক খুলে নিচ্ছে । ছি ছি ছি! ভাবতেও তো লজ্জা লাগে । সামান্য একটা পোশাকের জন্য ওরা এত নিচে নামতে পারে। ওয়াক থু! এই ওরাই আবার নারীর স্বাধীনতা, নারীর অধিকার, নারীর ক্ষমতায়নের গল্প শোনায় । নারীকে হাতে-পায়ে শেকল পরিয়ে রেখেছে আসলে ওরাই, কিন্তু মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছে ইসলামের ওপরে। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা নামক যেসব নিয়ম-কানুন ওরা তৈরি করে, শেষে দেখা যায় ওদের নিজেদের নিয়মকে ওরা নিজেরাই ভাঙে। অবশ্য ইচ্ছে করে ভাঙে না ওরা, নিজেদের কূটকৌশলের চিপায় নিজেরাই পড়ে যায় বলে ভাঙে ।

কারণ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের তত্ত্ব অনুযায়ী সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিতে গেলে তো ইসলাম প্রচার করতে দিতে হবে। আর ইসলাম যদি সঠিকভাবে প্রচার হতে থাকে, তখন ওদের সাধারণ অন্ধ

অনুসারীরা অনেকেই দেখবে যে, ওরা ইসলামকে ভুলভাবে, অপব্যাখ্যা দিয়ে, মিথ্যাভাবে উপস্থাপন করেছে এতদিন ।

একসময় নিজেদের অপরাধ ঢাকতে বলল–দেশের নিরাপত্তার জন্য মুখ বন্ধ করতে হয় এমন যেকোনো কিছু পরিধান করা যাবে না। এটা বলে ওরা বোঝাতে চাইলু'আমরা নারীদের উইমেন্স রাইটস, ফ্রিডম অফ চয়েস, ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন ইত্যাদিতে হস্তক্ষেপ করিনি। নিরাপত্তার জন্য বাধ্য হয়ে এই আইন করতে হয়েছে। এখন সেই আইনের আওতায় নারীদের বোরকার বিষয়টাও এসে পড়েছে।' অথচ ওদের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম নারীদের অধিকার হরণ করা।

যাহোক, এরপর যখন ওরা দেখল, বাইক চালাতে গেলে, ফাইটার জেট চালাতে গেলে, অপারেশন থিয়েটারে গেলে, দাঙ্গা বা পুলিশের সাথে মারামারি লাগলে ইত্যাদি আরও বিভিন্ন কারণে মুখ ঢাকতেই হচ্ছে। তখন দেখা গেল, ওরা ফাটা বাঁশের আরও চিপার মধ্যে পড়ে গেল। কারণ, একের পর এক কূটচাল দিতে গিয়ে নিজেদের জালে নিজেরাই জড়িয়ে যাচ্ছিল। এরপর দেখা গেল, 'বিশেষ প্রয়োজনে মুখ ঢাকা যাবে' এই মর্মে আইন সংশোধন করে বোরকা পরাকে একপ্রকার সরাসরিই নিষিদ্ধ করে দিলো। শেষমেশ ওদের হিংস্র শিকারির দাঁতগুলো ঠোঁটের কোনা দিয়ে বের করতেই হল ।

এই হলো নারীদের ব্যাপারে ওদের কথা ও কাজের বিপরীতমুখী সম্পর্কের কিঞ্চিৎ নমুনা।

তাহলে পেছনের আলোচনা থেকে জানতে পারলাম যে, একজন নারী পর্দা করে চলাফেরা করলে চোখ দিয়ে ধর্ষিত হবে না বা হাজারো পুরুষের অবৈধ অর্ধ যৌনসঙ্গিনী হবে না। কথা হলো, একশ্রেণির কিছু মানুষ বলছে নারীদের পর্দা করতেই হবে। যেমন– হুজুররা। অন্য আরেক শ্রেণির কিছু মানুষ নারীদের পর্দা করতে নিষেধ করছে। যেমন–তথাকথিত সুশীলরা। এটা পানির মতো পরিষ্কার যে, প্রথম শ্রেণির মানুষগুলো চোখ দিয়ে অন্য নারীর শরীর দেখতেও চায় না, উপভোগ করতেও চায় না। তাই তারা নারীদের মার্জিত বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে থাকতে বলছে। অর্থাৎ এই শ্রেণির মানুষগুলো উত্তম চরিত্রের অধিকারী, আর এটাও পানির মতো পরিষ্কার যে, দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষগুলো চোখ দিয়ে নারীর শরীর দেখতে চায়, উপভোগ করতেও চায়। তাই এরা নারীদের অর্ধ- উলঙ্গ শরীরে থাকতে বলছে। অর্থাৎ এই শ্রেণির মানুষগুলো নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী ।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলেও এটা সত্য যে, এই সমাজ দ্বিতীয় শ্রেণির নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী মানুষগুলোকে বর্জন না করে উলটো ওই প্রথম শ্রেণির উত্তম চরিত্রের অধিকারী মানুষ গুলোর মতাদর্শ

নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, আর দ্বিতীয় শ্রেণির ওই নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী অমানুষগুলোকে মাথায় তুলে রেখেছে বুদ্ধিজীবী, প্রগতিশীল, সুশীল নাম দিয়ে।

কতটা অদ্ভুত এই সমাজ! অদ্ভুত এই সমাজের মানুষ! আর অদ্ভুত তাদের ভাবনাগুলো! সত্যি কথা বলতে, যখন গোটা সমাজের অধিকাংশ মানুষের চরিত্রের অবক্ষয় ঘটে, তখন সেই সমাজের মানুষগুলো এমন অবিবেচকের মতো অদ্ভুত ভাবনা নিজেদের মধ্যে লালন করতে থাকে। অথচ তারা মনে করছে–তারা সভ্য যুগের, সভ্য দেশের, সভ্য শহরের সভ্য বাসিন্দা ।

সমস্যটা আসলে যুগের না। সমস্যাটা হলো মানুষের কাজের। জেনে রাখা ভালো যে, সময় অতীত হওয়ার কারণে অতীতের সময়টাকে 'অজ্ঞতার যুগ' বলা হয় না । একটা যুগকে অজ্ঞতার যুগ বলা হয় সেই সময়কার মানুষগুলোর কাজকর্মের কারণে। সেই যুগের মানুষ অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ করত বলেই সেই যুগের নাম হয়েছিল আইয়্যামে জাহেলিয়া । ঠিক তেমনি, এই তথাকথিত সভ্য যুগে এসে অতীতের ওই একই রকমের অজ্ঞতাপূর্ণ অসভ্য কাজ এখনও চলমান রেখে সভ্য জামা গায়ে দিলেই এখনকার এই যুগটাকে সভ্যতার যুগ বলা যায় না । যুগটা এখনও আইয়্যামে জাহেলিয়াতেই রয়ে গেছে।

'হে নবি পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে পর পুরুষের সঙ্গে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না; যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয়। তোমরা সংগত কথা বলবে। আর তোমরা নিজেদের গৃহে অবস্থান করো, প্রাচীন অজ্ঞতার যুগের মতো চোখ ঝলসানো প্রদর্শনী করে বেরিয়ো না। আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো, জাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। হে নবি পরিবার! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক করতে।' (সূরা আল আহজাব : ৩২-৩৩)

স্বাধীনতা মানে হলো– অন্যায়ের সামনে ন্যায়কে নির্বিঘ্নে তুলে ধরতে পারা, মিথ্যার সামনে বাধাহীনভাবে সত্যকে বলতে পারা, অবিচারকে ন্যায়বিচার দিয়ে প্রতিহত করতে পারা।

ক্ষমতায়ন হলো– নিজের মেধা, বুদ্ধি, ভাবনা, কৌশল, দক্ষতা, দূরদর্শিতা, সাহসিকতা দিয়ে ভুল পথে চলা একটা জাতিকে ভুল পথ থেকে সঠিক পথে জোর করে হলেও নিয়ে আসতে পারা ।

সমান অধিকার হলো–জাতি গঠনে, মানবতার কল্যাণে, দুনিয়ায় শান্তি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে নিজেদের এমন একটা মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে দাঁড় করান, যেন প্রভাবশালীরা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে আপনাদের অস্তিত্বকে গুরুত্ব না দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে না পারে ।

অর্থাৎ, প্রত্যেকটা পরিবারের প্রত্যেকটা মা তার সন্তানদের মানবিক, চরিত্রবান, বিবেকবান, আত্মমর্যাদাবান, সৎ, সাহসী, নীতিবান, ন্যায়পরায়ণ, পরোপকারী, নিঃস্বার্থ, নির্লোভী, দায়িত্বশীল, পরিশ্রমী করে গড়ে তুলতে পারলে খুব সহজেই শক্তিশালী একটা জাতি গড়ে তোলা যায়– যারা শিরদাঁড়া খাড়া করে পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে থাকবে ।

সুতরাং এসব ভুঁইফোড় তথাকথিত নারীবাদী সংস্থাগুলো সাধারণ নারীদের পক্ষের কোনো মঞ্চ নয় । এই পোষা ঘুঘুরা নিজেদের নারীবাদী বলে পরিচয় দিলেও প্রকৃতপক্ষে এরা নারীদের পক্ষে কাজ করে না। এদের লক্ষ্যই থাকে নতুন নতুন সাধারণ ঘুঘুদের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে আড়ালের ঠাকুরদের ভোগের বস্তু বানানো। এসব ভন্ড তথাকথিত নারীবাদীদের বিপক্ষে বলার মানে প্রকৃত নারীবাদের বিপক্ষে অবস্থান নয়; বরং কিছু নির্দিষ্টসংখ্যক ওই সব নারীদের নির্দেশ করা, যারা কিনা পোষা ঘুঘুর মতো শিকারির তথা আড়ালের ঠাকুর ও দুশ্চরিত্র পুঁজিপতিদের সেবাদাসী ও যৌনদাসী হয়ে আছে এবং ওদের কথার ফাঁদে ফেলে অন্যান্য সাধারণ নারীদেরও আড়ালের ঠাকুর ও দুশ্চরিত্র পুঁজিপতিদের দাসী-বাঁদি বানাচ্ছে। তাই 'নারীবাদ-নারীবাদ' বলে বলে যারা গলা খাঁকায়, এরা প্রকৃত নারীবাদী নয়; বরং এরা হলো নারীবাঁদি। উদাহরণস্বরূপ Lauren Southern নামক পোষা ঘুঘু আর Slut Walk ক্যাম্পেইনকারী ফাঁদে পড়া ওই ধর্ষিতা নারীদের ব্যাপারে পেছনের কথাগুলো স্মরণ করুন, এরপর দেখবেন আমার সব কথা খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে ।

সাধারণ নারীদের জন্য একমাত্র ও প্রকৃত নারীবাদী সংস্থা হলো 'ইসলাম', আর সেই সংস্থার প্রধান 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নারীদের অধিকারের জন্য প্রথমে কী চাইতে হবে, সেটা একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন ।

সাধারণ নারীরা সবচেয়ে বড়ো 'নারীবাদী' তাকেই বলবেন, যিনি আপনাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের বিষয় নিয়ে সর্বপ্রথম কথা বলেছেন। কে আছেন এমন? তিনিই, যিনি আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন । আর তাই আপনার প্রতি মায়া, ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি থাকবে তাঁরই। কীভাবে? প্রমাণ দেখুন ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

'তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় আর সে অন্তর্জালায় পুড়তে থাকে। লজ্জায় সে মানুষ থেকে মুখ লুকায় খারাপ সংবাদ পাওয়ার কারণে । সে চিন্তা

করে যে, অপমান মাথায় করে তাকে রেখে দেবে, নাকি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। হায়! তারা যা সিদ্ধান্ত করে, তা কতই-না জঘন্য!” (সূরা আন নাহল : ৫৮-৫৯)

সহজ-সাবলীল ও স্পষ্ট এই আয়াত দুটোর কথাগুলো পড়ে যদি নারীরা এখনও বুঝতে না পারেন যে, কে তাদের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী, কে তাদের সত্যিকারের বন্ধু, কে তাদের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, কে তাদের খুঁটিনাটি বিষয়ে খেয়াল রাখেন, কে তাদের অধিকার নিয়ে সবচেয়ে বেশি সচেতন, কে তাদের কণ্ঠ হয়ে তাদের পক্ষে কথা বলছেন; তবে তো আমাকে এখন বলতেই হচ্ছে যে, নারীদের মতো কপাল পোড়া জাতি আর দ্বিতীয়টি নেই।

Asian Centre For Human Rights (ACHR) Female Infanticide Worldwide: The Case for Action by The UN Human Rights Council' শিরোনামে ২০১৬ সালে একটি জরিপের প্রতিবেদন প্রকাশ করে ।

সাধারণত বিশ্বে ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশু জন্মানোর আনুপাতিক হার হলো–

প্রতি ১০২-১০৬ জন ছেলে শিশুর বিপরীতে ১০০ জন মেয়ে শিশু । এই হারে জন্মগ্রহণ করলে সারা বিশ্বে নারী-পুরুষের সংখ্যা যত হওয়ার কথা ছিল, পুরুষের সংখ্যা ঠিক তত হলেও নারীর সংখ্যায় হেরফের দেখা যায়। অর্থাৎ, নারী-পুরুষের আনুপাতিক জন্মহারের হিসাব অনুযায়ী মোট যতজন পুরুষ পৃথিবীতে থাকার কথা ছিল, পুরুষের সংখ্যা ততই আছে, কিন্তু যতজন নারী থাকার কথা ছিল, নারীর সংখ্যা তত নেই।

ওই প্রতিবেদনে United Nations সংস্থার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, ২০০৭ সালে জনসংখ্যাবিষয়ক একটি পরিসংখ্যান করে দেখা যায়, গর্ভপাতের কারণে সারা বিশ্বে ১১৩ মিলিয়ন (১১ কোটি ৩০ লাখ) থেকে ২০০ মিলিয়ন (২০ কোটি) নারী/মেয়ে জনসংখ্যার কোনো হদিস নেই ।

United Nations Population Fund (UNFPA) সংস্থার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, শুধু এশিয়াতেই গর্ভপাতের কারণে ১১৭ মিলিয়ন (১১ কোটি ৭০ লাখ) নারী/মেয়ে জনসংখ্যার কোনো হদিস নেই)

পশ্চিমা দেশগুলোর মানুষদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক, পরিবারব্যবস্থা, সামাজবদ্ধতা–এসব একেবারেই উঠে গিয়েছে। এদের পারিবারিক বন্ধন ভেঙে গিয়েছে। প্রতি মুহূর্তে এরা এখন আফসোস করে আর বুক

চাপড়ায় সুন্দর একটা পরিবারের জন্য । তাই নিজেরা যখন বর্বর জীবনযাপন করছে, তখন অন্য জাতির সুখ এদের আর সইছে না ।

(পশ্চিমা সমাজের মেয়েরা শিকারিদের মিষ্টি মিষ্টি কথায় চলে ধোঁকা খাওয়ার পর যখন বাস্তবতা বুঝতে শেখে, তখন চারপাশে তাকিয়ে দেখে–সবগুলোই মানুষরূপী অমানুষ। কিন্তু নারীর সৃষ্টিগত সহজাত প্রবৃত্তি হলো, সন্তান জন্ম দিয়ে লালন-পালন করে বড়ো করে পরিবার তৈরি করা । পরিবারব্যবস্থা ভেঙে যাওয়া সমাজের ওই নারীদের মনের ভেতরেও সন্তান লালন-পালন করার সহজাত প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে। কারণ, নারীদের প্রকৃতি এটাই। মা হতে পারাটা একটা নারীকে উচ্চতর মর্যাদায় আসীন করে। কিন্তু মা হতে গিয়ে কাকে বিশ্বাস করবে ওই অবলারা? নৈতিকতাবিবর্জিত ভোগবাদী ওই সমাজব্যবস্থা তো নারীকে পণ্যদ্রব্যের মতো ভোগ্যবস্তু বানিয়ে রেখেছে। তাই সেখানকার কোনো পুরুষকেই সেখানকার নারীরা বিশ্বাস করতে পারে না। তাই তারা বাকি জীবন একা একা কাটানোকেই শ্রেয় মনে করে ।

এমন পরিস্থিতিতেও ওই শিকারিরা বসে থাকে না। নারীদের পিছু এরা সহজে ছাড়ে না । পথভ্রষ্ট করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টাটুকু এরা চালিয়ে যায় । এই ক্ষেত্রেও সূক্ষ্ম চাল চেলে বসে আছে এরা। পুরুষের বীর্য বিক্রির ব্যবসা করে এই শিকারিরা। ওরা নারীদের শেখায়, স্বামী ছাড়াও কীভাবে গর্ভবতী হওয়া যায় । এক্ষেত্রে জানোয়াররূপী কিছু পুরুষরা অর্থের বিনিময়ে নিজেদের বীর্য স্পার্ম ব্যাংকের কাছে বিক্রি করে, সাথে নিজের জীবনবৃত্তান্তটা রেখে যায় । শিকারির দেখানো পথে পুনরায় হেঁটে একাকিত্বে থাকা নারীরা এসে সেই জীবনবৃত্তান্ত ঘেঁটে যেই পুরুষকে পছন্দ হয়, সেই পুরুষের বীর্য স্পার্ম ব্যাংক থেকে কিনে নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে নিজের জরায়ুতে প্রবেশ করিয়ে গর্ভবতী হয়ে মা ডাক শোনার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। এহেন জঘন্যতম কাজের কুবুদ্ধি কিন্তু ওই শিকারিদের । ওরা নিজেদের সমাজের নারীদেরও পর্যন্ত ছাড় দেয় না । আসলে ওরা গোটা নারী জাতিরই শত্রু। নারী জাতিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস না করা পর্যন্ত ওরা থামবে না ।

হাঁপিয়ে উঠেছি আসলে এসব বলতে বলতে। মাঝে মাঝে মাথা ভন ভন করে ঘোরে যখন এসব নিয়ে ভাবি। এদের চাকচিক্যময় জীবনের অন্তরালে আছে গাঢ় অন্ধকার। তাই অন্যের সুখ সইতে না পেরে অন্যের জীবনটাও ওদের মতো করে নষ্ট করতে চাইছে প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে জ্বলতে। সেজন্য ওদের প্রথম লক্ষ্য হলো– ফলবান বৃক্ষ যদি নষ্ট করা যায়, তবে তো খুব সহজেই ওদের লক্ষ্য পূরণ হয়ে যাবে ।

একটা পরিবার গড়ে তোলে একজন নারী। নারীকে ধ্বংস করলে পরিবার ধ্বংস হবে। আর পরিবার ধ্বংস মানে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংস। কারণ, সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন নষ্ট হওয়া পরিবারের সন্তানরা যা খুশি তা- ই করতে পারে। যেহেতু বাবা-মায়ের দাম্পত্যের বন্ধন ঠিক থাকে না, তাই স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যকার টানাপোড়েন মিটাতে গিয়ে সন্তানের খেয়াল রাখতে পারে না বা খেয়াল রাখার ইচ্ছে থাকলেও মানসিক শক্তিটা থাকে না । এদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য থাকে পরিবারপ্রথাকে বিলীন করে লিভ টুগেদার বা কোহ্যাবিশন নামক বিবাহবহির্ভূত অবৈধ শারীরিক সম্পর্কগুলোকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। পরিবারপ্রথা ভেঙে যাবে যদি 'বিবাহ' নিয়মটাই না থাকে। আর বিবাহ বিষয়টাকে বৈধতা দিয়েছে ধর্ম। তাইতো নাস্তিকরা ধর্মকে মানতে চায় না।

এদের এসব নীলনকশার পেছনে আরও একটা প্রধান উদ্দেশ্য হলো, মুসলিমদের জন্মহার কমিয়ে আনা। একটা জাতির ভবিষ্যৎ টিকে থাকে সেই জাতির ভবিষৎ প্রজন্মের ওপর (যদি না সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন কিছু সিদ্ধান্ত নেন)। যদি জনসংখ্যা কমে যেতে থাকে, তবে সেই জাতিকে অতি সহজেই পরাজিত এবং নিশ্চিহ্ন করা যায় । কারণ, প্রতিবাদের কণ্ঠগুলো আর তৈরি হয় না তখন । এই জন্যই এরা জন্ম বিরতিকরণ, সন্তান কম নেওয়া, কম বয়সে মা হওয়া ঝুঁকিপূর্ণ ইত্যাদি চিন্তাভাবনায় মুসলিম নারীদের উদ্বুদ্ধ করে। আর এদের পক্ষ হয়ে কাজটা করে দেয় এনজিওগুলো। এই এনজিওগুলোর নানা কর্মসূচিগুলোকে ওপর থেকে দেখলে এদের যতটা উপকারী বন্ধু মনে হয়, বাস্তবে এরা প্রত্যেকটাই একেকটা ধূর্ত শেয়াল ।

বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থ খরচ করে মানুষের দোরগোড়ায় গিয়ে গিয়ে বিনামূল্যে সেবা পৌঁছে দেওয়ার নামে পরিবারের ভেতরে ঢুকে পরিবার ধ্বংসের বীজ বপণ করে আসে এরা। ছোটখাটো দুয়েকটা উপকার এরা করে বটে, তবে উপকারের চেয়ে এদের অপকারিতার ক্ষতি অনেক অনেক বেশি ।

এরা খুব সূক্ষ্মভাবে ধীরে ধীরে আগায় । নারী জাতির অবক্ষয় > পরিবার ধ্বংস > বিবাহের নিয়ম তুলে দেওয়া > লিভ টুগেদার বা কোহ্যাবিশনকে প্রতিষ্ঠিত করা > মুসলিম জাতিকে নিশ্চিহ্ন করা > আল্লাহর আইনকে তুলে দিয়ে ইসলামকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলা ।

অর্থ, বুদ্ধি, শ্রম আর সময় ব্যয় করে যারা অন্যের সংসারে আগুন লাগাতে গিয়ে ফিরে এসে দেখে নিজের ঘরে আগুন লেগে গেছে, তখন তাদের অবশিষ্ট কাজ থাকে শুধু নিজের মাথার চুলগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলা ।

পশ্চিমারা অন্যান্য দেশের মুসলিম তরুণীদের পথভ্রষ্ট করার মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কী না করেছে এ পর্যন্ত। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি করেছে, অশ্লীল ফ্যাশন হাউস বানিয়েছে, নায়িকা নামক পতিতাদের ভরণ-পোষণ করেছে, পাঠ্যবইয়ে নোংরামি বিষয়বস্তু ঢুকিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপথগামী প্রফেসরদের পয়সা দিয়ে লালন-পালন করেছে, অমুক ইভেন্ট, তমুক ফেস্টিভ্যাল, এই দিবস, সেই দিবস উদ্ভাবন করেছে উদ্‌যাপন করেছে, নানান সংস্থা সংগঠন সাংস্কৃতিক দল বানিয়েছে। এসব দিবস পালন আর প্রতিষ্ঠানগুলো চালানোর জন্য দালাল তৈরি করতে হয়েছে। এই দালালদের উচ্চহারে মাইনে দিতে হয়েছে, পত্র-পত্রিকা আর ম্যাগাজিন ছাপাতে হয়েছে, টিভিতে টকশো করতে হয়েছে, তথ্যচিত্র বানাতে হয়েছে, সাংবাদিক-সম্পাদক পুষতে হয়েছে, ইসলামের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর অপপ্রচার করতে হয়েছে, আরও কত কি!)

আজকে ওদের জাতির নারীরাই বাহিরে গিয়ে কাজ করবে বলে বিয়ে করতে চায় না। বিয়ে করলেও সন্তান নেওয়ার ক্ষেত্রে এদের ভেতরে অনিহা কাজ করে। সারাদিন বাহিরে খাটাখাটুনির পর ক্লান্ত থাকে বলে দম্পতিরা সন্তান নেওয়ার মতো রোমান্টিক মুহূর্ত কাটানোর আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। সন্তান নিলেও তাকে সময় দেওয়ার মতো সময় বাবা-মায়ের থাকে না। কর্মজীবী বাবা-মা সন্তানকে প্রতি সপ্তাহে মোট ৮/১০ ঘণ্টা সময় দিলো নাকি ১২/১৪ ঘণ্টা সময় দিলো, সেসব নিয়েও জরিপ চলে এখন এদের । শেষমেশ সন্তানকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কোনো চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে। বাবা-মায়ের ভালোবাসা না পেয়ে বড়ো হয় বলে এই সন্তানরা বাবা-মায়ের গুরুত্ব বোঝে না। ফলে সন্তান বড়ো হয়ে বাবা-মাকে পাঠিয়ে দেয় ওল্ড কেয়ার সেন্টারে । ইটটি ছুঁড়লে পাটকেলটি তো খেতে হবেই! তাই ওদের এই সমাজকে আমি উপহাস করে 'ইটপাটকেলের সমাজ' নাম দিয়েছি।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর জন্মহার দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে। একটা জাতির জন্মহারের স্বাভাবিক হার হলো ২.১ (ওদের হিসাব অনুযায়ী)। প্রতিটা দম্পতি যদি দুটো করেও বাচ্চা জন্ম দেয়, তবে জনসংখ্যা বাড়বেও না কমবেও না । তার মধ্যে কত বাচ্চা জন্মের পর মারাও যায় । তাই দুটো সন্তান নেওয়াটাও ঝুঁকিপূর্ণ। অথচ এই দেশগুলোতে জন্মহার ২-এরও নিচে। সরকারিভাবে দম্পতিদের নানা প্রণোদনা দিয়েও সন্তান নেওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে পারছে না । ফলে এদের নিজেদের জনসংখ্যা দিনকে দিন কমে যাচ্ছে।

বিয়েকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অবৈধ যৌন সম্পর্ককে বৈধতা দিলো, এর পক্ষে ওকালতি করল, সাফাই গাইল, বিয়ে করে দীর্ঘ দাম্পত্যজীবন কাটানোর আগে একে অপরকে আরও কাছ থেকে চেনা উচিত যেন বিয়ে টিকে থাকে–এমন খোঁড়া যুক্তি দিয়ে লিভ টুগেদার বা কোহ্যাবিশনকে বৈধতা দিলো । ফলে

দেখা গেল, হিতে বিপরীত হলো। সামান্য ঝগড়াঝাঁটি লেগে পরস্পর আলাদা হয়ে যাওয়ার পর এরা বিয়ের ধারে কাছেও আসে না আর জীবনে। পুরুষরা বাকি জীবন কাটায় পতিতালয়ে গিয়ে, অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক করে। আর একা জীবনযাপন করা নারীরা গর্ভধারণ করতে চাইলে কিনে আনে অচেনা কোনো পুরুষের বীর্য। কারণ, জীবনের শেষ স্বপ্নটুকু অবৈধ একটা সন্তানকে ঘিরে দেখেই কাটায় এরা। পরিবারিক বন্ধন তো দূরের কথা, 'পরিবার' শব্দটাই এদের কাছে এখন সোনার হরিণ।

এত ছাড় দিয়েও যদি কিছু হতো। অবৈধ যৌন সম্পর্ক করে, বিয়ের আগে ৫/৬/৭/৮ বছর এমনকি ১০/১২ বছর লিভ টুগেদার বা কোহ্যাবিট করে গর্ভধারণ করে ফেললে সেই সন্তানকে গর্ভপাতের মাধ্যমে নষ্ট করে ফেলে পশ্চিমা নারীরা; যদিও ওদের আইনে গর্ভপাত নিষিদ্ধ । তা ছাড়া পরিবার বা নিকটাত্মীয়ের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হলে, অপরিচিত কারও দ্বারা ধর্ষিত হওয়ার পর যদি কোনো নারী গর্ভবতী হয়ে যায়, তবে গর্ভের সেই সন্তান গর্ভপাত করানোটাও আইনত অবৈধ করে রাখা আছে ওদের আইনে । ভাবখানা এমন যে, গর্ভপাত করে ভ্রূণ হত্যার বিপক্ষে ওরা। অথচ ওদের উদ্দেশ্য হলো, ধর্ষণকে নীরব সমর্থন দিয়ে হলেও নিজেদের জাতির জনসংখ্যাকে যেন

অন্ততপক্ষে রক্ষা করা যায়–এখন হোক সেটা জারজ সন্তান; শুধু মানুষের মতো দেখতে হলেই হলো । কিন্তু ওদের পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে মূল্যবোধ বেশি। তাই নারীরা নিজের পিতার বা ভাইয়ের বা নিজের ছেলের বা আপন মামা-চাচার দ্বারা ধর্ষিত হয়ে সেই বাচ্চা জন্ম দেবে না বলে রাস্তায় নেমে মিছিল করে 'গর্ভপাতকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধতা দিতে হবে' আইন করার জন্য । আজকে ওদের জাতির তরুণীরাই হিজাব পরার অধিকার চেয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে। এই তরুণীরা জন্মসূত্রে পশ্চিমা নাগরিক। এদের দেহে মিশে আছে ইহুদি, খ্রিষ্টান আর নাস্তিকের রক্ত । এই তরুণীরা জন্মের পর থেকে ইসলামের অপপ্রচার শুনে শুনে বড়ো হয়েছে। কদমে কদমে ইসলামকে ঘৃণা করতে শিখেছে। সর্বদা 'ইসলাম বনাম নারী অধিকার' স্লোগানের মাধ্যমে ইসলামকে নারী অধিকারের বিপরীতে দেখে এসেছে। ইসলামকে মানবতাবিরোধী হিসেবে জেনেছে। 'ইসলাম হলো নারীদের কারাগার' শুনেছে। এত কিছুর পরেও এই তরুণীরাই কিনা হিজাব পরার অধিকার চেয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করে জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম নামক কারাগারেই প্রবেশ করতে চায়! একটু ভাবা যায়, ইসলামের কত বড়ো বিজয় এটা!

এই তরুণীরা ওদেও চোখে বাঁধা কালো কাপড়টা টেনে খুলে ফেলার পর দেখেছে–ওদের জন্য ইসলামেই মুক্তি, ইসলামেই সম্মান, ইসলামেই যথাযোগ্য মর্যাদা, ইসলামেই পরিপূর্ণ অধিকার, ইসলামেই স্বাধীনতা, সর্বোপরি ইসলামই প্রকৃত নারীবাদ। তবে পশ্চিমারা একেবারে খালি হাতে ফেরেনি; কিছু

অর্জন তো ওদের আছেই। দুই দিনের বৈরাগী কিছু তরুণী-যারা কিনা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও নতুন নতুন আধুনিকতার তকমা গায়ে লাগাতে গিয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে, ছোটো কাপড় পরার মধ্যে একপ্রকার বন্য স্বাধীনতা খুঁজে পেয়েছে, রাত-বিরাতে যেথায় খুশি সেথায় যেতে পারার মধ্যে নারী-পুরুষের সাম্যতা দেখেছে, শরীর বিকিয়ে বাহিরে কাজ করাকে ন্যায্য অধিকার হিসেবে বিবেচনা করেছে।

ভাতকে অন্ন বলা বৈরাগীরা অর্থাৎ, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের তরণীরা আজ যা হয়ে উঠতে চায়, পশ্চিমা তরুণীরা পশ্চিমা সমাজের ভেতরে থেকে বাস্তব চোখে রঙের দুনিয়া দেখেও তা না হয়ে বরং গোবরে পদ্ম ফুল ফুটিয়ে, পাথর ফেটে ঝরনা ঝরিয়ে, স্রোতের প্রতিকূলে গিয়ে প্রমাণ করে দিচ্ছে–'হিদায়াত' জাদুকরি এক স্পর্শের নাম। এই স্পর্শ দুনিয়াকে ভুলিয়ে দেয়, 'আমিকে' নতুন করে জন্ম দেয়, অন্ধকারে আলো জ্বেলে দেয়, বিবেকের চোখে বেঁধে রাখা শিকলকে ছিন্ন করে দেয়, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য শেখায়, সঠিক পথের ঠিকানা বলে দেয়, মনে শান্তি এনে দেয়।

ইসলামের নামে এত বদনাম করার পরেও যেই নারীরা ইসলামকে কঠোরভাবে পালন করেন, তারা কি তাহলে নারী নন? সুশীল নামক কুশীলরা আর প্রগতিশীল নামক প্রগতিবাজরা ইসলামকে যেভাবে নারীদের বিপরীতে দাঁড় করিয়েছে, তাতে তো মনে হয়, কোনো মেয়েই ইসলাম পালন করে না। যে সকল নারী ইসলাম পালন করেন, তারা কি নিজেদের ভালোটা বোঝেন না? প্রতিটা মানুষই নিজের স্বার্থকে সবার প্রথমে রাখে। ইসলাম যদি নারীর জন্য পরাধীনতার কারণই হয়ে থাকে, তাহলে পশ্চিমা নারীরা সেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করছে কেন? নির্দিষ্টসংখ্যক কিছু পথভ্রষ্ট নারী ইসলামকে পছন্দ করে না, এর মানে তো এই নয় যে, ইসলাম নারীবিরোধী জীবনব্যবস্থা। নাস্তিক যেসব নপুংসক পুরুষ ইসলামকে অপছন্দ করে, তার মানে কি ইসলাম পুরুষবিরোধী কোনো জীবনব্যবস্থা?

আমি একটা কথা বারবার বলিঅসভ্য, বন্য, বর্বর, অপরাধী, অন্যায়কারী পাপীরা কখনোই চাইবে না যে, সমাজে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য কোনো আইন-কানুন থাকুক ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন–

'কাফিররা যখন কুরআন শোনে, তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছড়ে ফেলবে।' (সূরা আল-কলম : ৫১)

মাতৃত্ব'–যেটার অস্তিত্ব একটা পশুর পশুত্বকে বিলীন করে দেয়, সেটার অস্তিত্ব যখন মনুষ্যত্বের সাথে এসে মেশে, তখন সেটা কেমন 'রূপ' ধারণ করে সেটা শুধু অনুভব করার বিষয়; বলে বোঝানো সম্ভব না

সৃষ্টিকর্তা নারী জাতিকে এই মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে নারীদের অবস্থান কতটা উঁচুতে তুলেছেন, সেটা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানেন। তাই এ জগতে নারী- পুরুষের তুলনা অবান্তর ।

কিন্তু আফসোস! এত কিছুর পরেও নারীদের অধিকাংশই জাহান্নামি!

উসামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, যারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে–তাদের অধিকাংশই গরিব-মিসকিন; অথচ ধনবানগণ আটকা পড়ে আছে। অন্যদিকে জাহান্নামিদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি জাহান্নামের প্রবেশদ্বারে দাঁড়ালাম এবং দেখতে পেলাম যে, অধিকাংশই নারী ।'

হাদিসের মান : সহিহ হাদিস (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৫১৯৬)

এই হাদিসটা নিয়ে ইসলামবিদ্বেষীরা বলে বেড়ায়–'দেখেছ ইসলাম নারীকে কী মনে করে? নারীদের অধিকাংশই নাকি জাহান্নামি । এটা আবার নারীবাদী ধর্ম হয় কী করে?' ও আচ্ছা, এখানে আলাদাভাবে 'নারী-পুরুষ' বলে ভেদাভেদ করছেন কেন? আপনারাই না মাঠে-ঘাটে জিকির করে বেড়ান যে, নারী-পুরুষকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা অনুচিত, সবাই এক। নারী হয়ে জন্মেছে বলে আলাদা দৃষ্টিতে দেখার কিছু নেই । এখন 'নারীরা বেশিসংখ্যক জাহান্নামি আর পুরুষরা কমসংখ্যক জাহান্নামি' এ রকম আলাদাভাবে না দেখে এটা বলা যায় না যে, 'মানবজাতি জাহান্নামে যাচ্ছে?' আর গুরুতর অপরাধ করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি কাউকে ছেড়ে দেবেন? অবশ্যই না। বরং যে যেমন কাজ করেছে, তার কাজের অনুপাতেই তাকে ফল দেওয়া হবে ।

তা ছাড়া এদের কথার ধরন দেখে মনে হয়, জান্নাতে কোনো নারীই যাবে না, আর জাহান্নামে একজন পুরুষও থাকবে না। অথচ বহু বহু নারী জান্নাতে যাবে, আর অনেক অনেক পুরুষ জাহান্নামে যাবে; শুধু সংখ্যায় হেরফের।

আসলে নারীদের দায়িত্ব অনেক বেশি। নারী জাতির ক্ষমতা, শক্তি ও ধৈর্য এতটাই বেশি যে, চাইলেই মুহূর্তের মধ্যে তারা গোটা সমাজকে বদলে দিতে পারে, যা কিনা পুরুষরা পারে না। এ কাজটা তারা ঘর থেকেই করতে পারে। যেমন ধরুন, স্বামীকে তার স্ত্রী কিংবা পুত্রকে তার মাতা কিংবা পিতাকে তার কন্যা যদি বলে–'আগামীকাল থেকে হারাম উপার্জনের কোনো পয়সা যেন ঘরে না আসে, অন্যথায় আমি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেবো।' এমন সতর্কবার্তার পর একজন পুরুষ–বাহিরের জগতে সে যত বড়ো ক্ষমতাশালীই হোক না কেন, অপকর্মের মাধ্যমে পয়সা কামাই করে সেই পয়সা ঘরে নিতে মনে মনে

লজ্জিত হবে। পুরুষরা কিছুটা হলেও বিরত হবে। ফলে সমাজ থেকে অপকর্মগুলো ধীরে ধীরে দূর হতে থাকবে । সমাজে যত অপকর্ম–সবই তো পয়সা কামাইকে ঘিরেই হয়ে থাকে।

অযোগ ও দায়িত্বজ্ঞানহীনদের দ্বারা অপকর্ম করাটা যতটা না দুঃখজনক, চেয়েও বেশি দুঃখজনক হলো–যদি যোগ্য ও দায়িত্বশীলরা অপকর্ম করে। সব নারীই যে এমন, তা বলছি না । তবে নারীদের মধ্যে অধিকাংশ নারী এমন মানসিকতার। ঠিক যেমনটা পুরুষদের মধ্যেও অধিকাংশ পুরুষ জাহান্নামি হবে। পার্থক্য শুধু পুরুষের তুলনায় নারীদের সংখ্যাটা বেশি হবে। সংখ্যার এই আধিক্যটা একজনও হতে পারে, আবার কোটি কোটিও হতে পারে। যেটাই ঘটুক, চূড়ান্ত ফলাফল হলো, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানবজাতির অধিকাংশই জাহান্নামি ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন–

'যারা আল্লাহকে দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় স্মরণ করে থাকে এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে (এবং বলে) "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করোনি, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সুতরাং আমাদের অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাকে আগুনে নিক্ষেপ করবে, তাকে অবশ্যই তুমি অপমান করবে আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একজন ঘোষণাকারীকে ঈমানের ঘোষণা করতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনো । সে অনুযায়ী আমরা ঈমান এনেছি । সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করো এবং আমাদের থেকে আমাদের মন্দ কাজগুলো বিদূরিত করো আর নেককার বান্দাদের সঙ্গে শামিল করে আমাদের মৃত্যু ঘটাও। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি স্বীয় রাসূলদের মারফত আমাদের যেসব বস্তুর ওয়াদা শুনিয়েছ, তা আমাদের দান করো এবং কিয়ামতের দিন আমাদের লাঞ্ছিত করো না, নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না।" তখন তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন, "তোমাদের মধ্যে পুরুষ হোক কিংবা নারীই হোক– কোনো কর্মীরই কর্মফল আমি নষ্ট করি না, তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করবে এবং স্বীয় গৃহ হতে বিতাড়িত হবে, আমার পথে নির্যাতিত হবে, যুদ্ধ করবে ও নিহত হবে, নিশ্চয় আমি তাদের গুনাহসমূহ দূর করে দেবো এবং নিশ্চয়ই তাদের এমন জান্নাতে দাখিল করব, যার নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদ-নদী আল্লাহর নিকট হতে পুরস্কার হিসেবে। বস্তুত আল্লাহর নিকটেই উত্তম বিনিময়"। (সূরা আল ইমরান : ১৯১-১৯৫)

মুসলিম খিলাফতে নারী স্বাধীনতা বনাম পাশ্চাত্য নারীবাদঃ

লেডি এলিজাবেথ ক্র্যাভেন, A Journey Through The Crimea To Constantinople, ১৭৮৯. লেডি এলিজাবেথ ক্র্যাভেন ছিলেন আঠারো শতকের একজন পর্যটক, নাট্যকার, এবং লেখিকা। অটোম্যান খিলাফতের শাসনামলে তিনি তুরস্ক ভ্রমণ করেছিলেন। ১৭৮৯ সালে সেখানকার নারীদের সম্পর্কে তিনি এ পর্যবেক্ষণ লিখেছিলেন, অর্থাৎ ইউরোপে তখনও নারীবাদের জন্ম হয়নি। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন- 'এখানে প্রতিদিনই নারীদেরকে দৈনন্দিন কাজকর্মের প্রয়োজনে রাস্তায় চলাচল করতে দেখা যায়। হয়তো সংখ্যাটা পুরুষের তুলনায় বেশি হবে না।... আমি এমন কোনো দেশ দেখিনি, যেখানকার নারীরা তুরস্কের নারীদের মতো এতটা স্বাধীনতা ভোগ করে। তাদেরকে কোনো প্রকার অবমাননার শিকার হতে হয় না।... নারীর প্রতি তুর্কিদের উদারতা অন্য সব জাতির জন্য আদর্শ হওয়া উচিত।... আমি সত্যিই মনে করি পৃথিবীর অন্য কোনো নারী এখানকার নারীদের মতো স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি। তাদেরকে কোনো প্রকার হয়রানির আশঙ্কায় থাকতে হয় না। এখানের নারীরা হয়তো নিজেদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ ভেবে গভীরভাবে শ্বাস নেয়। মেরি ওয়েস্টনক্র্যাফ্টের বিখ্যাত বই A Vindication of the Rights of Woman (১৭৯২) প্রকাশিত হয় আরও তিন বছর পরে। তাঁর তিনশ পৃষ্ঠার এ বইটি হয়ে উঠেছিল আধুনিক নারীবাদ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি এবং ঘোষণাপত্র।

লেডি এলিজাবেথ ক্র্যাভেন-সহ অন্যান্য অনেকের পর্যবেক্ষণ থেকে পরিষ্কারভাবেই বলা যায়, অটোম্যান খিলাফতের অধীনে থাকা নারীরা পশ্চিমা নারীদের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীন ছিল। তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব ছিল স্বয়ং রাষ্ট্রের। সে সময়ের আদালতের কার্যক্রম, আর্থিক লেনদেন এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের চিত্র থেকেই আমরা দেখতে পাই নারীর অধিকার রক্ষায় অটোম্যান খিলাফত কতটা সক্রিয় ছিল। উল্লেখ্য, নারীর স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তখন নারীবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পরেনি। অথচ কত সহজেই-না নারীবাদীরা আজ মুসলিমদেরকে বোকা বানাচ্ছে!

ইসলামের কারণেই নাকি মুসলিম নারীরা সবসময় তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। হলিউডের মুভির মতো 'নারীবাদ' যেন ত্রাতা হয়ে এসেছে মুসলিম নারীদেরকে এসব বৈষম্য থেকে মুক্ত করতে। অথচ এ প্রবন্ধটি ১৯২৪ সাল পর্যন্ত টিকে থাকা ইসলামি খিলাফতের অধীনে থাকা

নারীদের অধিকার, স্বাধীনতা এবং জীবনের সাথে নারীবাদের জনক পশ্চিমা নারীদের তুলনামূলক আলোচনা। অটোম্যান খিলাফতের ইতিহাস খুব বেশি দিন আগের নয়। খিলাফতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম নারীদের নারীবাদের দারস্থ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং তাদের প্রয়োজন একটি সুগঠিত খিলাফত।

মূল আলোচনা শুরুর আগে মুসলিম রাষ্ট্র এবং ইসলামি রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও তাদের মধ্যকার পার্থক্য বুঝে নেওয়া জরুরি। অটোম্যান খিলাফত ছিল একটা ইসলামি রাষ্ট্র। অর্থাৎ ইসলামি শরিআহ ছিল রাষ্ট্র পরিচালনার একমাত্র মানদণ্ড এবং সর্বোচ্চ আইনের উৎস। ছয়শ বছরেরও বেশি সময় ধরে অর্থাৎ বিশ শতকের শুরুর দিকে খিলাফতের পতনের আগ পর্যন্ত তারা ইসলামি শরিআহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে। শরিআহর ভিত্তিতেই অটোম্যানদের অধীনস্থ সমস্ত নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ-সহ দৈনন্দিন জীবনের সরকারি এবং ব্যক্তিগত সবকিছু পরিচালিত হতো। শরিআহই সে সময় আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়ার সমস্ত নারীদের অধিকার, নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এসব নারীদের সবাই যে মুসলিম ছিল তা নয়; বরং ইহুদি, খ্রিষ্টান, গ্রিক, আনাতোলিয়ান, বলকান উপদ্বীপের নারীরাও ছিল।

পাকিস্তান, বাংলাদেশ, তুরস্ক এবং মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ মুসলিম দেশই ইসলামি রাষ্ট্র না। তারা শুধু শরিআহ লঙ্ঘন করে এমন না; বরং ধর্মনিরপেক্ষতাকে নিজের আদর্শ মনে করে এবং সংবিধানে ইসলামকে ঔপনিবেশিক পরবর্তী সময়ের অন্যতম একটি উৎস বলে আখ্যা দেয়। এ দেশগুলোর সরকার চরম মাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত, সাধারণ জনগণ অত্যাচারে জর্জরিত। এসব দেশকে কোনোভাবেই একটি ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। এসব দেশে বসবাসরত সাধারণ মুসলিমরা শুধু একটি ইসলামি শরিআহ-ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এ জুলুমতন্ত্র থেকে মুক্ত হতে পারবে।

বৈধ মর্যাদাঃ

পশ্চিমে নারীরা বিয়ের সাথে সাথে নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলত। এমনকি তাদেরকে নিজের নামটি পর্যন্ত হারাতে হতো। নারীরা আদালতে কোনো মামলা দায়ের করার অধিকার রাখত না। তাদের স্বামীদের তাদের পক্ষ থেকে মামলা লড়তে হতো। ইংল্যান্ড এবং বেশিরভাগ ইংরেজি ভাষাভাষী দেশে coverture নীতি অনুসরণ করা হতো। এ নীতি অনুসারে নারীদের মূল্যায়ন

করা হতো তাদের বৈবাহিক অবস্থা অনুসারে। একজন বিবাহিত নারীর নিজস্ব কোনো সত্তা ছিল না। স্বামীর পরিচয়ই ছিল তার পরিচয়। সবাই তাদেরকে কেবল feme covert বলে জানত (কিংবা 'বিবাহিত নারী' অথবা 'covered' নারী)। পশ্চিমে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ১৯ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এ নীতি প্রচলিত ছিল। অথচ একই সময়ে অটোম্যান খিলাফতের অধীনে অসংখ্য মুসলিম-অমুসলিম নারীর ছিল যথাযথ অধিকার, নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা।

"বিয়ের পর আইন অনুসারে স্বামী-স্ত্রীকে একক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ বিয়ে মানেই সে নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, আইনত অস্তিত্ব হারিয়ে যাওয়া। স্বামী ছাড়া সে নারীর সরকারি, সামাজিকভাবে আর কোনো পরিচয় নেই। স্বামীর আওতায় থেকেই যেকোনো ধরনের কাজ করতে সে বাধ্য...।'

–উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোন, আঠারো শতকের ইংরেজ আইনবিদ এবং বিচারক, coverture এর ব্যাখ্যায়।'

Coverture হলো দুধারি তলোয়ার। নারী-পুরুষ উভয়ের জীবনই এতে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এ নীতি অনুসারে স্ত্রীর স্বাধীন ইচ্ছা, অধিকার এবং দায়িত্ব অস্বীকার করা হতো। একটি উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে। কোনো নারীর নিজে বাদী হয়ে মামলা দায়ের করার অধিকার ছিল না। তার স্বামীর নামে তাকে মামলা দায়ের করতে হতো। স্বামীর জন্য এ নিয়ম সুখকর ছিল না। কেউ যদি কোনো নারীর বিরুদ্ধে মামলা করতে চায়, সেটা করতে হবে সে নারীর স্বামীর বিরুদ্ধে! স্বামীর কাছে স্ত্রীর এমন জবাবদিহিতার বিষয়টিকে নিয়ে ইংরেজি অনেক সাহিত্যে স্যাটায়ার করা হয়েছে। চার্লস ডিকেন্সের বিখ্যাত বই Oliver Twist এর একটি চরিত্র ছিল মিস্টার বাম্বল। তাকে বলা হলো, 'আইন অনুসারে আপনার স্ত্রী আপনার অধীনে কাজ করেছে।' উত্তরে মিস্টার বাম্বল বলেছিলেন, "যদি আইন এমনটাই মনে করে, তাহলে আইন শুধু গাধা না, বোকাও। সত্যিই যদি আইনের চোখে এমন কিছু ধরা দেয়, তাহলে আইন অবিবাহিত। আইনের জন্য আমার বদদোয়া রইল, শীঘ্রই যেন তাঁর চোখ খুলে যায়। অভিজ্ঞতা ছাড়া ঠুলি খোলা যায় না।'

Coverture এর সম্পর্ক ছিল সাধারণ জনগণের সাথে, কোনো অপরাধী এবং অপরাধের সাথে নয়। ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার উপনিবেশগুলো তখনো দেশদ্রোহিতা ও জাদুর অপরাধে নারীদের পুড়িয়ে মারত। ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত এ অনাচার চলে এসেছে। যদিও Coverture নাগরিক

আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট, ব্যতিক্রমও আছে। ১৯৭২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি অঙ্গরাজ্যে আইন করা হয় যে, অভিযুক্ত নারীরা নিজের অপরাধের আত্মপক্ষ সমর্থনে যদি দাবি করে যে তারা আসলে তাদের স্বামীর আদেশ মেনেছে, সেটা তাঁর পক্ষে আদালতে গ্রহণ করা হবে।

এদিকে অটোম্যান খিলাফতে বিবাহিত বা অবিবাহিত–যেকোনো অবস্থাতেই নারীরা তাদের সব নৈতিক এবং বৈধ অধিকার পেত। অমুসলিম নারীরাও এর বাইরে ছিল না। যার ফলে অমুসলিম নারীরা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় আদালতের চেয়ে ইসলামি শরিআহ-ভিত্তিক আদালতে অভিযোগ করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত। অটোম্যান খিলাফতে বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হওয়ার পর নারীরা পুরুষের মতোই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হতো। ইসলামি শরিআহ অনুসারে তাদের নিজস্ব পরিচয় ছিল। মৌলিক মানবাধিকারের ক্ষেত্রে তাদের বৈবাহিক অবস্থা কোনো প্রভাব ফেলত না। মুসলিম নারীরা বিয়ের পরেও নিজের বংশপরিচয় বহাল রাখত। গর্বের সাথেই তারা নিজের পরিচয় বহাল রাখত, পরিবার-সমাজে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করত।

অন্যান্য সকল প্রকার বৈধ অধিকারের পাশাপাশি নারীরা চাইলে সহজেই স্থানীয় বিচারকের কাছে অভিযোগ করতে পারত, নিজেদের অধিকার দাবি করতে পারত। তাদেরকে কোনো প্রকার বৈষম্যের শিকার হতে হতো না। অধিকার ভোগে তারা ছিল পুরোপুরি স্বাধীন। এসব অধিকার আদায়ের জন্য তাদের কোনো পুরুষ আত্মীয়ের সাহায্যেরও প্রয়োজন হতো না। নারীরা প্রয়োজনে তাদের স্বামী এবং আত্মীয়দের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নিতে পারত। প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিচারক নারীর সকল প্রকার বৈধ আইনি অধিকার নিশ্চিত করতেন।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামি রাষ্ট্রের আদালত সবসময়ই নারীদের সমস্যা, ট্রেন্ডিং ইস্যুর ওপর নজর রাখত, সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। এমনকি অমুসলিম নারীরাও খিলাফতের অধীনস্থ এসব আদালতে অভিযোগ করতে বেশি পছন্দ করত। অথচ অটোমান সাম্রাজ্যে তাদের আলাদা আদালত ছিল এবং সে আদালতগুলো পরিচালিত হতো তাদের ধর্মীয় আইন অনুসারেই। প্রতিটি সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ধর্মীয় রীতিনীতি এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পালন করতে পারত। কোনো প্রকার বাধা বিপত্তি ছাড়াই। প্রত্যেকে তাদের ধর্মীয় গুরুর নেতৃত্বে তাদের আচার অনুষ্ঠান, উত্তরাধিকার আইন, সংস্কৃতি স্বাধীনভাবে পালন করত।

অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা:

পশ্চিমা নারীদের বিয়ের পর নিজস্ব সম্পদ বলে আর কিছু থাকত না। তাদের স্বামীরা তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিত। স্ত্রীর ঋণ স্বামীকেই পরিশোধ করতে হতো। Coverture অনুসারে স্বামী এবং স্ত্রী একক দেহ ও সত্তা হিসেবে বিবেচিত হতো। ফলে স্ত্রী তার নিজস্ব সম্পত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাত এবং স্বামী স্ত্রীর অনুমতি ছাড়াই সম্পত্তির অধিকার ভোগ করত। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর কিছু বলার থাকত না। (বিয়ের আগে অন্য চুক্তি হলে ভিন্ন কথা।)

একজন নারীর চুক্তিবদ্ধ হওয়ারও কোনো অধিকার ছিল না। উনিশ শতকে শর্তসাপেক্ষে নারীকে নিজের সম্পত্তি নিষ্পত্তির অধিকার দেওয়া হয়েছিল। শর্তের মধ্যে একটি ছিল স্বামীর অনুমতি। তারপর নারীকে একটি 'প্রাইভেট পরীক্ষা' দিতে হতো। সে পরীক্ষায় বিচারক নারীকে তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে পরীক্ষা করত। তার ওপর স্বামীর পক্ষ থেকে কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা তা জেনে নেওয়া হতো। এ প্রক্রিয়ায় তারা ভীষণ আত্মতুষ্টিতে ভুগত। মনে করত, এভাবে বিবাহিত নারীর অধিকার রক্ষা হয়ে গিয়েছে। অথচ এ সবগুলো প্রক্রিয়া ছিল নারীর নিজের সম্পদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারের জন্য!

আইনের দৃষ্টিতে যেহেতু স্বামী-স্ত্রীকে একই ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হতো, সেহেতু স্বামী, স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে বাধ্য ছিল। কোনো মহিলা যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থাতেই বিয়ে করত কিংবা বিয়ের পর ঋণ গ্রহণ করত তবে; তার স্বামীকেই সে ঋণ পরিশোধ করতে হতো–স্ত্রীকে নয়।

ব্রিটেনে ১৮৭০ সালে 'বিবাহিত নারীর সম্পত্তি আইন' পাশ হলে নারীরা সম্পত্তি কেনা-বেচার অধিকার, মামলা দায়ের করতে পারার অধিকার এবং নিজের ঋণের জন্য দায়বদ্ধ হওয়ার অধিকার লাভ করে। এর আগপর্যন্ত পশ্চিমা নারীরা এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।

এদিকে, অটোমান খিলাফতের নারীরা সবসময় অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী এবং সক্রিয় ছিল। কিছু কিছু শিল্পে নারীরা এতটাই একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল যে গিল্ডসদের তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সাহায্য নিতে হয়েছিল।

"পশ্চিমে তুর্কি স্ত্রীদের দাসী এবং সম্পত্তি মনে করা হয়। এমন ধারণা সর্বৈব মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে, এখানকার নারীদের আইনি মর্যাদা ইউরোপের বেশিরভাগ নারীর তুলনায় অনেক

গুণ বেশি। ইউরোপের নারীরাই বরং সম্পত্তির মতো ছিল। এখানে একজন নারী তাঁর নিজস্ব সম্পত্তির ব্যবহার, নিষ্পত্তি এবং উত্তরাধিকার নির্ধারণের পূর্ণ অধিকার রাখে। বিয়ের কারণে কিছুই বদলে যায় না। সে চাইলে সম্পত্তি তাঁর জীবদ্দশায় কাউকে দিয়ে দিতে পারে, উইল করতে পারে। আইনের দৃষ্টিতে সে একজন স্বাধীন এজেন্ট হিসেবে বিবেচিত। সে তার স্বামীর অনুমতি ছাড়াই আদালতে মামলা করতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এসব ক্ষেত্রে একজন অটোম্যান নারী তার খ্রিষ্টান বোনদের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে।'

–জেড ডেকেট ফেরিম্যান, ১৯১১

অটোম্যান খিলাফতে নারীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত। তাদের অনেকে ছিলেন জমি ও সামরিক কেল্লার মালিক, ঋণদাতা, ঋণগ্রহীতা, ব্যবসার মালিক-সহ অনেক কিছুই। অটোম্যান খিলাফতের শাসনামলে বিভিন্ন শ্রেণির নারীর ব্যবসা এবং লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকাটা খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল।

ইতিহাস বলে, অটোম্যান খিলাফতে উচ্চ বংশীয় নারীরা সাধারণত কঠোরভাবে পর্দা মেনে চলত। তারা পুরুষদের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতেন না। বিদেশি পর্যবেক্ষকদের কাছে সেসব সম্ভ্রান্ত নারীদের পুরুষের সামনে না আসাটা স্বাভাবিক ছিল না। তারা ভাবত নারীরা বুঝি বাধ্য হয়ে পুরুষ কর্মচারী কিংবা এজেন্ট নিয়োগ করে। তারা অটোম্যান নারীদেরকে দেখত সহানুভূতির দৃষ্টিতে, ভাবত তারা কোনো না কোনোভাবে নির্যাতিত। প্রোপাগান্ডার তোড়ে তারা ভুলে যেত, এ 'নির্যাতিত' নারীরাই ছিলেন এত সম্পদ, বিভিন্ন ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক। পশ্চিমা গবেষকরা অবাক হয়ে ভাবত, এত কিছু থাকা সত্ত্বেও কীভাবে তারা সবার চোখের অন্তরালে থেকে যাচ্ছেন! স্থাপত্য শিল্পেও এসব উচ্চবিত্ত নারীরা অবদান রেখেছেন।

অটোম্যান খিলাফতের নারীরা কারুশিল্প, রেশমশিল্প এবং তাঁতশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। মসুলের প্রায় নারীর বাড়িতেই তাঁতশিল্পের কাজের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় বরাদ্দ থাকত। এটি ছিল অন্যতম বৃহত্তম একটি শিল্প। একপর্যায়ে এ শিল্পে নারীদের একচেটিয়া আধিপত্য তৈরি হয়। একসময় তাঁত গিল্ডসরা বাধ্য হয়ে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কামনা করে।

অটোম্যান নারীরা সম্পদ দান করার ব্যাপারে ছিলেন বেশ উদার। আঠারো শতকে সব শ্রেণির অটোম্যান নারীরা মিলে খিলাফতের ২০-৩০% দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। একে ইসলামি

পরিভাষায় 'ওয়াকফ' বলে। খিলাফতের অধীনে থাকা সকল অঞ্চলে জনকল্যাণে তারা তাদের ব্যক্তিগত অর্থ খরচ করে স্কুল, হাসপাতাল, স্নানাগার, ঝরনা, রান্নাঘর, ছাত্রাবাস, মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ:

ব্রিটেনে ১৯২৮ সালের আগপর্যন্ত নারী-পুরুষ কারোই সার্বজনীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না। তখন ব্রিটেনে শুধু অত্যধিক ধনী, প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই ভোট দিতে পারতেন। অর্থাৎ নারী-পুরুষের একটি বিশালসংখ্যক জনগোষ্ঠী এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। ১৯১৮ সাল থেকে প্রথম একুশ বছরের ঊর্ধ্বে পুরুষ এবং ত্রিশ বছরের ঊর্ধ্বে নারীরা ভোট দেওয়া শুরু করে। একুশ বছরের ঊর্ধ্বের সকল নারী-পুরুষ ভোট দেওয়ার অধিকার অর্জন করে ১৯২৮ সালে।

এদিকে, অটোম্যান খিলাফাতে নারী-পুরুষকে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হতে হতো। অটোম্যান খিলাফতে ঠিক পুরুষের মতোই নারীরাও 'ডিভানে' পিটিশন দিতে পারত। ডিভান হলো একটি কাউন্সিল যেখানে শুরা সদস্যরা দেশের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন। নারী-পুরুষ উভয়ই খলিফার হাতে বাইয়াত নিত। বাইয়াত হলো আনুগত্যের শপথ, ভোটের মাধ্যমে ম্যান্ডেট দেওয়ার মতো।

নারী-পুরুষের সামাজিক বিভাজন সবচেয়ে বেশি দেখা যেত উচ্চ শ্রেণির পরিবারগুলোতে। কিন্তু কম আদর্শিক হওয়া ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে নিম্নবিত্ত নারীরা ছিলেন কাজের দিক থেকে তুলনামূলক সক্রিয়। তাই তারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশি জড়িত ছিলেন। যার কারণে ইউরোপীয়রা অটোম্যান উচ্চ শ্রেণির নারীদেরকে নিপীড়িত মনে করত। বাস্তবতা হলো, ষোলো শতকের শেষের দিকে অটোম্যান সাম্রাজ্যকে বলা হতো 'নারীদের সুলতানিয়্যাত'। সে সময়ে সুলতানদের মায়েরা এবং রাজবংশের অন্যান্য রক্ষণশীল নারীরা হেরেমের পর্দার আড়ালে থেকেও ক্রমান্বয়ে প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। হারেমকে ইসলাম কখনোই বৈধতা দেয় না। তবে সেসময় সুলতানিয়্যাতে নারীদের যে ভূমিকা দেখা যায় তাতেই জোরালোভাবে প্রমাণ হয় যে, পর্দার আড়ালে থাকার মানেই নিপীড়ন নয়।

সামাজিক জীবনঃ

পশ্চিমে পুরুষ বা নারী, কারোরই ডিভোর্সের অধিকার বলে কিছু ছিল না। আর যদি আইনগতভাবে ছাড়াছাড়ি করার মতো যথেষ্ট পয়সা থাকে, তাহলে তো ছাড়াছাড়ি হলোই। একবার ছাড়াছাড়ির পর আবার বিয়ে করাটা ওদের জন্য ঠিক মৃত্যুদণ্ডের মতোই ছিল ভয়ানক একটা অবস্থা।

পশ্চিমা-সমাজে ১৮৫৭ সালে বিবাহ-সংক্রান্ত আইন (Matrimonial Causes Act of ১৮৫৭) প্রকাশিত হওয়ার আগপর্যন্ত বিবাহবিচ্ছেদ বৈধ ছিল না। এর আগে কেউ বৈধভাবে বিচ্ছেদ চাইলে তাকে কঠিন আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হতো। কিংবা একটি প্রাইভেট অ্যাক্টের শরণাপন্ন হতে হতো (বিষয়টিকে কেন্দ্র করে হাউজ অফ কমন্সে নারী-পুরুষের একান্ত ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে দীর্ঘদিন প্রকাশ্য বিতর্ক হয়েছে)। আর এ দুটো প্রক্রিয়াই ছিল ব্যয়বহুল। কাজেই শুধু ধনীরাই বৈধভাবে বিবাহবিচ্ছেদ করার সুযোগ পেত।

শুধু তাই নয়, ডিভোর্সপ্রাপ্ত নারী-পুরুষের নতুন করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার ছিল না। এমন বিয়ে প্রথম নিষিদ্ধ করে চার্চ। পরবর্তী সময়ে ১৬০৪ সালে একে আইনে রূপ দেওয়া হয় ও এভাবে বিয়েকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য শাস্তি বলে ঘোষণা করা হয়।'

অটোম্যান খিলাফতে বহুবিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ–দুটোই ছিল অপ্রতুল। বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার নারী-পুরুষ উভয়ের ছিল। যখন কোনোভাবেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা সম্ভব হতো না; কেবল তখনই কোনো দম্পতি এ পথে এগোতেন। সর্বশেষ উপায় হিসেবে তারা বিবাহবিচ্ছেদকে বেছে নিতেন।

জার্মান প্রোটেস্ট্যান্ট মন্ত্রী স্যামোন শোয়েগার ষোলো শতকের শেষের দিকে অটোম্যান সাম্রাজ্য ভ্রমণ করে বলেছিলেন, 'তুর্কি পুরুষরা দেশ শাসন করে এবং তাদেরকে শাসন করে তাদের স্ত্রীরা। তুর্কি নারীরা অন্য যেকোনো নারীর চেয়ে বেশি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে এবং সবচেয়ে বেশি সুযোগসুবিধা ভোগ করে। তাদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন নেই। হয়তো তারা চেষ্টা করেছিল এ প্রথাকে জনপ্রিয় করে তোলার, কিন্তু অত্যধিক সমস্যা এবং অর্থের দিকে তাকিয়ে বিষয়টি সামাজিকভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। (কিন্তু তা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল)' অটোম্যান সমাজব্যবস্থায় পরিবারের গুরুত্ব ছিল অনেক। অধিকাংশ বাবা-মাই তাদের সন্তানদের বিয়ের

ব্যাপারে ছিলেন খুব সচেতন। কোনো কারণে পাত্র পছন্দ না হলে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার নারীদের ছিল। বিবাহের পূর্বে নারীরা পুরুষদের তাদের প্রয়োজনমতো বিভিন্ন শর্ত দিতে পারত। এটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। শরিআহর আইন অনুসারে বহুবিবাহের অনুমতি ছিল, কিন্তু বাস্তবে বহুবিবাহের হার ছিল খুবই কম। শতকরা পঁচানব্বই জনেরই ছিল একজন করে স্ত্রী।

অটোম্যান ফকিহরা বিয়েকে দেখত নারী-পুরুষের মধ্যকার ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার সম্পর্ক হিসেবে, কোনো অধিকারের লড়াই হিসেবে না। তারা স্বামী- স্ত্রীকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করতেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম বিবাহিত নারীর কর্তব্য হলো, তিনি সর্বাবস্থায় স্বামীর আনুগত্য করবেন যতক্ষণ না স্বামী তাকে হারাম কিছু করতে কিংবা আল্লাহর অবাধ্যতা করতে নির্দেশ দেন। সেসময়কার নারীদের আইনি অধিকার, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে মুসলিম পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের প্রতি কতটা সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করতেন। তারা স্ত্রীদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত কিছু কখনো চাপিয়ে দিতেন না। অন্যদিকে শরিআহর দৃষ্টিতে নারী এবং শিশুদের আর্থিক দায়িত্ব যেহেতু পুরুষের, বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের পদ্ধতি ছিল একজন নারীর চেয়ে আলাদা। যদিও উভয়েরই বিবাহবিচ্ছেদ দাবি করার একটি নির্দিষ্ট পন্থা ছিল। বাস্তবে, অটোম্যান খিলাফতকালে বিচারব্যবস্থা বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারীদের ব্যাপারে বেশ নমনীয় ছিল। বিশেষ করে নারীর অসম্মতিতে যে বিয়ে ঠিক করা হয় সে ক্ষেত্রে। আঠারো শতকে ইস্তাম্বুলে নারীরা

অস্বাভাবিক মাত্রায় বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করছিলেন। বিষয়টি সামাজিক পর্যবেক্ষকদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিবার হলো কিছু মানুষের বন্ধন, সম্পর্কের নাম। বিবাহবিচ্ছেদ সবসময় কষ্টের বিষয়, কে করল সেটা জরুরি না। তবুও নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য বিবাহবিচ্ছেদের রাস্তা খোলা ছিল।

গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দেওয়া হতো না। যেমন : পারস্পরিক অসামঞ্জস্যতা, অর্থনৈতিক সমস্যা, দাম্পত্য কলহ, শারীরিক নির্যাতন, ব্যভিচার। অনেক সময় স্বামী-স্ত্রী পরিবারে তাদের মৌলিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হলে তাকেও গ্রহণযোগ্য কারণ হিসেবে গণ্য করা হতো। আবার কখনো-বা স্ত্রীর স্বামীর বাড়ি পছন্দ না হলে স্ত্রীই বিবাহবিচ্ছেদের পদক্ষেপ নিত। পুত্রসন্তানের জন্ম না হলে কিছু স্বামীকেও এমন সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যেত।

বিবাহবিচ্ছেদের পর নারী পুরুষ উভয়েই স্বাধীনভাবে বিয়ের অধিকার রাখত। অটোম্যান খিলাফতের অধীনে থাকা অনেক নারীর ধর্ম কিংবা ঐতিহ্য সাধারণত তাদেরকে বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দিত না। সে ক্ষেত্রে তারা ইসলাম গ্রহণকে দেখতেন বিষাক্ত দাম্পত্যজীবন থেকে মুক্তির রাস্তা হিসেবে।

অটোম্যান সাম্রাজ্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দেয় যে, একজন মুসলিম নারীর আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অধিকার ভোগ করতে নারীবাদের দারস্থ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এ খিলাফত কেবল মুসলিম নারী-পুরুষের অধিকার রক্ষা এবং তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং খিলাফতের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রত্যেক অমুসলিমের সুরক্ষাও নিশ্চিত করেছিল। অনেক আগ থেকেই ইসলাম নারী-পুরুষের অধিকার, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছে। ইসলামই আমাদের আদর্শ। ইসলামের এ সমৃদ্ধি পশ্চিমে নারীবাদের জন্মের পরেও বিশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ন্যায়বিচার এবং অধিকার পেতে এনলাইটেনমেন্ট পরবর্তী পাশ্চাত্যের নারীদের মতো মুসলিম নারীদের কখনো প্যাচ ওয়ার্ক করতে হয়নি। কিংবা তাদেরকে লিঙ্গের ব্যাপারে পক্ষপাতদুষ্ট কোনো সমাধান অর্থাৎ নারীবাদ খোঁজার প্রয়োজন হয়নি। ইসলামি রাষ্ট্র ছিল তাদের অধিকারের রক্ষাকবচ। পাশ্চাত্যের নারীদের নারীবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। কেননা তাদের কাছে ইসলাম নেই। কিন্তু আমাদের কাছে ইসলাম আছে। কাজেই আমাদের নিজেদের যে প্রশ্নটি করা উচিত, যেখানে সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি মুসলিম নারী তাঁর সব রকমের অধিকার ইসলামে খুঁজে পেয়েছে, সেখানে কীভাবে কোনো মুসলিম নারীর মুক্তির জন্য নারীবাদের প্রয়োজন হতে পারে?

লিঙ্গ ভারসাম্য : আল্লাহর পরিকল্পনার প্রতি আত্মসমর্পণ:

সমাজবিজ্ঞানী পল আমাটো (Paul Amato) বিশ শতকে সংঘঠিত পারিবারিক পরিবর্তনগুলো নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। গবেষণায় বলা হয়, এসব পরিবর্তনের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ বা ডিভোর্স হচ্ছে সবচেয়ে বেশি নাটকীয় এবং একইসাথে এর প্রভাবও সবচেয়ে বেশি সুদূরপ্রসারী। বিবাহবিচ্ছেদের শিকার বেশিরভাগ পরিবারের শিশুই দুর্বল আত্মসম্মান, দুশ্চিন্তা এবং বিষণ্নতায় ভোগে। পিতামাতার সাথে তাদের পর্যাপ্ত যোগাযোগের অভাব থাকে। তাদের জীবনযাত্রার মান হ্রাস পায়। পরবর্তী জীবনে তাদের পিতামাতার সাথে সম্পর্কে চিড় ধরে।

এমনকি তাদের নিজেদের দাম্পত্যজীবনেও নানা কলহের সৃষ্টি হয় এবং বিবাহবিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি।

আমাদের নৈতিক দায়িত্ব থেকে বিষয়টিকে সততার সাথে দেখব এবং সব ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ নেব। দু-তিনটি বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনায় চিন্তার তেমন কোনো কারণ নেই। কিন্তু যখন বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যাটা ক্রমাগত বেড়েই চলছে, তখন এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক পরিবার। এই পরিবারেরই পদস্খলন যখন মহামারির আকার ধারণ করে তখন সমাজের সবাইকে এক বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। ইনশাআল্লাহ, এই সমস্যা সমাধানের প্রয়াসে আমি ইসলামের বিশ্বদর্শন থেকে বর্তমান মুসলিমদের মধ্যকার জেন্ডার ডাইনামিক্সের দিকে আলোকপাত করব।

সঠিক ফ্রেমওয়ার্ক:

ইদানীংকালে লিঙ্গ এবং এ সম্পর্কিত বিষয়ে আমাদের আলোচনাগুলো বিভ্রান্তি এবং ভুল বোঝাবুঝিতে পরিপূর্ণ; এই বিষয়টি আমরা অস্বীকার করতে পারব না। মোটাদাগে এর মূল কারণ হলো, বিপরীত বিশ্বদর্শন : ইসলাম এবং সেক্যুলার লিবারেলিজম।ইয়াকিন ইন্সটিটিউট এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছে,

‘সামসময়িক আন্দোলনগুলোর আদর্শিক ভিত্তি অনেকাংশেই ইসলামি শরিআহর সাথে সাংঘর্ষিক। আর দুঃখজনকভাবে তরুণ প্রজন্ম এ বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হয়। তারা এসবের দিকে আকৃষ্ট হয় ক্ষমতায়নের লোভে।

বর্তমানে নারীবাদ এবং লিঙ্গ-সমতার মতো সেক্যুলার মতাদর্শগুলো মুসলিম তরুণদের মধ্যে এত মারাত্মকভাবে প্রবেশ করেছে যে, বেশিরভাগ তরুণই এসব ফ্রেইমওয়ার্কের বাইরে থেকে বিষয়গুলো চিন্তা করতে পারে না। অমুসলিমদের মতো আমরা মুসলিমরাও আজ পশ্চিমের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রিকে বস্তুনিষ্ঠ সত্যের প্রশ্নাতীত উৎস হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেছি। সেখানকার অধ্যাপকরা সত্যের দিশারি, জ্ঞানের আধার হিসেবে বিবেচিত হয়। অনেকে বৈরাগ্যবাদী (ঝঃড়রপ) হিসেবে প্রশংসিত হয়, আবার কিছু ব্যক্তি সামাজিক ন্যায়বিচারের মূর্তপ্রতীক হয়ে ওঠে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যে সেক্যুলার দর্শন এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত তা আমরা বুঝতে ব্যর্থ হই। পশ্চিমা কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা যা গলাধঃকরণ করি তার বেশিরভাগই হলো এক ঈশ্বরহীন সমাজব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণু অংশবিশেষ। নিত্যপরিবর্তনশীল এই ব্যবস্থার ভিত্তি হলো, মানুষ নিজেই তার অস্তিত্বের নিয়ন্ত্রক (raison d'etre)। এটাই তার জীবনের লক্ষ্য। এভাবেই অ্যাকাডেমিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক এবং রাজনৈতিক তত্ত্ব আমাদের গেলানো হয় এবং শেখানো হয় কীভাবে এসব তত্ত্বের বিপরীতে আসা বিতর্ককে উপেক্ষা করে এগুলোর পক্ষে দাঁড়াতে হয়। এসব তত্ত্বের ভিত্তিগুলো অস্পষ্ট এবং তত্ত্বগুলো এতটাই জটিল যে, বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই সেগুলো বুঝতে ব্যর্থ হয়। এসব তত্ত্ব অধ্যয়ন করার সময় খুব অল্প কিছু ক্ষেত্রে আমাদের ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতার সাথে হয়তো এসব তত্ত্বের সাদৃশ্য খুঁজে পাই। আর এর প্রেক্ষিতে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই আমরা মেনে নিই যে, এসব তত্ত্ব পরম সত্য। আমাদের অনেকেই পশ্চিমের 'সাম্যের' সংজ্ঞা মেনে নিয়েছে। অথচ তা একইসাথে অস্পষ্ট এবং স্ববিরোধী। 'সকলের জন্য সমান অধিকার' এ নৈতিকতায় কিছু

বর্তমান সময়ের অন্যসব প্রভাবশালী প্যারাডাইমগুলো থেকে আলাদা করার জন্য আমি ইসলামকে

একটি ওয়ার্ল্ডভিউ বলি। এসব বৈষম্য না থাকলে ইসলামকে আলাদাভাবে ওয়ার্ল্ডভিউ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, নিঃসন্দেহে ইসলামই সমস্ত কিছুর উপর চূড়ান্ত সত্য। ইসলাম সেক্যুলার লিবারেলিজমের মতো কোনো লেন্স নয় যার মাধ্যমে আমরা বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করব; বরং ইসলামই বাস্তবতা।

বাস্তবমুখী প্রশ্নের উত্তর মিলে না এবং হাস্যকরভাবে ঠিক একই কারণে এই মতাদর্শে মানুষ অন্যায়ের শিকার হয়। সামাজিক সাম্যতার আড়ালে মানবীয় পার্থক্য মুছে ফেলার প্রচেষ্টা চালায় লিবারেলিজম। এর ফলাফল আসলে কি?

বর্তমানে ওহি মানা ঐচ্ছিক হয়ে উঠেছে। ইচ্ছা হলো মানলাম, ইচ্ছা হলো না মানলাম না। আর এভাবে কখনই ন্যায়বিচার, ভারসাম্য, শৃঙ্খলা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না। যেমনটা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেছেন

"নিশ্চয় আমরা লাঞ্ছিত ছিলাম এবং আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ এ আমাদের যা দিয়ে সম্মানিত করেছেন তা ব্যতীত আমরা যদি অন্য কিছুর মাধ্যমে সম্মানিত হতে চাই, তবে আল্লাহ আমাদের লাঞ্ছিত করবেন।

Catch- ২২

উম্মাহর ভাই-বোনদের সবার নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে। আর এটাই হলো জেন্ডার ডাইনামিক্সের একমাত্র সমাধান। অর্থাৎ, আমরা যে আল্লাহর আদেশকে লঙ্ঘন করছি তা উপলব্ধি করতে হবে এবং সেই সাথে নিজেদের সংশোধন করতে হবে। 'আগে পুরুষদের নিজেকে পরিবর্তন করা উচিত'–এই দাবিকে আমি বিশ্বাস করি না। এটি একটি অসাড় দাবি এবং এটি ইসলামি নীতিমালার বিরুদ্ধে যায়। সামনে বিষয়টি আমি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করব। তবে এটা সন্দেহাতীত সত্য যে পুরুষরা যদি তাদের দায়িত্ব যথারীতি পালন না করে; তবে নারী-পুরুষ কেউই ন্যায়বিচার, ভারসাম্য, শৃঙ্খলা এবং শান্তির আশা করতে পারবে না। আল্লাহ বলেন,

"আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা
তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।' সুরা আর-রাদ : (১১)

নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে পরিবার ধ্বংসের পেছনে সেক্যুলার মতাদর্শগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেবল নারীরাই বিবাহবিচ্ছেদ কিংবা পারিবারিক কলহের জন্য দায়ী–এমন দাবিও একইসাথে মিথ্যা এবং অন্যায়। আশা করা যায় এ প্রবন্ধ থেকে এটুকু স্পষ্ট হবে যে, নারী-পুরুষ উভয়েই যখন নিজেদের ফিতরাতকে শ্রদ্ধা করতে এবং আপন করে নিতে শিখবে কেবল তখনই ন্যায়, শৃঙ্খলা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্বাভাবিক নিয়মের প্রতি আত্মসমর্পণ:

বহুকাল আগে 'cosmos' শব্দটি সাধারণত মহাবিশ্বকে বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। 'ঈড়ংসড়ং' গ্রিক শব্দ 'শষ্টংসড়ং' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'শৃঙ্খলা'; বিশৃঙ্খলার বিপরীত। এ নামকরণের মাধ্যমে এ মহাবিশ্বকে একটি জটিল তবে সুশৃঙ্খল সৃষ্টি হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। মানুষের সর্বজনীন অস্তিত্বের প্রশ্নটিও মহাজাগতিক আর তা হলো, আমি এখানে কেন?

মারিয়া মন্টেসরি (Maria Montessori) একজন খ্যাতিমান ক্যাথলিক শিক্ষাবিদ। তিনি শিক্ষার নিরবধি পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা, এই পদ্ধতির নামকরণ করা হয় তার নামে। তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে, একটি শিশুর জন্মের পর থেকেই তার কিছু সহজাত প্রবণতা থাকে। মন্টেসরির মতে, মানুষ জন্ম থেকেই তার সহজাত প্রবণতা বা ফিতরাতকে সম্মান করে। মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত লিখেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো নিজেকে জীবনের জন্য প্রস্তুত করা। তার মতে, এ উদ্দেশ্য তখনই কার্যকর হবে যখন আমরা এ সত্য উপলব্ধি করব যে প্রতিটি মানুষই এক সহজাত শক্তি নিয়ে জন্মায়। আর এ শক্তিই প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে পরিচালিত করে। তাকে আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করে। এ কারণেই আমাদের উচিত জন্মগতভাবে পাওয়া এই সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলোকে পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করা।

বিখ্যাত বই To Educate the Human Potential ' - এ মারিয়া মন্টেসরি বলেন, 'আমাদের উচিত শিশুদের পুরো মহাবিশ্ব সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। মহাবিশ্ব এক অমোঘ বাস্তবতা, যেখানে আপনি সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন। আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একসাথে চলব। কারণ সবকিছুই মহাবিশ্বের অংশ এবং সমস্ত কিছু একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে একটি সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খল বিন্যাস গঠন করেছে। এই ধারণা শিশুর মনকে স্থির হতে, লক্ষ্যহীনভাবে জ্ঞান অনুসন্ধান করা থেকে বিরত রাখবে।'

শৈশব থেকেই আমরা মহাবিশ্বে নিজেদের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করি। শিশুর জীবনে বড়দের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি হলো শিশুটিকে সত্যের দিকে পরিচালিত হতে সাহায্য করা। তার সহজাত প্রবণতায় হস্তক্ষেপ না করে তাকে বাস্তবতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আবু হুরায়রা রা. আল্লাহর রাসুল * হতে বর্ণনা করেছেন : 'প্রতিটি মানুষ মায়ের পেট থেকে পরিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান বা জাদুকর বানায়। তারা উভয়েই যদি মুসলিম হতো তবে সেও মুসলিম হতো।'

প্রতিটি মানুষকেই মুসলিম এবং আল্লাহর বান্দা হিসেবে সৃষ্টি করা হয়। অথাৎ, আমাদের প্রাকৃতিক প্রবণতা হলো আল্লাহর আনুগত্য করা। তাঁর সমস্ত সৃষ্টি যে ভারসাম্যপূর্ণ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ তা উপলব্ধি করা। একটু থামুন। ভাবুন, 'আনুগত্য' বলতে আমরা কি বুঝি। আল্লাহর বান্দা হওয়ার অর্থ আসলে কী? আনুগত্য হলো ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ তাঁর ঐশ্বরিক শক্তি এবং প্রজ্ঞায় যে পরিকল্পনা করেন মানুষের পক্ষে সেটার রহস্য পুরোপুরি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এ সত্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায়। যদিও আমাদের পক্ষে পুরোপুরি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, তবুও আমাদের মানতে হবে যে আল্লাহর পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত এবং ভারসাম্যপূর্ণ। আমাদের সচেতন থাকতে হবে আমরা যেন এ ভারসাম্যে হস্তক্ষেপ না করি। নয়তো আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর ধ্বংস ডেকে আনব।

আল্লাহ সুরা আর-রাহমানে বলেন,

'সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে সুনির্দিষ্ট হিসাব অনুযায়ী। তৃণলতা গাছপালা তাঁরই জন্য সিজদায় অবনত। তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত, আর স্থাপন করেছেন ন্যায়ের মানদণ্ড। যাতে তোমরা ভারসাম্য লঙ্ঘন না করো। আর তোমরা ন্যায়সংগতভাবে ওজন প্রতিষ্ঠা করো এবং ওজনকৃত বস্তু কম দিয়ো না।' [সুরা আর-রাহমান : ০৫-০৯]

প্রাকৃতিক জগৎ সহজাত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আচরণ করে। আল্লাহ প্রতিটি জীব এবং জড়কে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন তা ছাড়া অন্যকিছু করার স্বাধীন ইচ্ছা তাদের নেই। অণুবীক্ষণিক এককোষী প্রাণী থেকে শুরু করে অপরিমেয় মহাবিশ্বের সকল কিছু একমাত্র ইলাহ আল্লাহর কাছে মাথা নত করে।

প্রতিটি প্রাণী তাদের পৃথিবীতে আগমনের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সহজাত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অনবরত আল্লাহপ্রদত্ত ভূমিকা পালনে নিয়োজিত থাকে। একটা বাজপাখি বা একটা গাভী অথবা একটা পিঁপড়ার সহজাত বৈশিষ্ট্য প্রজাতিভেদে ভিন্ন। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারাই নিজ নিজ পরিবেশে পরিচালিত হয়। কেউ খাদক কেউ-বা খাবার। এর মাধ্যমে প্রত্যেকে নিজ প্রজাতির অস্তিত্ব, জীবনের ভারসাম্য, বৈচিত্র্য এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখে। যেমনটা সুরা আর-রাহমানে আল্লাহ * আমাদের বলেন, মহাজাগতিক বস্তুগুলো আল্লাহর নিখুঁত নকশা অনুসারে প্রদক্ষিণ করে; যা সহজাত ভারসাম্য এবং শৃঙ্খলার একটি অসাধারণ নিদর্শন।

আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে কেবল মানুষ এবং জিনকেই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতাও সীমিত। এই স্বাধীনতার মানে এই না যে আমরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী যা খুশি করব আর তার কোনো কর্মফল ভোগ করতে হবে না।

স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়ার অর্থ হলো স্রষ্টার আনুগত্য করা কিংবা না করা সৃষ্টির ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়া। এ ইচ্ছাশক্তি মানুষকে সহজাত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আনুগত্য করার সুযোগ দেয়। আবার চাইলে সে এর বিপরীতেও চলতে পারে। দুটি কাজেরই ভিন্ন প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কিন্তু তবুও আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কেননা আমরা চাইলেও স্রষ্টার পরিকল্পনাকে পুনরায় সৃষ্টি করে সাজাতে পারি না। মানুষ শত চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু তার পরিকল্পনা এতে ব্যর্থ হবে এটা নিশ্চিত। স্রষ্টার ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মানুষের এসব ব্যর্থ প্রচেষ্টা কেবল বিশৃঙ্খলারই জন্ম দেয়। স্রষ্টার পরিকল্পনা, প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা এবং ভারসাম্যে হস্তক্ষেপ করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আমরা নিজের এবং অন্যদের জীবনে ভারসাম্যহীনতা, অসন্তুষ্টি এবং বিশৃঙ্খলা ডেকে আনি।

আমাদের সহজাত প্রবণতা এমন যে, আমরা সবকিছুর ভারসাম্য অনুধাবন করা ও বজায় রাখার ক্ষেত্রে সতর্ক হব। স্রষ্টাপ্রদত্ত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আমাদেরকে 'ইবাদ তথা আল্লাহর বান্দা হওয়ার অর্থ বুঝতে সাহায্য করবে এবং আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে। আবার এ ইচ্ছাশক্তিই আমাদেরকে ধ্বংসের পথেও পরিচালিত করতে পারে। অর্থাৎ, তিনি এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে, যখন আমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হই তখন তা আমাদেরকে সংশোধন করে দেবে। আল-আদল (ন্যায়বিচারক) আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ন্যায়ের প্রবণতা দিয়ে তৈরি করেছেন। তিনি আল-মুকসিত এ (সাম্য প্রতিষ্ঠাকারী) আমাদের জন্য ঐশ্বরিক বাণী কুরআন প্রেরণ করেছেন। পাশাপাশি একজন নিখুঁত মানুষের জীবন্ত উদাহরণ প্রদান করেছেন যাতে আমরা আমাদের এ অস্থায়ী দুনিয়ায় সঠিক নির্দেশনা পেতে পারি। যখন আমরা ভুল করতে শুরু করি তখন আমরা বিভিন্ন উপায়ে কল্যাণ, সত্য এবং আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার দিকে পরিচালিত হই, যা সহজাতভাবে ন্যায়সংগত এবং ভারসাম্যপূর্ণ। আমরা এই রিমাইন্ডারগুলো গুরুত্বের সাথে নিতে পারি বা উপেক্ষা করতে পারি। যখন আমরা উপেক্ষা করাকে নিই তখন আমরা মূলত নিজেদের এবং অন্যদের ওপর অবিচার করি।

যদি আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে, আল্লাহর আদেশ অমান্য করার অর্থ মূলত ভারসাম্য এবং শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে যাওয়া, তবে আমরা বুঝব যে পাপ নিজেই একটি বিশৃঙ্খলা এবং এটিই মূলত অন্যায়-অবিচারের কারণ। আরবিতে অন্যায়-অবিচার বুঝাতে (জুলুম) শব্দটি ব্যবহার করা হয়, যা আমরা নিজেদের পাশাপাশি অন্যদের ওপরও চাপিয়ে দিতে পারি।

চলুন এমন একটি উদাহরণ দেখি।'হায়া' মোটাদাগে এর অর্থ হলো, লজ্জা বা বিনয়। এ শব্দের বাংলা অনুবাদে এর গুরুত্ব কমে যায়। 'হায়া' হলো একটি জটিল এবং সূক্ষ্ম মানবীয় গুণ যা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তবুও আমাদের বোঝা উচিত যে, 'হায়া' হলো এক সহজাত এবং অর্জিত সুরক্ষা কৌশল, যা আল্লাহ আমাদের সকলকে দান করেছেন। 'আল্লাহ এ গুণকে বিশেষভাবে মানুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন। যেন তারা তাদের কামনার বশবর্তী হয়ে পাপ কাজে সহজে জড়িয়ে না পড়ে। তারা যেন বন্য পশুর মতো নির্লজ্জ হয়ে পাপ কাজে ঝাঁপিয়ে না পড়ে। 'হায়া' আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে আমাদের ক্ষতির জন্য ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখে। 'হায়া' আমাদের পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্বাভাবিক নিয়ম অমান্য করাই কি পাপ নয়? "হায়া, বা লজ্জাশীলতা একটি সহজাত বৈশিষ্ঠ্য হওয়ার এটি আমাদের ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত।

ফিতরাতের বেশিরভাগই নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে সর্বজনীন। যেমন, স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস একটি সার্বজনীন সহজাত বৈশিষ্ট্য। যদিও অনেক ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা কিংবা আশপাশের অন্যান্যদের (যাদের প্রত্যেকেই স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী) সাথে আমাদের মিথস্ক্রিয়ায় প্রভাবিত হয়ে আমরা সত্য থেকে দূরে সরে যাই বা বিপথগামী হয়ে পড়ি। একইসাথে লিঙ্গ-কেন্দ্রিক প্রবণতাও ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

'আর পুরুষেরা নারীর মতো নয়।' [সুরা আলে-ইমরান : ৩৬]

অসংখ্য আয়াত এবং হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, লিঙ্গের অস্তিত্ব জৈবিকভাবে এবং আধ্যাত্মিকভাবে বাস্তব। ইসলাম নারী-পুরুষ উভয় লিঙ্গের ব্যক্তিদেরকে তাদের পোশাক, যোগাযোগ, আচরণে গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্য ধরে রাখার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়।

নিঃসন্দেহে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই 'হায়া' একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু লিঙ্গ ভেদে 'হায়া' ভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। তাই আল্লাহ পুরুষ ও নারী উভয়কেই তাদের লিঙ্গ-নির্দিষ্ট ফিতরার জন্য ব্যাবহারিক সুরক্ষা প্রদান করেছেন। আল্লাহ তাঁর রাসুলকে নির্দেশ দিয়েছেন,

"হে নবী, আপনি আপনার পত্নীগণ ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।' [সুরা আহযাব : ৫৯]

আমাদের হিজাবকে পশ্চিমা-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূল্যায়ন করা বন্ধ করতে হবে। বরং হিজাবের আসল তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। হিজাব হায়ার রক্ষক। এটা মহান রবের পক্ষ থেকে নির্দেশিত একটি সুরক্ষাব্যবস্থা যা আমাদের শালীনতা নিশ্চিত করে। একটি বিখ্যাত হাদিসে বর্ণিত আছে,

'রাসুল' (সাঃ) আমাদের সিল্ক, দিবাজ, কাসিয়ি এবং ইস্তাবরাক (বিভিন্ন

ধরনের রেশমের পোশাক) পরিধান করতে বা লাল মায়াসির (রেশমের বালিশ) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

সিল্কের নিষেধাজ্ঞা কেবল পুরুষের জন্য প্রযোজ্য, কারণ এটি মূলত মেয়েদের সাজ। একই কারণে মুসলিম পুরুষদের সোনার গহনা পরতে নিষেধ করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহর রাসুল এমন পুরুষদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন যারা নারীদের অনুকরণ করে এবং এমন নারীদের অভিশাপ দিয়েছেন যারা পুরুষদের অনুকরণ করে।

রাসুল এমন ব্যক্তিকে অভিশপ্ত বলেছেন, "আল্লাহ যাকে পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে নিজেকে মেয়েলি সাজে সজ্জিত করল এবং নারীর অনুকরণ করল। ইনশাআল্লাহ, 'হায়া'র বিষয়টি পরবর্তী প্রবন্ধগুলোয় আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। আপাতত, আসুন আমরা বুঝতে চেষ্টা করি যে আমাদের লিঙ্গ-নির্দিষ্ট প্রবণতাগুলো আমাদের সৃষ্টিকর্তাপ্রদত্ত কার্যকরী এবং ব্যাবহারিক সুরক্ষাব্যবস্থা।

আল্লাহ পুরুষ এবং নারীকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, উভয়েরই উভয়কে প্রয়োজন। এটা আল্লাহর সুষম পরিকল্পনার অংশ। পরিচর্যার প্রবণতা পুরুষের তুলনায় নারীর মধ্যে অনেকগুণ বেশি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে পুরুষের মধ্যে পরিচর্যার প্রবণতা একেবারেই অনুপস্থিত। বরং আল্লাহ ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পরিচর্যার ঝোঁক নারীর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। আবার শারীরিক সামর্থ্যের দিকে পুরুষ নারীর তুলনায় এগিয়ে। তার মানে এই নয় যে নারীর মধ্যে শারীরিক সামর্থ্য একেবারেই নেই। বরং আল্লাহ ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য শারীরিক সামর্থ্যের ঝোঁক পুরুষের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

গবেষণায় প্রমাণিত যে, প্রাকৃতিকভাবেই লিঙ্গদ্বয়ের মাঝে ভারসাম্য বিদ্যমান। 'মেটা-এনালাইসিস প্রক্রিয়ায় পূর্ববর্তী গবেষণার বিপুলসংখ্যক ডেটা বিশ্লেষণ করে মনোবিজ্ঞানীরা আবেগের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের বেশ কিছু লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন। দেখা গিয়েছে যে, নারীরা তুলনামূলক বেশি সহানুভূতিশীল হয়ে থাকে, যেখানে পুরুষেরা যৌন ঈর্ষার আবেগ বা গাইরাহ নারীদের তুলনায় বেশি শক্তিশালীভাবে অনুভব করে। আবার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় বলা হয়েছে নারী ও পুরুষের মধ্যে জ্ঞানগত বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু পার্থক্য রয়েছে।

২০১৭ এবং ২০১৮''' ২০১৮ তে করা Pew Poll গুলো আমাদের লিঙ্গ ভেদে সহজাত বৈশিষ্ট্যের ধারণাকে ভালোভাবেই সমর্থন করে। পুরুষরা নারীর কিছু স্বতঞ্জ বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হয়।

আবার নারীদের কাছেও তেমনই পুরুষের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যেকে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। আসলে এটা কোনো গৎবাঁধা নিয়ম না; বরং এটা নারী-পুরুষের সাধারণ প্রবণতা।

যখন আমরা সর্বজনীন এবং লিঙ্গ-নির্দিষ্ট উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের ফিতরাকে শ্রদ্ধা করি এবং আপন করে নিই তখন আমরা আল্লাহর পরিকল্পনা এবং স্বাভাবিক নিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ করি। আর এটা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে সৎপথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। স্বাধীন ইচ্ছা থাকার অর্থ হলো ভালো এবং মন্দের মধ্যে, উপকারী এবং ক্ষতিকরের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা। কোরআন এবং রাসুলের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের ইচ্ছাকে সেই পথে পরিচালিত করা উচিত যে পথ অনুসরণ করলে দুনিয়ায় এবং আখিরাতে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহর আদেশ পালন করা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির অংশ, যার প্রতি আমরা স্বভাবতই আকৃষ্ট হই। যা আমাদের সত্যের পথে পরিচালিত করে।

শিশুদের পর্যবেক্ষণ এবং অধ্যয়নের মাধ্যমে ফিতরাতের প্রতি শ্রদ্ধা বোঝা যায়। স্রষ্টাপ্রদত্ত সকল সৌন্দর্য এবং পবিত্রতা শিশুর মাঝে আছে। কারণ শিশুরা বাহ্যিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে খারাপ কিংবা ক্ষতিকর কোনো কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয়নি, যা স্বাধীন ইচ্ছাকে খারাপ এবং ক্ষতির দিকে পরিচালিত করবে। শিশুদের পর্যবেক্ষণ করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারব আমাদের পরিচয় আসলে কি এবং আমরা কোথা থেকে এসেছি। তারা আমাদের সামনে আমাদের চরিত্রের সহজাত বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে–সৎ, সহানুভূতিশীল, ন্যায় এবং ফিতরাত পরিচালিত আল্লাহর সৃষ্টি।

স্বভাবতই শিশুরা আল্লাহর আনুগত্য করে। শিশুরা আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে তাদের মধ্যকার সহজাত প্রবণতাকে বাধা দেয় না। শিশুরা যখন বেড়ে ওঠে এবং চারপাশ সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করে; তখন তাদের ফিতরাহ অদৃশ্য হয়ে যায় না। কিন্তু এ প্রবণতাকে সক্রিয় রাখার জন্য প্রতিনিয়ত এমন সব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একে শানিত করতে হবে, যা তার জন্মগত সত্যকে দৃঢ় কার।। যেহেতু আমাদের স্বাভাবিক স্বভাব বা ফিতরাহ শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে সহজে। দেখা যায়, তাই আমরা তাদের মধ্যে সার্বজনীন মানবীয় গুণাবলিকে দেখি। এগুলো আমাদের সহজাত গুণাবলি এবং এগুলো সকল কিছুর প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত :

-ন্যায়পরায়ণতা (সকল ক্ষেত্রে সততা);

-পারস্পরিক শ্রদ্ধা (অন্যের জন্য সেটাই চাওয়া যা আপনি নিজের জন্য চান);

-সহানুভূতি (অন্যের আনন্দ এবং কষ্টের মধ্যে নিজের আনন্দ এবং কষ্ট দেখা) ।

একটি বাচ্চা যখন বড় হতে থাকে তখন সে পরিশীলিত উপায়ে শিখে যে সবকিছুতে সে তার পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচন করার অধিকার রাখে। সে শিখে যে নিয়ম ভাঙা যায়। সে বুঝতে পারে তার স্বাধীন ইচ্ছা তাকে অবাধ্য হওয়ার পাশাপাশি আনুগত্য করারও সুযোগ করে দেয়। আর এ কারণেই আমাদেরকে ক্রমাগত তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ আমাদের স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি কুরআন এবং নবী- রাসুলগণের মাধ্যমে নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন যাতে করে আমরা সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত হতে পারি।

সুতরাং যখন আমরা নিজেকে প্রশ্ন করি 'আনুগত্য' বলতে কি বুঝায় এবং গভীরভাবে চিন্তা করি আমরা কীভাবে আল্লাহর 'বান্দা' হলাম; তখন আমরা উপলব্ধি করি আত্মসমর্পণের এক অদৃশ্য শৃঙ্খল, যা আল্লাহর তৈরি নিখুঁত নকশার সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা। যখন আমরা আল্লাহর আদেশের কাছে নিজেকে সমর্পণ করি; তখন মূলত আমরা আমাদের ফিতরাহর (সহজাত প্রবৃত্তিরই) অনুসরণ করি। এবং ভালো কাজ করার মাধ্যমে এর মর্যাদা ধরে রাখার চেষ্টা করি; তখনই আমাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটে। এসব গুণাবলি আমরা যে সত্য নিয়ে জন্মেছি তাকে আরও শক্তিশালী করে। ফলস্বরূপ একটি ন্যায়সংগত, সুসংহত এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ তৈরির পথ খুলে যায়।

আমাদের বোঝা উচিত যে, আল্লাহর কাছে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করার অর্থ হলো, প্রতিটি কাজে সততার অনুশীলন করা। তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সহমর্মিতা লালন করা। আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা রাখা। অপরদিকে, আল্লাহর অবাধ্যতা আমাদের অন্তরকে ধ্বংস করে দেয়, মানবীয় গুণাবলির বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলস্বরূপ আমরা সুসংগঠিত এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে ব্যর্থ হই। আল্লাহ আমাদের সতর্ক করে বলেছেন,

'যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারা বোবা ও বধির, অন্ধকারের বাসিন্দা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।' [সুরা আল-আনআম : ৩৯]

তিনি আরও বলেন,

'তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছ।' [সুরা আর-রুম : ২০]

এইভাবে, যখন আমরা আল্লাহর নকশার স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে যাই, আল্লাহকে অমান্য করি এবং তার আদেশ লঙ্ঘন করি, এর অর্থ হলো তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা, সমবেদনা, ভালোবাসা, সহানুভূতি অনুশীলন থেকে নিজেদেরকে অক্ষম করে তুলছি। আমাদের অন্তর থেকে এগুলো আর আসবে না। এ মানবীয় মূল্যবোধ এবং গুণাবলি সৃষ্টির শুরু থেকেই নারী-পুরুষ উভয়েই চর্চা করে আসছে। এগুলো স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পায় যখন নারী-পুরুষ উভয়েই তাদের ফিতরাতকে সম্মান করে। এভাবেই উভয় লিঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য অর্জিত হয়।

'অতএব আপনি উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ করুন করুন।'

[সুরা আল-মাআরিজ : ০৫] ইসলামের বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বর্তমান লিঙ্গ-বিষয়ক আলোচনাকে এভাবে দেখলে তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আল্লাহ আমাদের এমন সমালোচনার মুখে ধৈর্যধারণ করার তাওফিক দান করুন। কারণ একমাত্র তিনিই সবকিছু সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন। আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত রাসুলকে তাঁর নিজের রক্তের আত্মীয়স্বজনরা অপমান করেছে, হেয় করেছে, এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আমরা যেন অপমান, অপবাদ এবং সমালোচনায় খুব সহজে হাল ছেড়ে না দিই, হতাশ না হয়ে পড়ি। আমাদের সবসময় সত্য বলার এবং বাকি সবকিছু আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর ন্যাস্ত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে,

'আর আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসুলের নির্দেশ মান্য করো। তা ছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা করো, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে

যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।' [সুরা আল-আনফাল : ৪৬]

আল্লাহ আমাদের একে অপরকে সৎ উপদেশ দেওয়ার তাওফিক দান করুনা আমরা যেন ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে একে অপরের নামে মিথ্যা প্ররোচন করা থেকে বিরত থাকতে পারি। আমরা যেন একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আন্তরিক হতে পারি সেই তাওফিক দান করুন।

পরিশেষে, আমাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, আমরা চাইলেই সবার অন্তর পরিবর্তন করতে পারব না। আল্লাহ বলেন,

'নিশ্চয় আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে আপনি হিদায়াত দিতে পারবেন না; বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন। আর হিদায়াতপ্রাপ্তদের ব্যাপারে তিনিই ভালো জানেন।' [সুরা আল-কাসাস :

এবং তিনি আরও বলেন,

'তাদেরকে সৎপথে আনার দায়িত্ব আপনার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন।' [সুরা আল-বাকারা :

পৃথিবীর বুকে জন্ম নেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল -ও প্রত্যেকের অন্তর পরিবর্তন করতে পারেননি।

'অতএব, আপনি ধৈর্যধারণ করুন। কারণ আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।' [সুরা আর- রুম : ৬০]

মাতৃত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ : মুসলিম নারীবাদীদের অবস্থান :

বিয়ে নাকি ক্যারিয়ার? আধুনিক বিশ্বের অসংখ্য মুসলিম তরুণী এ প্রশ্নে এসে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। তাদেরকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার কেউ থাকে না। একপর্যায়ে তারা কাফিরদের মতাদর্শ অনুসরণ করতে থাকে। এ যাত্রার শেষ হয় দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসের মধ্য দিয়ে।

অনেক মুসলিম নারীই তোতাপাখির মতো নারীবাদের বুলি আওড়ায়। জীবনের দীর্ঘ একটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তারা অবাক হয়ে ভাবে, 'আমি এত একা এবং নিঃসঙ্গ কেন?' এই পয়েন্টে এসে অনেকেই মুসলিম পুরুষদের ভীতু এবং কাপুরুষ বলা শুরু করেন। মেয়েদের সকল পশ্চাৎপদতার পেছনে পুরুষই একমাত্র কারণ ইত্যাদি ভয়াবহ সব অপবাদ দিতে থাকেন। মুসলিম পুরুষরা নাকি 'ক্ষমতাবান' স্বাধীন মুসলিম নারীদের সাথে চলতে ভয় পায়!

আমাদের দ্রুত সজাগ হতে হবে। বর্তমানে আরও বেশি। কেননা ধর্মকে বর্জন হোক বা ফেমিনিজমের 'ইসলামি নাম দিয়ে হোক, অসংখ্য মুসলিম নারী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ব্যক্তিজীবনে এসব বিষাক্ত, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট মতাদর্শ প্রচার করে বেড়াচ্ছেন।

যেসব নারীরা হালাল ক্যারিয়ার বেছে নিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো কথা নেই। আমার মা ছিলেন ধার্মিক নারী, পেশায় চিকিৎসক। আমি নিজে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছি। কলেজ জীবনের সেই সাদাসিধে দিনগুলোতে আমরা অনেক সামাজিক কাজ করতাম, 'বিশ্বকে পরিবর্তন করার স্বপ্ন দেখতাম, নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করতাম। চরম আর্থিক দুরবস্থার কারণে অন্য কোনো উপায় নেই এমন অনেক বোন আছেন। তাদেরকে নি আমাদের কোনো সমস্যা নেই। বরং আমার ক্রোধ এমন এক ব্যবস্থার প্রতি যেখানে ক্যারিয়ারই নারীর একমাত্র মূল্য, এর বাইরে নারী যেন কিছুই নন। ফলস্বরূপ নারীকে আজ এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

আমি নিজেকেও এ প্রশ্ন নিয়ে লড়াই করতে হয়েছে। ঠিক আছে আমি একজন স্ত্রী এবং মা, কিন্তু এটাই কি যথেষ্ট? নারী হিসেবে আমি যোগ্য তো? বেশ কয়েক বছর পর আমি বুঝতে পেরেছি, আসলে এ প্রশ্নটা নিজেই বিষাক্ত। একজন ভালো স্ত্রী এবং একজন ভালো মা হওয়ার চেয়ে সেরা আর কী আছে? এর চেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং আর কি হতে পারে? আর এর চেয়ে বেশি পরিপূর্ণতা আর কীসের মাধ্যমে আসতে পারে? একটি সুসংহত, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ পরিবারই তো ধীরে ধীরে গড়ে তুলবে একটি সুদৃঢ় মুসলিম উম্মাহ। এর প্রতিষ্ঠায় কাজ করার চেয়ে বেশি কার্যকরী বিষয় আর কী আছে?

নারীবাদ এতে খুশি না। তাদের মতে, আমাদেরকে 'আরও বেশি কিছু' হওয়া প্রয়োজন। এভাবেই নাকি 'নারীদের সম্ভাবনা পূরণ করা যাবে'। তাদের মতে, নারীর আসলে স্বামী এবং সন্তানকে সময়

দেওয়া উচিত না। তাদের বরং উচিত তাদের মূল্যবান সময় দিন, সপ্তাহ, এমনকি বছরও অর্থ, খ্যাতি এবং নেতৃত্ব অর্জনের লক্ষ্যে ব্যয় করা। এভাবে নারীর কিছু অর্জন হয় বটে, কিন্তু হারায় অনেক বেশি কিছু। যেখানে পুরো সিস্টেমই নারীদেরকে এসব শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর, আমরাই পারি বদলাতে। কেননা, তাদের ষড়যন্ত্র আমাদেরকে নিয়েই। আমরাই পারি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে।

দুঃখজনকভাবে, কিছু মুসলিম এ কাজই করছেন। এ বিষাক্ত মানসিকতা ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

একজন মুসলিম আইনজীবী এবং কর্মী জহরা বিষ্ণু তার কষ্ট ও হতাশা বর্ণনা করে গত সপ্তাহে একটি ফেসবুক পোস্ট লিখেছেন। তার দুঃখের কারণ, তিনি তার এমন ক্যারিয়ারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো পাত্র পাচ্ছেন না। আশ্চর্যের বিষয় ছিল, তার এ অবস্থার জন্য তিনি মুসলিম পুরুষদেরকে দায়ী করেছেন।সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীই নাকি এর জন্য দায়ী।

তিনি একটি গল্প শেয়ার করেছেন। একদিন এক রেস্তোরাঁয় তিনি খাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন মুসলিম বাবা তাঁকে দেখে মাত্রই চিনে ফেললেন। আত্মহারা হয়ে তিনি বললেন, তিনি চান তাঁর মেয়েটিও বিলুর মতো হয়ে উঠুক। বিলু অহরহ এমন প্রশংসায় ভাসে। এটা তার কাছে নতুন কিছু না। তবে অবাক করা বিষয় হলো, যে ব্যক্তি তার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে সে নিজেও নাকি এমন কথাই বলেছে।

সে লোক তাঁকে বলেছিল, “আমি চাই আমার মেয়ে আপনার মতো হয়ে উঠুক। কিন্তু স্বামী হিসেবে আপনার ক্যারিয়ারের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া আমার জন্য সম্ভব হবে না। আমি এটাও চাই না আপনি আমার জন্য নিজেকে পরিবর্তন করুন।” বিলুর কাছে এটা ভণ্ডামি। আমার কাছেও, তবে অন্য কারণে।

একজন বাবা কীভাবে তার মেয়ের জন্য এমন একটা ক্যারিয়ারের স্বপ্ন দেখেন যেখানে ইসলামি নিয়মে বিয়ে করতে, সুস্থ মুসলিম পরিবার গঠনে সমস্যা হবে, সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপন বাধাগ্রস্ত হবে? কেন একজন সুস্থ মানসিকতার বাবা চাইবেন তার মেয়ের এমন পরিণতি হোক?

কিন্তু বিলু এবং তাঁর মতো নারীবাদী রোগে আক্রান্ত প্রত্যেকে মনে করেন যে, একজন উদ্যমী কর্মজীবী নারীকে বিয়ে না করতে চাওয়া পুরুষের দোষ কিন্তু কেন? পুরুষরা কেন স্ত্রী থেকে তার

চাহিদা পরিষ্কারভাবে বলতে পারবে না? সত্য বলতে বেশিরভাগ পুরুষই চান না, তাদের স্ত্রীদের হাই প্রোফাইল ক্যারিয়ার থাকুক, তারা বাইরে সময় দিক। বেশিরভাগ মুসলিম পুরুষই এমন স্ত্রী চান যারা ইসলামি শরিআহ অনুযায়ী মাতৃত্বের ভূমিকাকে প্রাধান্য দেবে।

বর্তমান বিশ্বে নারীরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে করার অধিকার রাখে। এজন্য কেউ নারীদের কোনো সমালোচনা করে না। যারা কম অর্থ উপার্জন করেন, যাদের গ্ল্যামারাস জব নেই তাদেরকে বিয়ে করতে না চাইলেও নারীদের বিরুদ্ধে কেউ আঙুল তুলে না। কেউ মুসলিম নারীকে বলে না, 'হে নারী, জাগ্রত হও! অর্থনৈতিক সুবিধাবঞ্চিত পুরুষকে বিয়ে করো।' উদাহরণস্বরূপ, রিক্তহস্ত দরিদ্র পুরুষকে বিয়ে করার জন্য আবেগী ফেসবুক পোস্ট বা কাঁদো কাঁদো চোখের সাক্ষাৎকার দেওয়া কোনো শর্টফিল্ম দেখা যায় না।

মূল সমস্যা হলো, এরা কেবল অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর নারীদেরকেই মূল্যায়ন করে, তাদেরকেই সেরা মনে করে এবং মনে করে সবার আসলেই তাই করা উচিত। আমরা মুসলিমরা এভাবে কোনো নারীকে মূল্যায়ন করি না। বিলুর বোধদয় ঠিকই আছে। মুসলিম পুরুষরা, মুসলিম জনগোষ্ঠীও এভাবে মূল্যায়ন করে না, করা উচিত না।

আধুনিক নারীবাদীরা নারীদেরকে সবার ওপরে ক্যারিয়ারকে প্রাধান্য দিতে বলে। এর জন্য তারা সোশ্যাল মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া থেকে শুরু করে কোনটার সাহায্য নেয় না? 'ক্ষমতাবান হোন!' এ স্লোগান জপ করে তারা। 'স্বাধীন হোন!', 'মাথায় পুশি হ্যাট/জেনিটালিয়া হ্যাট পরে উইমেনস মার্চে যোগদান করুন', 'বিশ্বকে পরিবর্তন করার জন্য একজন ঠোঁটকাটা নারীকর্মী হয়ে ওঠুন', 'পুরুষতন্ত্রকে হত্যা করুন' পুরুষরা দুষ্ট, বিষাক্ত এবং স্বার্থপর। তারা আপনাকে দাসী বানাবেই। কাজেই স্বামীর আনুগত্য করবেন না। বরং একটি চাকরি খুঁজে বের করুন এবং আপনার বসের আনুগত্য করুন! মজুরির বিনিময়ে দাসী হোন! এটাই স্বাধীনতা। এতে আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতেই হবে। কেননা একজন পুরুষ যা করতে পারে তা আপনিও করতে পারছেন। একজন পুরুষ হাই প্রোফাইল ক্যারিয়ার পেতে পারে। তাহলে আপনি কেন নন?

এটা নারীবাদ। ইসলাম ঠিক তার বিপরীত।

তাহলে যে নারী তার ক্যারিয়ারের চেয়ে স্বামী, সন্তান এবং গৃহের প্রতি বেশি নিবেদিত এমন একজনকে স্ত্রী হিসেবে চাওয়া কেন দোষের হবে?

বিলু আরও বলেছিল, 'মানুষ নারীবাদী কর্মীদেরকে দূর থেকে সমর্থন করে ঠিকই কিন্তু নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বের হতে তারা রাজি নয়। প্রতিদিন বাড়িতে রান্না করা গরম খাবার তাদের ঠিকই চাই।'

এটাই কি স্বাভাবিক না? সারা দিনের ক্লান্তি শেষে বাড়িতে এসে স্বাচ্ছন্দ্য এবং রান্না করা গরম খাবারের আশা করা কি অযৌক্তিক? কোনো পুরুষের বিয়ে নিয়ে এমন ধারণা পোষণ করা কি প্রমাণ করে যে তিনি নিকৃষ্ট, সেক্সিস্ট'১৯৬] কিংবা নিপীড়ক?

একজন নারী নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করতে হবে, আসলে তার মূল্য কোথায়? প্রতিদিন অনলাইনে আমরা অনেক হাই প্রোফাইল ক্যারিয়ার-সম্পন্ন নারীর গল্প দেখি। হয়তো তারা ত্রিশ, চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ বছরের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। তারা বিয়ে করেনি, বাচ্চা নেয়নি। এমন অসুস্থ পরিবারের অসুস্থ নারীদের জীবনকাহিনি দেখে আধুনিক মুসলিম মেয়েরা হতাশ হয়। যদি তারা জানত, কত বড় কিছু হারিয়েছে তারা জীবনে!

তারা আফসোস করবে, করে, 'কেন আমি শুধু একটা চাকরির জন্য আমার জীবনের সেরা সময়গুলো ধ্বংস করেছি? চাইলেই তো আমি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ একটি পরিবার গঠন করতে পারতাম। এখন আমি শারীরিকভাবে সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম। আমি কখনো একটি বড় পরিবারের অংশ হতে পারব না। এর জন্য কে দায়ী?'

এমন ভবিষ্যৎ কষ্টের, লাঞ্ছনার কে চায় তার সন্তানের সাথে এমন হোক?

নারীর শ্রেষ্ঠত্ব মাতৃত্বে। নারী-মাত্রই চায় সন্তান জন্ম দিতে, মা ডাক শুনতে, তাদেরকে ভালোবাসায় আগলে রাখতে ও মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে। অবাক করা বিষয় হলো, মাতৃত্বের এ পুরো ধারণাকেই খুব বেশি ছোট হিসেবে দেখানো হয়, অবজ্ঞা করা হয়। তারা যেন তাদের যৌবনের সবচেয়ে কর্মক্ষম সময়গুলো ভালো স্ত্রী এবং মা নয়; বরং কর্পোরেট কোম্পানির চাকর হতে ব্যয় করে। এটিই সভ্যতার ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট।

পুরুষ নারীর মতো নয় (আপনার পছন্দ না হলে কিছু আসে যায় না)

নারীবাদীদের একটি মজার বিষয় হলো, তারা পুরুষদেরকে জাতিগতভাবে খারাপ মনে করে আবার পুরুষদেরকেই সফলতার মানদণ্ড হিসেবে উপস্থাপন করে যেন নারীরা পুরুষদের মতো

করে কাজ করতে পারলেই সত্যিকার অর্থে সফল হয়ে উঠতে পারবে। বিলু বলেছেন, 'আল্লাহ আমার জন্য এ পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমাকে অনেক সময় ধরে কাজ করতে হয়। তা আমি আমার জীবন ও শরীরের বিনিময়ে হলেও করে যাব। এভাবেই আমার জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করা সম্ভব।'

কথাটা হাস্যকর। আল্লাহ কী ঠিক করে দিয়েছেন তা আমরা কীভাবে নির্ধারণ করব? টেক্সটে কি এমন বলা আছে? সালাফদের কেউ বলেছেন? পরিবার থেকে দূরে থেকে 'দীর্ঘ সময় কাজ করে জীবন উৎসর্গ' করার এমন ভূমিকাকে ইসলাম কীভাবে সমর্থন করে? ইসলামে কোথায় কোনো মুসলিম নারীকে এমন কিছু করতে বলা হয়েছে? ইসলামে কোথায় এমন কিছুকে উৎসাহিত হয়েছে?

ইসলাম পুরুষের ওপর আরোপ করেছে পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় জিনিস তাকে সরবরাহ করতে হবে এবং পরিবারের সুরক্ষার জন্য কাজ করতে হবে। নারী নয়, বরং পুরুষদেরকে এ কঠিন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে, তারা তাদের জীবনের বিনিময়ে হলেও তাদের পরিবার, সম্প্রদায় এবং মুসলিম উম্মাহর সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। জরুরি এবং নাজুক পরিস্থিতিতে অবশ্যই একজন নারী তাঁর পরিবার এবং সন্তানদের রক্ষা করতে কাজ করবেন, তবে সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় আল্লাহ এ দায়িত্ব নারীর জন্য নিবারণ করেননি। এ কাজ মুসলিম পুরুষদের।

পুরুষের কিছু স্বতন্ত্র গুণাবলি আছে, তেমনই নারীরও আছে কিছু স্বতন্ত্র গুণাবলি। পাশাপাশি পুরুষের স্বতন্ত্র কিছু দুর্বলতা আছে এবং নারীরও আছে নারীজাত দুর্বলতা। নারীবাদ প্রচণ্ড চেষ্টা করে সব নারীজাত গুণাবলিকে পুরুষালি রং দিতে এবং পুরুষ ও নারীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলোর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে। একে একটি যুদ্ধের রূপ দেওয়া হয়েছে। এখানে পুরুষত্ব (বিষাক্ততা) হলো খলনায়ক, সংগ্রামী হলো নারীত্ব (দুর্বলতা)। এখানে সমঝোতা নেই, ভালোবাসা নেই। আছে বিরোধ এবং যুদ্ধ।

ইসলামি শরিআহ এগুলোর ঠিক বিপরীত। লিঙ্গগত পার্থক্য এবং নারী-পুরুষের ভূমিকা নিয়ে ইসলামে একটি সুসংহত এবং সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। ইসলাম বিয়ে এবং পরিবারকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করে এবং সেখানে নারী পুরুষের ভূমিকা নির্ধারণ করে দেয়। প্রতিটি ব্যক্তির নির্দিষ্ট অধিকার এবং দায়িত্ব রয়েছে, এগুলো অবশ্যই লিঙ্গভেদে আলাদা। স্বামী

পরিবারের নেতৃত্ব দেবেন, তিনি তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানদের মুত্তাকি, উচ্চ নৈতিকতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। এ কাজের জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ। 'নিশ্চয় আল্লাহর পাকড়াও বড় শক্ত।' [সুরা বুরুজ : ১২]

একজন স্ত্রী হলেন তার সাহায্যকারী এবং অনুগত সহযোগী, যে তার কর্তৃত্বকে সম্মান করে এবং একটি আদর্শ মুসলিম পরিবার গঠনের যৌথ মিশনে তাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে। স্বামী পরিবারের নেতৃত্ব দেবেন, এর জন্য তার কাঁধে অনেক কঠিন দায়িত্ব আসে। তাকে অবশ্যই স্ত্রী এবং সন্তানদের পুরোপুরি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা দিতে হবে এবং কোনো প্রকার অবহেলা না করে সবসময় তাদের প্রয়োজনে উপস্থিত থাকতে হবে। এগুলো একজন মুসলিম স্বামীর দায়িত্ব এবং একজন মুসলিম স্ত্রীর অধিকার। একজন মুসলিম স্ত্রীর দায়িত্ব এবং তাঁর স্বামীর অধিকার হলো তিনি একজন অনুগত সহযোগী হিসেবে তাঁর সঙ্গীকে খুশি করতে স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের বাড়ি, সন্তান এবং নিজেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হবেন। এটি আল্লাহর মহত্ত্বের একটি উদাহরণ। এটি এমন এক কার্যকর শ্রম বিভাজন যেখানে নারী পুরুষ তাদের সহজাত শক্তিকে পুঁজি করে যথাযথ ভূমিকা পালন করে।

আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে যদি দেখি, তাহলেও দেখা যায় ঐশী ইসলামি জীবনব্যবস্থা ধ্বজভঙ্গ নারীবাদের চেয়ে কতটা সুন্দর, কতটা যৌক্তিক।

বিলু আরও বলেছেন–

"আমি রেস্তোরাঁর সে লোকটিকে এসব বলিনি, কিন্তু এখানে বলছি। আমি আশা রাখি যে, যারা তাদের মেয়েদেরকে কর্মী এবং নেত্রী হিসেবে গড়ে তুলছেন তারা লেখাটি পড়বেন। কিন্তু তাতে থেমে গেলে হবে না একদম ময়দানে লড়াই করে চলা নারীদেরকে বিকশিত, সমুন্নত, সমর্থন করতে আপনার ছেলেদেরকেও শিক্ষা দিন। আমরা আমাদের পরিবার এবং সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে পরিবর্তন আনতে পারব না।'

মুসলিমরা তাদের মেয়েদেরকে কেন নারীবাদী কর্মী হিসেবে গড়ে তুলবে? এটাই কেন আদর্শ হবে তাদের জন্য? ইসলাম কীভাবে এসবে উৎসাহিত করে? একজন নারীর তাঁর ক্যারিয়ারের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি কীভাবে ইসলামি হয় যেখানে নারীকে প্রায়ই দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করতে হয় মাহরাম ছাড়া বাড়িতে না থেকে পরিবার থেকে দূরে থাকতে হয়, অন্যান্য পুরুষ সহকর্মীর সাথে

মিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে হয়? তারা যতই অপছন্দ করুক, একজন মুসলিম হিসেবে আমাকে আপনাকে বিষয়টি তুলে ধরতেই হবে।

মিথ্যা এবং ভুল রেফারেন্সের আধিক্য:

মিথ্যা এবং ভুল রেফারেন্স দেখানো যেন আজকাল মুসলিম নারীবাদীদের একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তারা প্রায়ই সাহাবিদের উদাহরণ টেনে এনে নিজেদের ভ্রান্ত কাজগুলোকে বৈধ করার চেষ্টা করে। বিলু লিখেছেন, "আমাকে উৎসাহিত করেছেন উম্মুল মুমিনিনরা, রাসুলের স্ত্রীরা, মুসলিম নারীবাদী আন্দোলনের নেত্রীবৃন্দ এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে টিকে থাকা বোনেরা। তাদেরকে সুরক্ষা দেওয়া, সমর্থন করা, সমুন্নত করা এবং ভালোবাসা আমাদের ঈমানের অংশ। মুসলিম পুরুষ এবং তাদের ছেলেদেরও এ ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া উচিত।"

দয়া করে কোনো সাহাবিয়্যাতকে এসব জগাখিচুড়ির মধ্যে টেনে আনবেন না। রাসুলের সময়ে কোনো মুসলিম পুরুষ কি এমন কোনো নারীকে বিয়ে করেছিলেন যিনি দীর্ঘ সময় ধরে বাইরে কাজ করতেন? কিংবা যিনি রাস্তায় মিছিলে সরব ছিলেন এবং ইসলামে নারী পুরুষের ভূমিকা নিজের মতো ব্যাখ্যা করতেন?

বিলু যেভাবে রাসুলের স্ত্রীদের নারীবাদী 'কর্মী' এবং 'নেত্রী' হিসেবে আখ্যা দিয়েছে এভাবে তাদের সম্পর্কে বলা অন্যায়, গুনাহ। রাসুল এবং সাহাবিদের প্রজন্মই যেন নারীবাদ ও লিবারেলিজমের জন্ম দিয়েছে। এসব বানোয়াট, ভ্রান্ত ও কুফরি মতাদর্শ ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের ওপর চাপিয়ে দেওয়াটা চরম অন্যায় ও ভণ্ডামি।

উম্মুল মুমিনিনরা কি তাদের পরিবার ছেড়ে মাহরাম ছাড়া একা একা কোনো নানা পুরুষের সম্মিলিত সমাবেশে যোগ দিয়ে নারী স্বাধীনতার পক্ষে জ্বালাময়ী বক্তব্য দিয়েছিলেন? পর্দার বিধান নাজিলের পর কি তাদের কেউ যুদ্ধের প্রথম কাতারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন?

সবগুলো প্রশ্নের উত্তরই হলো 'না'।

আমরা জেনে না জেনে আধুনিক পশ্চিমা নারীবাদীদের দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত হই। ঐতিহাসিকভাবে মুসলিম নারীরা অধিকাংশই 'মা' এবং 'স্ত্রী' ছিলেন। এ সত্যটাকে যেন আমরা মানতেই চাই না। তাঁরা কেউই নারীবাদী 'নেত্রী', 'কর্মী', 'প্রতিবাদী প্রগতিশীল ছিলেন না। না তাঁদের অধিকাংশই কোনো স্কলার ছিলেন, না ছিল 'নারী স্কলার' কোটা পূরণ করার মতো কোনো সংস্কার।

সত্যি বলতে, খাদিজা রা. একটি ব্যবসার প্রধান নির্বাহী ছিলেন (Fortune ৫০০ CEO), কীভাবে আয়েশা রা.-ও পুরুষদের শিক্ষক হয়েছিলেন–এসব শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত।

নিঃসন্দেহে খাদিজা রা. একজন ধনী নারী ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সম্পদ মৃত স্বামীর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি নিজে ব্যবসা করেননি বা সশরীরে কোথাও ব্যবসা পরিচালনার জন্যও যাননি। বরং এ কাজে তিনি স্টাফ নিযুক্ত করেছিলেন। বিয়ের পরে তিনি রাসুলের সেবাযত্ন, তাঁর কাজের সমর্থনে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি স্বামী, ছয় সন্তান-সহ একটা সুন্দর, আদর্শ পরিবার গড়ে তুলেছিলেন। নবুয়তের আগে এবং পরে, পুরোটা সময় ধরেই তিনি ছিলেন রাসুলের একনিষ্ঠ, সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহযোগী এবং সমর্থক। তিনি নিজ হাতে খাবার রান্না করে এত উঁচু পাহাড় বেয়ে হেরা গুহায় রাসুলকে দিয়ে আসতেন এরপরও কিনা আপনি তাঁকে 'পুরুষতন্ত্রবিরোধী নারীবাদী' দাবি করেন? আজকের কোনো নারী ব্যবসায়ীর সাথে খাদিজা রা.-এর এ চেহারা ঠিক মেলে না।

নিঃসন্দেহে আয়েশা রা.-এর অগাধ ইলম ছিল। তিনি প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হাদিস বর্ণনা করেছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু তা ছিল পুরোপুরি পর্দা পালন করে। হাদিস বর্ণনার সময় তিনি থাকতেন পর্দার অপর পাশে, কথা বলতেন নিজের কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে। অনেক সময়ই কথা বলার দায়িত্বে থাকতেন তাঁর ভাতিজা।

আজকের মুসলিম নারীবাদী কর্মী এবং প্রচারকরা 'স্বাধীন, ক্ষমতাবান, শক্তিশালী মুসলিমাহ'র নামে যে মানসিকতা লালন করে, সাহাবিয়্যাতরা নিজেদেরকে এমন জায়গায় কল্পনাও করতে পারতেন না। আর তাদের জীবন ও কর্মের সাথে এদের জীবন ও কর্মের কোনোপ্রকার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাকে যখন তখন শারিআহ বলে চালিয়ে দেওয়ার প্রবণতা একেবারেই ভালো নয়।

রাসুলের এ অন্যান্য স্ত্রীদের বেশিরভাগেরই তেমন কোনো সম্পদ ছিল না, প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষাও ছিল না। ইবাদাতের বাইরে বেশিরভাগ সময়ই তাঁরা রাসুল এবং তাঁর মেহমানদের জন্য রান্না করতেন, বাচ্চাদের দেখাশোনা করতেন এবং গৃহস্থালির কাজকর্ম সামলাতেন। তাঁরা কি উম্মুল মুমিনিনদের অন্তর্ভুক্ত নন? এমনও তো নয় যে আয়েশা রা. গৃহস্থালি কাজ করেননি কিংবা রাসুলের দেখাশোনা করেননি।

এসব নারীবাদীরা কেন মারইয়াম আ.-এর কথা বলে না?

মারইয়াম আ. ছিলেন ঈসা আ.-এর মা। সমগ্র নারীজাতির মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক ছিলেন তিনি। তিনিই একমাত্র নারী যার নাম কুরআনে এসেছে। সুরা আলে ইমরানে আল্লাহ তাআলা বলেন,

> 'এবং যখন ফেরেশতারা বলেছিল, হে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে মনোনীত করেছেন এবং আপনাকে পবিত্র করেছেন এবং আপনাকে বিশ্বের সকল নারীর ওপরে সম্মানিত করেছেন।' [সুরা আলে ইমরান ৪২]

তিনি হলেন সমগ্র নারীজাতির জন্য আদর্শ। ইয়াকিন এবং ইবাদতের বাইরে তাঁর এ মহান সম্মানের একমাত্র কারণ তাঁর মাতৃত্ব। ইসলামে নারীর সম্মান এবং গুরুত্বের মূল কেন্দ্র মাতৃত্ব। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কর্পোরেট কোম্পানিতে চাকরি করা, রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করা এবং পরিবার অস্বীকার করার মধ্যে কোনো গৌরব নেই।

মুসলিম নারীবাদী ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ধ্বজাধারী কর্মীরা সবাইকে জোর করে বিশ্বাস করাতে চায় যে, নারী এবং পুরুষরা সকল দিক থেকেই একই। একসময় তারা বলত, কোনো লিঙ্গের স্বতন্ত্র কোনো ভূমিকা নেই। এখন তারা বলছে, লিঙ্গ বলেই কিছু নেই। সবই নাকি পুরুষতন্ত্রের সৃষ্টি। যুগে যুগে মানবসভ্যতার কেন্দ্র হিসেবে দেখা হয়েছে পরিবারকে। নারীবাদীরা এ পরিবারকেই মনে করে জুলুমের শিকল এবং ধর্ষণের ষড়যন্ত্র। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো যারা, তারাও পরিবারকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে। স্ত্রীর ভূমিকা পালন করাকে তারা বলছে, 'ঘরোয়া ন্যাকামি'। মাতৃত্ব কেবল দয়া ও সহানুভূতির নাম 'আসল কাজের' প্রতিমাসে ধারেকাছেও নেই মাতৃত্বের কাজ। আসল কাজ হলো কেবল সেই কাজ, দুইবার পে চেক আসে যেটা করলে।

এটা ইসলাম নয়। শ্রেষ্ঠ তিন প্রজন্মের কোনো নারী ইসলামকে এভাবে দেখেননি।

বংলাদেশের নারীবাদের চিত্রপট:

আমাদেরকে বিয়ের কন্যাদের এমন করুণ ছবি দেখানোর দরকার নেই।–ওয়াশিংটন পোস্ট! বাংলাদেশের মতো দেশের বাল্যবিবাহের সাথে আমেরিকা বা পশ্চিমা ইউরোপের বিয়েকে মিলিয়ে লাভ নেই। সেখানে মানুষ গড়ে ২৭-৩৫ বয়সের মধ্যে বিয়ে করে। এদের মধ্যকার তুলনা আপেল ও কমলার তুলনার মতো। ওয়াশিংটন পোস্ট দেখানোর চেষ্টা করেছে যে, বাংলাদেশে ১৪, ১৫ ও ১৬ বছরের ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েদেরকে তাদের ইচ্ছার বাইরে জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সঠিক তুলনা হবে, পশ্চিমের ১৪-১৬ বছর মেয়েদের সাথে। পিয়ার প্রেসার (বন্ধুবান্ধবের প্রভাব), পপ কালচার, ফ্যাশন, যৌনশিক্ষা ইত্যাদির প্রভাব পশ্চিমের এ বয়েসী অসংখ্য মেয়ে যৌনায়িত হয়, যৌনাচারে লিপ্ত হয়। 'সেক্সটিং, সংস্কৃতির প্রভাব দেখুন। ইন্টারনেট, সেল ফোন প্রযুক্তি পশ্চিমের শিশু কিশোরদের যৌনতাকে নাটকীয়ভাবে বদলে দিয়েছে।

১২-১৩ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া পশ্চিমে অনেক বেশি স্বাভাবিক। পশ্চিমে একে কোনো সমস্যা হিসেবেই দেখা হয় না। সংযম শিক্ষা দেওয়ার বদলে প্রাইমারি স্কুল থেকে হাইস্কুলে বাচ্চাদের 'নিরাপদ সঙ্গম' শেখানো হয়। ১৮ বছরের নিচে দুজন টিন এজার যদি যথাযথ নিরাপত্তা বিধি অনুসরণ করে সঙ্গমে লিপ্ত হয়, যদি স্ন্যাপচ্যাটে নিজেদের মধ্যেই নিজেদের উলঙ্গ ছবি ঘোরাফেরা করে তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। এ কাজ কেবল টিন এজারদের মধ্যে হলেই হবে। বরং এটা নাকি স্বাস্থ্যকর। এভাবেই নাকি মুক্ত-স্বাধীন হওয়া যায়। এখানে বাবা-মা থেকে শুরু করে স্কুল, সমাজ সব এমনই হতে উৎসাহিত করে টিন এজারদেরকে। কিন্তু সুদূর বাংলাদেশে ১৫ বছর বয়েসী কেউ বিয়ে করে, তাতে

ওয়াশিংটন পোস্টের খুব কষ্ট হয়। এটা নাকি একজন মেয়ের সম্মানের ওপর নির্দশ আক্রমণ। অথচ টিন এজার বালিকাদের যৌন সক্ষমতা এখানে কোনো সমস্যা বলে মনে হচ্ছে না।

কম বয়সে বিয়ে করার কারণে যদি শিক্ষার ক্ষতি হবে আশঙ্কা করা হয়, সে ক্ষেত্রেও আমরা পশ্চিমা তরুণীদের উদাহরণ আনতে পারি। তারা ঠিক কতটা পড়ালেখা করে? পশ্চিমের সমাজ সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা আছে এমন যে-কেউই স্বীকার করবে, এখানের তরুণ-তরুণীরা এক অদ্ভূত সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে আছে। তাদের প্রায় সারাটা দিন যায় ডেটিং, ঘোরাঘুরি, সেক্সটিং, প্রেম ইত্যাদি করে। তখন কারও মনে হয় না এতে পড়ালেখা ও ক্যারিয়ারের ক্ষতি হচ্ছে।

শেষমেশ আপনি যদি তাদের সম্মতির ব্যাপারে আপত্তি তোলেন, আপনার যদি মনে হয় এমন বিয়েতে তাদের সম্মতি থাকে না, আমি বলব এটি পুরোটাই প্রেক্ষাপট ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। আমি বাই ডিফল্ট ধরে নেবো না যে, এ বয়েসী কোনো মেয়েই বিয়ে করতে চায় না। স্কুল কলেজে প্রেম করে বেড়ানো অনেক মেয়েই কিংবা জীবনসঙ্গীর সাহচর্য পেতে চায়। কিন্তু নৈতিকতা, সমাজ তাকে বাধা দিচ্ছে। এমন অনেকেই আছে যাদের বিয়ে দিলে তারা খুশিই হবে। তাদের বয়স ১২-১৬ বছরই। কিন্তু এগুলো কেউ তুলে আনে না। বাংলাদেশের মতো অনেক দেশেই স্যাটেলাইট টিভি বা ইন্টারনেটের কারণে সামাজিকভাবে পশ্চিমা সংস্কৃতি গ্রহণযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। সেখানকার টিন এজাররা পশ্চিমা টিন এজারদের মতোই ক্যাজুয়াল ডেটিং করছে, গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড সম্পর্কে জড়িয়ে যাচ্ছে, এমন অনেক কিছু। এগুলোকে যদি কেউ উন্মাদ আনন্দ, 'স্বাধীনতা' নামক ফালতু ধারণার সাথে জড়িয়ে ফেলে তাহলে কিছু করার নেই। কিন্তু এ বিষয়টিকে বাদ দিলে, আমরা যদি তাদের কাজকে হিসেব করি, তাহলে কম বয়সে বিয়েতে সমস্যা কোথায়? ঠিক কী কারণে একই কাজ পশ্চিমা নিয়মে করলে উন্নত, সভ্য? ক্যাজুয়েল সেক্সের সংস্কৃতি খুব ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে মুসলিম বিশ্বের টিন এজারদের মধ্যে। এ কারণে মুসলিম পরিবারগুলো আতঙ্কিত হয়ে তাদের সন্তানদেরকে দ্রুত বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। আগে হয়তো পড়াশোনাকে বেশি গুরুত্ব দিত বাবা-মা ও সন্তান উভয়েই। দিনকে দিন দুদিকেই তা কমছে।

সমস্যা হলো, বিষয়টি অনেক জটিল। ওয়াশিংটন পোস্ট নিজেদের একগুঁয়ে নীতির কারণে তৃতীয় বিশ্বের একটি উদাহরণ এথনোসেন্ট্রিক

ও সরলভাবে উপস্থাপন করল, সাথে সাথে একটি প্রোপাগান্ডা যুক্ত করে দিলো–কন্যার করুণ চেহারার ছবি। এ রিপোর্টে কন্যার কোনো কথাই আসেনি বা অন্য কোনো কন্যার কোনো মন্তব্যও জানতে চাওয়া হয়নি। আমাদেরকে যাই দেখানো হয় তা পশ্চিমা ফটোগ্রাফারের দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শিক চেতনায় সেন্সর হয়ে আসে।

পরিষ্কার করে বলে রাখা ভালো, আমি বাংলাদেশ কিংবা তেমন দেশগুলোতে বিয়ের সব সংস্কৃতিকে সমর্থন করি না। যেমন, জোর করে কোনো মেয়েকে বিয়ে দেওয়া ইসলামের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। আমার লেখার উদ্দেশ্য হলো, পশ্চিমা মিডিয়ার ভণ্ডামি, ডাবল স্ট্যান্ডার্ড এবং

স্টেরিওটাইপিংকে তুলে ধরা। আর এসব করার অন্যতম কারণ নিজেদের সংস্কৃতিকে বড় মনে করা এবং মুসলিম সংস্কৃতিকে নীচু মনে করা।

আল্লাহ এমনি এমনি আমাদেরকে মুসা আ. ও ফিরাউনের সংঘাতের কথা বলেননি। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তুলে ধরেছেন সংঘাতের স্বরূপ,

'আর আমি চাইলাম সেই দেশে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে এবং তাদেরকে নেতা বানাতে, আর তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানাতে।' (সুরা আল-কাসাস : ৫)

এ শক্তির হাতবদল আল্লাহ শুরু করেছেন একজন নারীর হাতে,

'আর আমি মুসার মায়ের প্রতি নির্দেশ পাঠালাম, 'তুমি তাকে দুধ পান করাও। অতঃপর যখন তুমি তার ব্যাপারে আশঙ্কা করবে, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করবে। আর তুমি ভয় করবে না এবং চিন্তা করবে না । নিশ্চয় আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে রাসুলদের অন্তর্ভুক্ত করব'।' (সুরা আল-কাসাস : ৭)

ইসলামের শত্রুদের সাথে আমাদের যুদ্ধের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো– নারী। জয় বা পরাজয় আসে নারীদের হাত ধরেই। এসব শুধু বক্তব্য আর কবিতাই নয়; বরং এক কঠিন বাস্তবতা। আমাদের অবশ্যই এদিকে গভীর মনোযোগ দিতে হবে।

এই শ্রেষ্ঠ উম্মাহ, শ্রেষ্ঠ জাতির পুরুষরা কোথায়? তাদের অনেকেই জেলে, অনেককে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, অনেকে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। কে তাদের পরিবারকে রক্ষা করে, সন্তানদেরকে লালনপালন করে এবং জাতি গঠন করে? নারীরাই এর মূল কারিগর। সকল প্রশংসা আল্লাহর, নারীদের মাঝে অল্পকিছু খুঁত ও সমস্যার উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও নারীদের পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াহ আজ অবধি ভালোভাবেই সফল।

আমাদের নারীরা দ্বীন থেকে সরে যাচ্ছে। আমাদের সমাজ যখন নারীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের সীমা আরোপ করে দিয়েছে, শরিআহর দেওয়া অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, তখন থেকেই সংঘাত শুরু। উদাহরণস্বরূপ শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়া, সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা, তাকে নীচু চোখে দেখা এবং তাঁর ওপর সকল জাহিল বিষয়-আশয় চাপিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। আর এসবের সুযোগ নিয়েছে লিবারেল জাহিলিয়াহ। তারা নিরীহ নারীদেরকে ব্যবহার করে স্বার্থ হাসিল

করে নিয়েছে। এসব শয়তানরা নারীদেরকে মিউজিয়ামের শো পিচ কিংবা বাইজির মতো প্রদর্শনীর বস্তুতে পরিণত করে। তাই আমাদের মতো দাঈদের জন্য দুটো চ্যালেঞ্জ সামনে আসে–সামাজিক জাহিলিয়াহ ও লিবারেল জাহিলিয়াহ। দুটো জাহিলিয়াহ থেকেই আমাদের বোনদের বাঁচানো আমাদের দায়িত্ব। ইসলামই সঠিক পথ৷ আমাদের নারীদেরকে আমাদের সর্বোচ্চ সম্মান দিতে হবে, তাদেরকে উৎসাহ জোগাতে হবে, তাদের কাজের মূল্য দিতে হবে, শরিআহর সীমার মধ্যে থেকে তাদের শিক্ষা, কাজকর্মের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, তাঁর সম্পদ ও উত্তরাধিকারের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এভাবেই নারীমুক্তি আসবে। শয়তানের রাস্তাকে রুদ্ধ করে দিতে হবে। সে কেবল বিয়েতে বেশি মোহরানা না, যৌতুক পর্যন্ত এনে দিয়েছে। আমাদেরকে ইসলামের স্লোগান তুলে ধরতে হবে। যৌতুককে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়ে, মোহরানার ক্ষেত্রে কম মোহরানায় উৎসাহিত করতে হবে, “কম মোহরানা, বেশি বারাকাহ”। জিনার প্রসার হচ্ছে, নারী-পুরুষ পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকা সত্ত্বেও সামাজিক এসব বাধার কারণে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না। মোহরানা কমিয়ে এনে আমাদেরকে এসব অনাচারের রাস্তা বন্ধ করতে হবে। ভ্রান্ত সামাজিক কুপ্রথা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। সামাজিক, বংশীয় অবস্থান একই থাকতেই হবে–বিষয়টি সত্য নয়। কুরাইশের মতো সম্ভ্রান্ত বংশের নারী যাইনাব বিনতে যাহাশের সাথে রাসুল * নিজ হাতে আজাদ দাস যায়েদ বিন হারিসের বিয়ে দিয়েছেন। অনেককেই দেখেছি, দরকার হলে মেয়েকে আইবুড়ো করে রাখবে, কিন্তু তারপরও অন্য বংশ, দেশ হলে বিয়ে দেবে না। আর একটু নিচে হলে তো কথাই নেই। এদেরকে শরিআহর ভাষায় বলা হয়েছে, জালিম অভিভাবক। তারা শরিআহর সাথে সাংঘর্ষিক কাজ এবং বোকামির কারণে অভিভাবকত্ব হারায়।

নারীরাই উম্মাহর শক্তি। নারীদের স্বল্পতাই আমাদের পরাজয়। নারীদের প্রতি আমাদের গভীর মনোযোগ দিতে হবে, তাদের খেয়াল রাখতে হবে। আমরা এ পথের পুরুষদেরকে পরাজিত হতে দেখেছি, কিন্তু আমাদের বোনরা কখনো পরাজিত হননি। তাদের মধ্যে আমরা প্রবল ধৈর্য, কঠিন ইখলাস, ঈমান এবং স্থিরতা দেখেছি। ফিলিস্তিনের মা-বোনরা তো আল্লাহর মিরাকল। তাদের অনেকের সংগ্রাম, ধৈর্য, দৃঢ়তা শত মুজাহিদের চেয়েও বেশি। আরব উপদ্বীপেও আমরা এমন অনেক নারী দেখেছি। তারা পুরুষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, জিহাদ ও মুজাহিদদেরকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে অনেক পুরুষকেও তারা লজ্জায় ফেলে দিয়েছেন। সকল প্রশংসা মহামহিম আল্লাহর। পশ্চিমেও অনেক অনারব ভাইয়ের নারীবাদের বাস্তবতা

স্ত্রীদের মাঝে আমরা পাহাড়সম ঈমান দেখেছি। তাদের মতো ঈমান পশ্চিমের বেশিরভাগ ভাইদের মধ্যে দেখিনি। আরব শরণার্থীদের মধ্যে নারীদের ঈমান, ইখলাসের আধিক্য খুবই সাধারণ। বোনরা আমাদের কাছে এসে অভিযোগ করেন যেন আমরা তাদের স্বামীকে আরও বেশি আমল করতে বলি। তারা যে তাদের পরিবারের ঈমান-আমল নিয়ে এত বেশি সচেতন, এটাই তাদের ঈমানের প্রমাণ। তারা আল্লাহর কাছে নিঃসন্দেহে অনেক পুরুষের চেয়েও বেশি সম্মানিত।

পশ্চিমা শয়তানরা পর্দানশীন নারীর অবস্থান ও পর্দা নিয়ে যে পরিমাণ উঠেপড়ে লেগেছে, সেটাই আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয় তারা আসলে কী নিয়ে বেশি ভীত। উম্মাহর নারীদেরকে তারা যদি শেষ করে দিতে পারে, তাহলে উম্মাহ শেষ হয়ে যাবে। ফ্রান্স এত সমস্যা থাকতে হিজাব নিয়েই কেন উঠেপড়ে লাগল, এত অনাচার থাকতে কেন হিজাবই তাদের নিষিদ্ধ করা লাগল তার কারণ সহজেই বোঝা যাচ্ছে। অনেক দেশ করেছে, খুব শীঘ্রই অনেক পশ্চিমা দেশ ফ্রান্সের দেখানো পথেই হাঁটবে। তারা কোটি কোটি ডলার খরচ করে দিনের পর দিন রিসার্চ করে কীভাবে পরিবারপ্রথা ভেঙে দেওয়া যায়, মুসলিম নারীকে ‘উদার' বানিয়ে প্রদর্শনীর বস্তু বানানো যায়, ঈমান কেড়ে নেওয়া যায়। বোঝাই যাচ্ছে, নারী ইসলামের শেষ দুর্গ, শক্তিশালী কেল্লা। এ যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

আমাদের নারীদেরকে শিক্ষিত হতে হবে। শিক্ষাই নারীকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে। অশিক্ষিত নারী নিজেই নিজের শত্রু। সে তাঁর স্বামী, ঘর ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর। আমাদেরকে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। দাঈ, আলিম ও মুমিনদের দায়িত্ব হলো সামাজিক কুপ্রথা থেকে শরিআহর বিষয়গুলোকে আলাদা করে মানুষকে বোঝানো। সামাজিক কুপ্রথাই লিবারেল জাহিলিয়াহর হাতিয়ার। এটা ব্যবহার করেই তারা নারীদেরকে টেনে নিয়ে যায় তাদের মিশমিশে অন্ধকারে।

আমাদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং প্রশংসা আমাদের মুমিনা মা, বোন ও কণ্যাদের জন্য। আমাদের ধৈর্যশীলা স্ত্রীদের জন্য আমাদের অনেক ভালোবাসা, দোয়া এবং কৃতজ্ঞতা। তারা বাদে আমরা কিছুই না, আমাদের সন্তানদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই তাদেরকে ছাড়া, তাদের অগ্রসরমান পদচারণা ছাড়া আমরা পরাজিত।

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যিনি ঈমান এনেছিলেন তিনি হলেন খাদিজা রা.। তিনিই ছিলেন প্রথম মুমিন। ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “যদি দুটি বিষয় এক করে দেখা হয় তাহলে বোঝা যায়, খাদিজা রা. ছিলেন এই কাফিলার প্রথম অভিযাত্রী। তিনি ছিলেন পুরুষদের চেয়েও অগ্রগামী।' তিনি রাসুলুল্লাহ -এর ওপর ঈমান আনা প্রথম মানুষ। খাদিজার রা. কোন গুণটি তাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে? কেন তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চারজন মহিলার একজন? এটি কি তার ক্যারিয়ারের জন্য? নাকি তার ইলমের জন্য? আমাদের বোনদের বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে ভেবে দেখা উচিত।

মারইয়াম আ., আসিয়া আ., ফাতিমা রা.–এ চারজন নারীর মধ্যে আমরা সাধারণ যে বৈশিষ্ট্য দেখি তার মধ্যে প্রথমটি হলো, তারা প্রত্যেকেই দৃঢ় ঈমানের অধিকারী ছিলেন। তাদের আল্লাহর ওপর আস্থা ছিল খুবই শক্তিশালী। আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস ইয়াকিনের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। ইয়াকিন হলো ঈমানের এমন পর্যায় যেখানে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা তাদের ঈমানকে টলাতে পারে। এটি এমন অবস্থা যখন মানুষ যা দেখে বা শোনে তার চেয়েও বেশি সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। বিষয়টি এমন যে আপনি সালাতে আপনার সামনে আল্লাহকে দেখছেন কিন্তু তিনি সেখানে নেই। চারজনই সে পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

আমরা যেকোনো একজনের কথাই বলি। ধরুন আসিয়া রা.। তিনি ছিলেন ফিরআউনের স্ত্রী। একজন নারী চাইতে পারে এমন সবকিছু উনার সামনে ছিল। একজন দুনিয়াদার নারী অনেক সম্পদ, বিলাসী জীবন, ক্ষমতাবান স্বামী, দাস- দাসী চাইতে পারে। এমন সবকিছুই তাঁর ছিল। কিন্তু আসিয়া রা. সবকিছুই আল্লাহর জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাকে এমন একটি প্রাসাদে রেখেছিলেন পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর চেয়ে বিলাসী আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তিনি আল্লাহকে বললেন,

‘আল্লাহ, আমি জান্নাতে তোমার পাশে একটি বাড়ি চাই।”

আল্লাহ তাকে সম্পদ, ক্ষমতাবান স্বামী সব দিয়েছেন। কিন্তু নাহ! তিনি এসবকে পায়ে ঠেলেছেন। বরং তিনি সেই স্বামী থেকেই আশ্রয় চেয়েছেন,

“হে আল্লাহ, আমাকে ফিরআউনের কর্মকাণ্ড থেকে হিফাজত করুন।'

[সুরা আত-তাহরিম : ১১]

তাঁর এমন ত্যাগ ও আল্লাহর প্রতি এমন আস্থাই তার ইয়াকিন প্রকাশ করে। খেয়াল করুন, আসিয়া আ. কিন্তু খুবই খারাপ ও জঘন্য পরিবেশে থাকতেন। তার চারদিকেই ছিল সবাই কাফির ও জালিম। এতকিছু সত্ত্বেও তিনি তাঁর অন্তর আল্লাহর সাথে জুড়ে দিয়েছিলেন। এটিও শক্তিশালী ঈমানের লক্ষণ। অবস্থা যাই হোক, আপনিই বিজয়ী হবেন। আল্লাহ আপনার প্রতি সৎ থাকবেন। বাকিদের ব্যাপারটাও এমন। সুতরাং তাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো তারা ইয়াকিনের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

দুই নম্বর যে বৈশিষ্ট্য আমরা দেখি তা হলো, তারা প্রত্যেকেই একজন ভালো মা ও একজন ভালো স্ত্রী ছিলেন।

নারীবাদী বা নারীবাদী চিন্তা লালনকারী বোনদের হয়তো এ কথাটি ভালো লাগবে না। কিন্তু বাস্তবতা এটাই। তারা কেউই তাদের ক্যারিয়ারের জন্য সমাদৃত ছিলেন না। তাদের মধ্যকার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো তারা ভালো মা ও ভালো স্ত্রী ছিলেন। আসিয়া আ. ও মারিয়াম আ.–দুজনই দুজন রাসুলের অর্থাৎ মুসা আ. ও ঈসার আ. মা ছিলেন। খাদিজা রা. সম্মানিত হয়েছিলেন রাসুলুল্লাহ -কে সাহায্য করে। তিনি তাঁর ব্যবসার জন্য সমাদৃত হননি। বরং এ ব্যবসা তার কোনো কাজে আসেনি। তিনি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর একজন ভালো স্ত্রী ছিলেন। তিনি চরম দুরাবস্থায়ও রাসুলুল্লাহ -কে সাহায্য করে গিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সবসময় খাদিজা রা. কে পাশে পেয়েছেন।

ফাতিমাও রা. ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী স্ত্রী। একটা উদাহরণ দিই। আলী রা. শুনলেন যে রাসুল (সাঃ) বেশ কিছু দাস পেয়েছেন। তিনি ও ফাতিমা রা. মনস্থির করলেন, তারা রাসুলুল্লাহ -এর কাছে যাবেন ও দাস চাইবেন। ফাতিমার রা. খুব কষ্ট হচ্ছিল ঘরের কাজ করতে। তো তারা আয়েশার রা. কাছে তাদের সমস্যা খুলে বললেন। ফাতিমাকে রা. খুব কঠিন পরিশ্রম করতে হতো। পানি তোলা, পেষণ-সহ অনেক কঠিন সব কাজ। পরবর্তী সময়ে আয়েশা রা. রাসুল -কে জানানোর পর তিনি আলি রা.-এর বাসায় যান। আলি রা. হাদিসটি বর্ণনা করছেন। তিনি বললেন, "আমরা যখন ঘুমানোর জন্য বিছানায় গেলাম তখন রাসুল হাজির হলেন। আমরা তাকে দেখে ওঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু রাসুল 'যেখানে আছ সেখানেই থাকো'। তারপর রাসুলুল্লাহ আমাদের মাঝখানে এসে

এসে বললেন, তিনি আমাদের দুজনকেই স্পর্শ করে ছিলেন। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে রাসুল (সাঃ) ফাতিমাকে রা. এতই ভালোবাসতেন যে তিনি বলেছিলেন, 'ফাতিমা আমার অংশ। যা তাকে কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয়। যা তাকে আনন্দ দেয় তা আমাকেও আনন্দ দেয়।' রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর একমাত্র জীবিত সন্তান। তাই রাসুলুল্লাহ যেন সর্বোত্তম জীবন পায়, সবচেয়ে ভালো কিছুই অর্জন করে। রাসুল -এর কাছে দাস ছিল। কিন্তু তিনি কি দিয়েছিলেন? তিনি বললেন, 'আমার কাছে তোমার জন্য দাসের চেয়েও ভালো কিছু আছে। তুমি ঘুমাতে যাওয়ার আগে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার পড়ে নাও।

এটাই তোমার জন্য ভালো।' ফাতিমা রা. পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষটির সবচেয়ে ভালো কন্যা। রাসুল জানতেন হাত খসখসে হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ফাতিমা রা. ঘরের কাজ করতেন। তার হাতের চামড়া মোটা হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও রাসুল বলেছেন, 'যা করছ তাই করতে থাকো।' তাকে দাসের বদলে আমল শিখিয়ে দিলেন।

আলি রা. পরবর্তী সময়ে বলেন, ফাতিমা রা. এত কঠোর পরিশ্রম করতেন যে হাত প্রায় ছিঁড়ে যাওয়ার অবস্থা হওয়া পর্যন্ত তিনি ময়দার চরকা ঘুরাতেন। ঘাড়ে দড়ির দাগ পড়া পর্যন্ত তিনি কুয়া থেকে পানি তুলতেন। পোশাক নোংরা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি ঘর পরিষ্কার করতেন। চেহারায় ধোঁয়ার ছাপ ফেলা পর্যন্ত তিনি রান্না করতেন। ইনিই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির মেয়ে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জানতেন তাঁর কী অবস্থা। বিনিময়ে তিনি কী পেলেন? তিনি হয়ে উঠলেন পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নারীদের একজন। জ্ঞানের মাপকাঠিতে আয়িশা রা. ছিলেন খাদিজা রা. ও ফাতিমা রা. থেকে অনেক ওপরে। কিন্তু তাও তিনি খাদিজা রা. ও ফাতিমার রা. সমকক্ষ হতে পারেননি।

পরিবার পরিকল্পনা প্রজেক্ট: পশ্চিমা ও আধুনিক নারীবাদের সমাজ বিধ্বংসী ষড়যন্ত্র:

এখানে জাতিসংঘ কর্তৃক পরিবার পরিকল্পনা প্রজেক্টের প্রকৃত চেহারা তুলে ধরা হচ্ছে। পূর্বেও বলেছি এবং আমরা এখানেও শুরুতে বলে নিচ্ছি, জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার পেছনে জাতিসংঘসহ পশ্চিমা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যেসব যুক্তি পেশ করে, তার সবগুলোই অবান্তর। জনসংখ্যা থেকে সৃষ্ট হিসেবে যেসব সমস্যাকে তারা সামনে আনছে, সেগুলো আসলে জনসংখ্যা থেকে সৃষ্ট না; বরং এগুলোর সম্পর্ক তাদেরই কৃতকর্মের সাথে। পৃথিবীর সম্পদের ওপর পুঁজিবাদীদের অবৈধ ও কুক্ষিগত নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজে সম্পদের অসম বণ্টনের ফলে জনগোষ্ঠী তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অধিকন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহারের ফলে নারীরা অনেক সময় বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় পড়ছে। এমনকি এগুলো নারীর মানসিক ও যৌন স্বাস্থ্যের ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

জনসংখ্যা কম হলেই যে একটা দেশের মানুষ সুখে থাকবে তা মোটেও সত্য নয়। বর্তমান দুর্ভিক্ষকবলিত এলাকাগুলোর তালিকা করলে সোমালিয়ার নাম প্রথম দিকেই থাকবে। অথচ সোমালিয়ার আয়তন ৬ লাখ ৩৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার, যা বাংলাদেশের ৪ গুণেরও বেশি। আর জনসংখ্যা মাত্র ১ কোটি, যা বাংলাদেশের ১৬ ভাগের ১ ভাগ। তথাপি সোমালিয়া অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশর চেয়ে অনেকটা নিম্নগামী।

আল্লাহ তাআলা এই জগতের কারিগর। তিনি মানুষের সাধারণ জন্মদানক্ষমতার হারেই প্রকৃতিকে প্রস্তুত করে তোলেন। আগের থেকে পৃথিবীর উৎপাদন বেড়েছে, অনাবাদি ও পরিত্যক্ত জায়গা আবাদ হচ্ছে, এমনকি পৃথিবীতে নতুন আবাসস্থলেরও আবিষ্কার হয়েছে। আমেরিকা আবিষ্কারের আগে কে জানত যে, এরকম একটি ভূমি মানুষের বসবাসে ভরপুর হয়ে উঠবে। সুতরাং এই সবকিছুই আল্লাহর পরিচালনাধীন। তিনি বলেন,

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ.

'আমার কাছে প্রতিটি বস্তুর ভান্ডার আছে। আমি এর থেকে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে রিজিক অবতীর্ণ করি।

এজন্য মানুষের জন্ম ঠেকানোর আন্তর্জাতিক আয়োজন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর জগৎ পরিচালনায় হস্তক্ষেপের নামান্তর। আমাদের দায়িত্ব প্রকৃতির সম্পদকে সুষম বণ্টন ও যথাযথভাবে ব্যবহার করা। আল্লামা তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ এই বিষয়ে খুব সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। মনে করুন আপনি একটি ছোট ঘর বানিয়েছেন। ঘরটি এত নিচু যে, আপনি ঘরের ভেতর সোজা হয়ে ঢুকলে আপনার মাথা ঘরের চাল কিংবা ছাদে গিয়ে ঠেকে। এমতাবস্থায় আপনি ঘরের ভেতর সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সুবিধার্থে আপনার পা দুটি কেটে নিজেকে ছোট করে ফেলা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? নাকি ঘরের চালটা আরেকটু উঁচু করতে হবে? কোনো বিবেকবান ব্যক্তিই কিন্তু পা কাটার পক্ষে সায় দেবেন না। তেমনি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রবক্তারাও সীমিত সম্পদের সুষম উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা না করে আল্লাহর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ মানব সন্তানের জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করে সাম্যতার বিধান করতে চায়। এটি কত বড় নির্বুদ্ধিতা ও হাস্যকর বিষয়।

মূলত বিগত শতাব্দীতে পরিবার পরিকল্পনা নামে যেই প্রজেক্ট বিশ্বজুড়ে ছড়িয়েছে, এটির সাথে পরিপূর্ণভাবে পশ্চিমা রাজনীতির উদ্দেশ্যমূলক সম্পর্ক আছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে ১৮শ শতাব্দীতেও টমাস ম্যালথাস জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আওয়াজ তুলেছিল। তবে তার প্রস্তাবনার প্রেক্ষাপটের ধরন আজকের জন্মনিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। বলা যায় ১৯৭৪ সালে হেনরি

কেসিঞ্জার এই প্রকল্পের মাঝে একটি নতুন রূপদান করে এবং বিশ্বব্যাপী একটি পলিসি হিসেবে পরিবার পরিকল্পনাকে ছড়ানোর ব্যবস্থা করে। ১৯৭৪ সালে তার নির্দেশনায় টঝঘঝঈ এর অধীনে একটি পলিসি হিসেবে রিপোর্টটি তৈরি করা হয়। রিপোর্টির নাম হচ্ছে, National security studz memorandum ২০০ (NSSM ২০০)। আমেরিকান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পলিসি হিসেবে রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছে এবং পুরো রিপোর্টে আমেরিকার স্বার্থকেই সামনে রাখা হয়েছে।

এই রিপোর্টে তারা আলোকপাত করেছে, কীভাবে অনুন্নত দেশগুলোর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের জনশক্তিকে দমিয়ে রাখা যায় এবং সেই সুযোগে তাদের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ থেকে কীভাবে আমেরিকার অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা যায়। এবং এই জন্য তারা ইউনাইটেড ন্যাশন,

ইউএসএআইডি, ইউএসআইএ এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। পাশাপাশি সেসব দেশের সরকারকেও এই ব্যাপারে নিজ থেকে উদ্যোগী করে তোলার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে।

জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য দারিদ্রের ভীতি তৈরির পাশাপাশি তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহের বিস্তার, গর্ভপাতকে স্বাভাবিককরণ এবং নারীদের বিয়েকে বিলম্বকরণসহ তাদের শিক্ষাকার্যক্রমকে দীর্ঘায়িত করে কর্মসংস্থানে নিয়ে আসাকে পলিসি হিসেবে গ্রহণ করে। কারণ এতে প্রথমত নারীদের মাঝে নিজ থেকেই পরিবার ও সন্তান গ্রহণের ব্যাপারে অনীহা তৈরি হবে, দ্বিতীয়ত বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের বাচ্চাদান ক্ষমতাও হ্রাস পেতে থাকবে। যদিও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বলে মেয়েদের উপযুক্ত বয়সে বাচ্চা না নেওয়ার একটি মিথ উদ্দেশ্যমূলকভাবে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সত্য হলো, ৩০ বছরের আগ পর্যন্ত সন্তান জন্মদানের সবচেয়ে সফল ও কার্যকর সময় থাকে। ৩০ এর পর মা হওয়ার জটিলতা বাড়তে থাকে। এই সময় থেকে ডিম্বাণুর সংখ্যা ও গুণগতমান হ্রাস পেতে থাকে। অথচ শিক্ষা, ক্যারিয়ারের পেছনে পড়ে বর্তমান সমাজের অধিকাংশ মেয়ে বিয়েই করছে ৩০ এর কাছাকাছি গিয়ে। যার দরুন বর্তমান অধিকাংশ নারীদের বাচ্চাদান ক্ষমতা কমে যাচ্ছে

হারেই প্রকৃতিকে প্রস্তুত করে তোলেন। আগের থেকে পৃথিবীর উৎপাদন বেড়েছে, অনাবাদি ও পরিত্যক্ত জায়গা আবাদ হচ্ছে, এমনকি পৃথিবীতে নতুন আবাসস্থলেরও আবিষ্কার হয়েছে। আমেরিকা আবিষ্কারের আগে কে জানত যে, এরকম একটি ভূমি মানুষের বসবাসে ভরপুর হয়ে উঠবে। সুতরাং এই সবকিছুই আল্লাহর পরিচালনাধীন। তিনি বলেন,

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ.

‘আমার কাছে প্রতিটি বস্তুর ভান্ডার আছে। আমি এর থেকে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে রিজিক অবতীর্ণ করি।

এজন্য মানুষের জন্ম ঠেকানোর আন্তর্জাতিক আয়োজন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর জগৎ পরিচালনায় হস্তক্ষেপের নামান্তর। আমাদের দায়িত্ব প্রকৃতির সম্পদকে সুষম বণ্টন ও যথাযথভাবে ব্যবহার করা। আল্লামা তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ এই বিষয়ে খুব সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। মনে করুন আপনি একটি ছোট ঘর বানিয়েছেন। ঘরটি এত নিচু যে, আপনি ঘরের ভেতর সোজা হয়ে ঢুকলে আপনার মাথা ঘরের চাল কিংবা ছাদে গিয়ে ঠেকে। এমতাবস্থায় আপনি ঘরের ভেতর সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সুবিধার্থে আপনার পা দুটি কেটে নিজেকে ছোট করে ফেলা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? নাকি ঘরের চালটা আরেকটু উঁচু করতে হবে? কোনো বিবেকবান ব্যক্তিই কিন্তু পা কাটার পক্ষে সায় দেবেন না। তেমনি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রবক্তারাও সীমিত সম্পদের সুষম

উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা না করে আল্লাহর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ মানব সন্তানের জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করে সাম্যতার বিধান করতে চায়। এটি কত বড় নির্বুদ্ধিতা ও হাস্যকর বিষয়।

মূলত বিগত শতাব্দীতে পরিবার পরিকল্পনা নামে যেই প্রজেক্ট বিশ্বজুড়ে ছড়িয়েছে, এটির সাথে পরিপূর্ণভাবে পশ্চিমা রাজনীতির উদ্দেশ্যমূলক সম্পর্ক আছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে ১৮'শ শতাব্দীতেও টমাস ম্যালথাস জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আওয়াজ তুলেছিল। তবে তার প্রস্তাবনার প্রেক্ষাপটের ধরন আজকের জন্মনিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। বলা যায় ১৯৭৪ সালে হেনরি

কেসিঞ্জার এই প্রকল্পের মাঝে একটি নতুন রূপদান করে এবং বিশ্বব্যাপী একটি পলিসি হিসেবে পরিবার পরিকল্পনাকে ছড়ানোর ব্যবস্থা করে। ১৯৭৪ সালে তার নির্দেশনায় USNSC এর অধীনে একটি পলিসি হিসেবে রিপোর্টটি তৈরি করা হয়। রিপোর্টির নাম হচ্ছে, National security studz memorandum ২০০ (NSSM ২০০)। আমেরিকান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পলিসি হিসেবে রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছে এবং পুরো রিপোর্টে আমেরিকার স্বার্থকেই সামনে রাখা হয়েছে।

এই রিপোর্টে তারা আলোকপাত করেছে, কীভাবে অনুন্নত দেশগুলোর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের জনশক্তিকে দমিয়ে রাখা যায় এবং সেই সুযোগে তাদের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ থেকে কীভাবে আমেরিকার অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা যায়। এবং এই জন্য তারা ইউনাইটেড ন্যাশন, ইউএসএআইডি, ইউএসআইএ এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। পাশাপাশি সেসব দেশের সরকারকেও এই ব্যাপারে নিজ থেকে উদ্যোগী করে তোলার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে।

জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য দারিদ্রের ভীতি তৈরির পাশাপাশি তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহের বিস্তার, গর্ভপাতকে স্বাভাবিককরণ এবং নারীদের বিয়েকে বিলম্বকরণসহ তাদের শিক্ষাকার্যক্রমকে দীর্ঘায়িত করে কর্মসংস্থানে নিয়ে আসাকে পলিসি হিসেবে গ্রহণ করে। কারণ এতে প্রথমত নারীদের মাঝে নিজ থেকেই পরিবার ও সন্তান গ্রহণের ব্যাপারে অনীহা তৈরি হবে, দ্বিতীয়ত বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের বাচ্চাদান ক্ষমতাও হ্রাস পেতে থাকবে। যদিও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বলে মেয়েদের উপযুক্ত বয়সে বাচ্চা না নেওয়ার একটি মিথ উদ্দেশ্যমূলকভাবে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সত্য হলো, ৩০ বছরের আগ পর্যন্ত সন্তান জন্মদানের সবচেয়ে সফল ও কার্যকর সময় থাকে। ৩০ এর পর মা হওয়ার জটিলতা বাড়তে থাকে। এই সময় থেকে ডিম্বাণুর সংখ্যা ও গুণগতমান হ্রাস পেতে থাকে। অথচ শিক্ষা, ক্যারিয়ারের পেছনে পড়ে বর্তমান সমাজের অধিকাংশ মেয়ে বিয়েই করছে ৩০ এর কাছাকাছি গিয়ে। যার দরুন বর্তমান অধিকাংশ নারীদের বাচ্চাদান ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ১৯৫০ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত মধ্যে একজন

নারীর সন্তান জন্মদানের হার সবচেয়ে বেশি ছিল ১৯৬৮ সালে। এরপর থেকে হার কমতে থাকে। ক্রমাগত এই হ্রাস ২০২১ সালে এসে জনপ্রতি ১.৯৭৯ এসে দাঁড়ায়, যা ২০২০-এ ২.০০৩ এ ছিল।

পাশের দেশ ভারতে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রকল্প একরোখাভাবে মুসলিমদের ওপর দমননীতি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আরএসএস, বজরং ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো দলগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের জিগির তুলেছে। তারা সেটাকে 'পপুলেশন জিহাদ' বলে আখ্যায়িত করছে। এজন্য তারা মুসলিম এলাকাগুলোতে দুই সন্তানের অধিক সন্তান নেওয়া যাবে না মর্মে আইন প্ৰণয়ন করছে। কিন্তু হিন্দুদের বেশি বেশি সন্তান নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। যারা জনসংখ্যা বিস্ফোরণের দোহাই দিয়ে মুসলিম জনসংখ্যাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য তৎপর, সেসব হিন্দুত্ববাদী নেতাদের কারও কারও তিন থেকে পাঁচ এর অধিক সন্তান আছে।

জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ইসলামাইজেশন করার জন্য মুসলিমদের ভেতর একটি দল প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে৷ তাদের কাছে যখন সন্তান হত্যা নিষেধাজ্ঞা-সংবলিত আয়াত পড়া হয়, তখন তারা সন্তান হত্যা ও জন্মনিয়ন্ত্রণের মাঝে পার্থক্য তুলে ধরেন। তারা বলেন, আয়াতে তো সন্তান হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, জন্মনিয়ন্ত্রণ কে নয়। অথচ এটি মারাত্মক ভুল। কুরআনুল কারীমে 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না'-এর ওপর কথা সমাপ্ত করেনি; বরং এই অংশের পরেও আরও কথা আছে। সেটা হলো দরিদ্রতার ভয়ে। এরপর সামনে গিয়ে তিনি এর কারণও উল্লেখ করে দিয়েছেন যে, আমি (আল্লাহ) তাদের রিজিকের ব্যবস্থা করি এবং তোমাদের রিজিকের ব্যবস্থাও করি।

যারা এই আয়াত থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণের নিষেধাজ্ঞা খুঁজে পান না, তাদের অবস্থা

মূলত ওই ব্যক্তিদের মতো, যারা সুরা নিসার ৪৩ নং আয়াত দিয়ে নামাজ থেকে দূরে থাকার কথা বলেন। এই আয়াতের প্রথম অংশে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তোমরা নামাজের কাছে যেয়ো না।' এখন কেউ যদি পরবর্তী অংশ খেয়াল না করে বলে যে, আল্লাহ তাআলা সর্বাবস্থায় নামাজের কাছে না যেতে বলেছেন, তখন কি তার দাবি ঠিক হবে? অথচ আয়াতের পরের অংশেই আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে, অচেতন-মাতাল অবস্থায় যেন আমরা নামাজে না দাঁড়াই।

এ ছাড়াও আযল করার অনুমতি-সংক্রান্ত কিছু হাদিস দিয়ে বর্তমান জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রজেক্টকে তারা বৈধ করতে চায়। অথচ এর বিপরীত হাদিসও আছে। দুই প্রকার হাদিস থেকে ফুকাহায়ে কেরাম বিশ্লেষণ করে যেই গবেষণালব্ধ ফলাফল বের করেছেন, সেটা জন্মনিয়ন্ত্রণ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। যার থেকে স্পষ্ট যে, নির্দিষ্ট ওজর ও সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি জায়েয আছে। তবে সেটাও হতে হবে অসৎ উদ্দেশ্যবিহীন। তাই বলে এই পদ্ধতির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যাপক প্রসার ঘটানো ইসলাম-পরিপন্থি কাজ আর এই পদ্ধতি অবলম্বন করাকে দেশ ও জাতির উন্নতি-অগ্রগতির সোপান আখ্যায়িত করা, যেটাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকারক ও অপছন্দ করেছেন, তা কিছুতেই জায়েয হতে পারে না।

বর্তমান জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রজেক্টকে এককভাবে দেখলে ভুল হবে। এই প্রজেক্টের ভেতর একই সাথে নারীর কর্মজীবী হওয়ার বাসনা, পরিবার ও সন্তান জন্মদানের প্রতি অনাগ্রহ এবং তার বিয়েকে ক্যারিয়ারের পেছনে পড়ে বিলম্বকরণের মতো সমাজ বিধ্বংসী আরও অনেক ফ্যাক্ট জড়িত। মূলত মুসলিম নারীদের নিয়ে

পশ্চিমা বিশ্ব ও আধুনিক প্রাচ্যবাদের যে পরিকল্পনা রয়েছে, সে পরিকল্পনার প্রতিটি অংশ একে অপরের সাথে জড়িত।

আমরা যদি সৃষ্টিগতভাবে নারীদেহের গঠন ও তার ভাবাবেগ ইত্যাদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখব মাতৃত্ব একজন নারীর স্বভাবজাত কামনা- বাসনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার ফিতরাত নষ্ট না হয়ে গেলে কখনো সে এর প্রতি অনাগ্রহী হতে পারে না। তার শরীরের সকল আয়োজন যেন মানব সভ্যতাকে বিকাশপূর্বক টিকিয়ে রাখার জন্য। তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এই মহান দায়িত্বভারের জন্য ব্যাকুল থাকে। আমাদের নারীদের এই ব্যাকুলতাকে গভীর মমতার সাথে অনুভব করতে হবে। বহির্গত কোনো কিছু যেন তার এই ব্যাকুলতাকে নষ্ট করতে না পারে। এই ব্যাকুলতাকে লালনপালন করে পুরো জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না, এই ব্যাকুলতা তার মহান রবের দেওয়া আমানত। এটাকে পবিত্র রাখতে হবে। রবের দেওয়া দায়িত্ব অনুযায়ীই এই ব্যাকুলতাকে কাজে লাগাতে হবে।

নারীবাদের আগ্রাসন থেকে নারী সমাজকে বাঁচাতে করণীয়:

মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুশরিকরা ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে আসছে। আমাদেরকে তাদের মতো কাফের বানানোর জন্য তাদের এই শত্রুতা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। এটি আল্লাহর কুরআনের সুস্পষ্ট বাণী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَنْتَرْضَىٰعَنْكَالْيَهُودُوَلَاالنَّصَارَىٰحَتَّىٰتَتَّبِعَمِلَّتَهُمْقُلْإِنَّهُدَىاللَّهِهُوَالْهُدَىٰوَلَئِنِاتَّبَعْتَأَهْوَاءَهُمْبَعْدَالَّذِيجَاءَكَمِنَالْعِ
لْمِمَالَكَمِنَاللَّهِمِنْوَلِيٍّوَلَانَصِيرٍ.

‘ইহুদি ও নাসারা তোমার প্রতি কিছুতেই খুশি হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। বলে দাও, প্রকৃত হেদায়াত তো আল্লাহরই হেদায়াত। তোমার কাছে (ওহির মাধ্যমে) যে জ্ঞান এসেছে, তারপরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো, তবে আল্লাহর থেকে রক্ষা করার জন্য তোমার কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং সাহায্যকারীও না।’

আমরা যদি আধুনিক ইতিহাসের প্রতি লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাব, কীভাবে পশ্চিমা বিশ্ব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিধি-নিয়মের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। এগুলো কোনো ষড়যন্ত্রতত্ত্ব

নয়; বরং ওপেন সিক্রেট। স্বয়ং পশ্চিমারাও এই বিষয়গুলো অস্বীকার করবে না। মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা নতুন কিছু নয়; বরং পবিত্র কুরআনেও আমরা এর উপস্থিতি দেখতে পাই। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَجَاءَرَجُلٌمِنْأَقْصَىالْمَدِينَةِيَسْعَىقَالَيَامُوسَىإِنَّالْمَلَأَيَأْتَمِرُونَ

بِكَلِيَقْتُلُوكَفَاخْرُجْإِنِّيلَكَمِنَالنَّاصِحِينَ.

‘(তারপরের বৃত্তান্ত এই যে) নগরের বিলকুল দূর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে আসল ও বলল, হে মুসা! নেতৃবর্গ তোমাকে হত্যা করার জন্য পরামর্শ করছে। সুতরাং তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। বিশ্বাস করো, আমি তোমার কল্যাণকামীদের একজন,।

কিন্তু বর্তমান সময়ে সেকুলার, লিবারেল ও মডার্নিস্টদের অনেকে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে উপহাসের অবস্থান গ্রহণ করেছে। তারা এই বলে তিরস্কার করে যে, মুসলিমরা সবকিছুতেই ষড়যন্ত্র খোঁজে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কিছু লোক ষড়যন্ত্র নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করে। কিন্তু ষড়যন্ত্রের বিষয়টিকে একেবারেই নাকচ করে দেওয়া বাস্তবতাকে অস্বীকার করা ছাড়া কিছুই না। যারা ষড়যন্ত্রকে অস্বীকার করে, দেখা যাবে তাদের অধিকাংশই হয়তো পশ্চিমাদের এজেন্ট ও তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী কিংবা তারা পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি মুগ্ধ ও অনুরাগী। ব্যতিক্রম কিছু ছাড়া সবাইকে আপনি এই ক্যাটাগরিতে খুঁজে পাবেন।

ষড়যন্ত্রতত্ত্ব নিয়ে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ বক্তব্য হলো, সাধারণভাবে ষড়যন্ত্রকে অস্বীকার করা ষড়যন্ত্রের অংশ। আর ষড়যন্ত্র নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হলো ষড়যন্ত্রে সহায়তা করা। এজন্য যারা ষড়যন্ত্রতত্ত্ব দিয়ে মুসলিমদের নিয়ে উপহাস করে তাদের অধিকাংশ নিজেরাই এই ষড়যন্ত্রের অংশ (জেনে কিংবা না জেনে, বুঝে কিংবা না বুঝে)। আর র‍্যান্ড কর্পোরেশনের রিপোর্টগুলো থেকে এই বাস্তবতা আরও সুস্পষ্ট হয়ে যায় আমাদের সামনে

আর যারা ষড়যন্ত্র নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে শত্রুদের ব্যাপারে মুমিনদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করে এবং সেই ষড়যন্ত্রগুলো অজেয় ও অধরা বানিয়ে মুসলিমদের সামনে উপস্থাপন করে, তারা হলো ষড়যন্ত্রের সহায়তাকারী (বুঝে কিংবা না বুঝে)।

আমরা বিশ্বাস করি কাফেররা প্রতিনিয়ত আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে যাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ হলেন সেসব চক্রান্তের উত্তম প্রত্যুত্তরদাতা। ফলে তাদের ষড়যন্ত্র মাকড়সার জালের মতো দুর্বল। আমাদের দায়িত্ব হলো, সচেতনতার সাথে সেগুলোর মোকাবিলা করে যাওয়া। আল্লাহ তাআলাই তাদের সকল পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেবেন।

সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এখানে মুসলিম-সমাজ, বিশেষত মুসলিম নারীদের জন্য করণীয় কিছু বিষয় তুলে ধরব :

১. বিকৃত নারীবাদী আন্দোলন ও ইসলামি শরিয়াহবিরোধী নারী-অধিকারের দাবি উত্তোলনকারী প্রত্যেক প্রচেষ্টা, স্লোগান ও সংস্থার বিরুদ্ধে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করা।

২. কর্মের প্রতি মুখাপেক্ষী নারীদের জন্য শরিয়াহবান্ধব পরিবেশ ও সেক্টরের ব্যবস্থা এবং তার দাবিকে জোরদার করা। পাশাপাশি এমন বোনদের বৈধ সেক্টরগুলোর প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং ইসলামি শরিয়াহ কর্তৃক নিষিদ্ধ সেক্টরগুলো থেকে বিমুখ করে তোলা।

৩. নারী সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে অনলাইন ও অফলাইনভিত্তিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা এবং এই ক্ষেত্রে দুটি পর্যায়ে কাজ করা। প্রথমত, ইসলামি শরিয়াহর প্রতি নারীর সম্মান ও গর্বকে ইতিবাচকভাবে বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয়ত, নারীবিষয়ক সেকুলার, লিবারেল ও ফেমিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর অসারতা ও ভ্রান্তিকে সুস্পষ্ট করা।

৪. মুসলিম নারীদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু বোনদের তৎপর হওয়া উচিত, যারা আদর্শ ও ইলমি যোগ্যতায় উত্তীর্ণ। এ সমস্ত বোন মুসলিম তরুণীদের সামনে ইসলামি শরিয়াহর বিধানগুলো আপসহীনভাবে হৃদয়ঙ্গম করে বোনদের তুলে ধরবেন। তারা প্রভাব বিস্তারকারী হবেন, প্রভাবিত হবেন না। তাদের বক্তব্য হবে সুস্পষ্ট, যেখানে থাকবে না পশ্চিমা সংস্কৃতির কাছে নতি স্বীকার। এর জন্য তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন প্লাটফর্ম ব্যবহার করবেন। নারীদের জন্য বিশেষ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে তার আওতায় নারী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স ও কর্মশালার আয়োজন করবেন।

৫. বিদ্যমান সমাজে নারীরা যেসব অন্যায় ও জুলুমমূলক আচরণের শিকার হয়, তার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং ইসলামি শরিয়াহর বিরুদ্ধে না গিয়ে বরং ইসলামি শরিয়াহর আলোকেই তার সমাধান বাস্তবসম্মতভাবে পেশ করা। বিশেষত নির্দিষ্টভাবে যেসব নারী এমন পরিস্থিতির শিকার, কল্যাণ ও সংশোধনের মানসিকতা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের প্রতি হওয়া জুলুমকে নির্মূল করে তাদের জন্য ইনসাফ নিশ্চিত করা।

৬. নারীদের অন্তরে ওয়ালা-বারার আকিদাকে গেঁথে দেওয়া।

৭. দলবদ্ধভাবে কিংবা সংস্থারূপে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর ইসলামবিরোধী স্বার্থসমূহের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং মুসলিম বিশ্বের ভেতরগত বিষয়ে সেসব সংস্থার অনুপ্রবেশকে না বলা ।

৮. মুসলিম তরুণীদের হায়া, তহারাত ও পর্দার ওপর প্রতিপালন করা। নারীত্ব ও মাতৃত্ব বিষয়ে ইলমি ও তরবিয়তি তৎপরতা বৃদ্ধি করা, যার মাধ্যমে নারীত্ব ও মাতৃত্বে তার ইবাদাত ও

স্বভাবজাত দিকগুলো ফুটে উঠবে। বিশেষত মুসলিম নারীদের মাঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা ও আনুগত্যকে গভীর করে তোলা।

৯. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নারী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

১০. মুসলিম নারীদের জন্য জরুরি হলো, উপনিবেশবাদী ও প্রাচ্যবাদী সংস্থাগুলো তাদের ওয়েস্টার্নাইজেশন তথা পশ্চিমায়নের জন্য যত চক্রান্ত আবিষ্কার করেছে, সেগুলো ভালোভাবে চিনে নেওয়া এবং তাদের এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে না দেওয়া।

১১. জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর যেই অসৎ উদ্দেশ্য সেটাকে অনুধাবন করা। মুসলিম উম্মাহর জনশক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের হুমকি- ধমকিতে প্রতারিত না হয়ে, বরং আল্লাহর রাসূলের গর্বের ব্যবস্থা করা। নিজের সন্তানদের সৎ ও সাহসী মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং সেজন্য বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা।

১২. নারীবাদী আন্দোলনগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে জানা এবং এগুলোর ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে তোলা।

১৩. নারীদের নিয়ে প্রাচ্যবাদী গবেষণাসমূহের বিরুদ্ধে মুসলিমদের গবেষণা পর্যালোচনা তৈরি করা এবং সেগুলো মুসলিম নারীদের ভেতর ছড়িয়ে দেওয়া।

১৪. মুসলিম দেশগুলোতে কেবল নারীদের জন্য বিভিন্ন সংঘ, ইন্সটিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। যারা মুসলিম নারীদের পশ্চিমায়নের হাত থেকে বাঁচাতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও ইলমি প্রাচীর তৈরি করবে। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে প্রভাবিত মুসলিম বোনদের নীড়ে ফেরানোর জন্য পলিসি প্রস্তুত করবে এবং আধুনিক নারীবাদী সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে নারীদের ভেতর জাগরণ সৃষ্টি করবে।

১৫. প্রত্যেক নারীকে তার সামাজিক দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে তোলা। যাতে সে পরিবার গঠনে এবং পরিবারের ও সন্তানদের লালনপালনে উত্তম অবদান রাখতে পারে। পাশাপাশি তাদের সমাজের নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের কাজের যোগ্য করে তুলতে হবে। কেননা আমাদের পরিবারগুলোকে, মায়েদের ও নারীদের তাদের প্রকৃত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পন্থা শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আর এই মহান সংস্কারমূলক কাজে পুরুষদের চেয়ে নারীরাই অধিকতর উপযোগী ও সক্ষম।

১৬. বিশেষভাবে সমাজের পুরুষদের একটি দায়িত্ব হলো, নারীর পারিবারিক মর্যাদা নিশ্চিত করা। নারীকে পশ্চিমা ভোগবাদী দর্শনের মতো নিছক উৎপাদক যন্ত্র হিসেবে না দেখা। বর্তমান সময়ে নারীদের পরিবার থেকে বের করার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি হলো, পরিবারে তার অবদান খাটো করা।

অর্থনৈতিকভাবে কিংবা উপার্জনের দিক থেকে তার অবদানকে মূল্যায়ন না করা। পুরুষদের এই জঘন্য মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নারীর অর্থনৈতিক দায়িত্ব নেওয়া পুরুষকর্তৃক নারীর ওপর কোনো প্রকার অনুগ্রহ নয়; বরং এটা তার আবশ্যিক দায়িত্ব। যা আল্লাহ তাআলা তার ওপর ধার্য করেছেন।

বড় দুঃখজনক ব্যাপার হলো, প্রকৃতি নারীকে সর্বাধিক মূল্যবান যে জিনিসটি দিয়েছে সেটাই সে হারাতে বসেছে। সে জিনিসটি হচ্ছে তার নারীত্ব। এটা হারিয়ে সে সমস্ত সুখ-শান্তিও হারাচ্ছে। পরিবার হচ্ছে নারী-পুরুষ উভয়ের স্বাভাবিক সুখের নীড়। মাতা ও গৃহিণীর তদারকি ছাড়া এই সুখের নীড় টিকে থাকতে পারে না। পরিবারই সমাজের ও ব্যক্তির সুখের উৎস। পরিবারই কল্যাণ, মেধা ও প্রজ্ঞার সুতিকাগার।

আমাদের দুটো দর্শনের মধ্য থেকে যেকোনো একটাকে বেছে নিতে হবে। একদিকে রয়েছে ইসলামের দর্শন, যা নারীর মর্যাদা ও সম্ভ্রমের উৎকৃষ্টতম রক্ষক, এবং যা তাকে স্ত্রী ও মা হিসেবে তার সামাজিক দায়িত্ব একাগ্রভাবে পালন করার সুযোগ দেয়। আর এরই বিনিময়ে সমাজকে তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে ও তার সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে বাধ্য করে। এজন্য ইসলাম স্বামীর ওপর কিংবা স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনের ওপর স্ত্রীর ও তার সন্তানদের ভরণপোষণের ভার অর্পণ করে। এতে নারীর অবমাননা কিংবা অবমূল্যায়নের প্রশ্নই ওঠে না। কেননা নারী সেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্বটা পালন করে, যা মানব জাতির সুখ- শান্তি ও উন্নয়নের একমাত্র রক্ষাকবচ।

অন্যদিকে আছে পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুবাদী ও ভোগবাদী দর্শন। এই দর্শন নারীর জৈবিক দাবির ব্যাপারে তার ওপর কঠোর নিষ্পেষণ, নিপীড়ন চালায়। স্ত্রী ও মা হিসেবে তার স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তার নিজের জীবিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে কঠোর পরিশ্রমে তাকে বাধ্য করে। তার নারীত্ব নষ্ট করে তাকে পণ্য কিংবা যন্ত্রে রূপান্তর করে। এভাবে নারী নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার সন্তানরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সামগ্রিকভাবে সমাজে পারিবারিক জীবনের স্থিতিশীলতা, সংহতি ও বন্ধন নিদারুণভাবে ব্যাহত হয়।

আমরা যারা মুসলিম, তাদের পক্ষে তো ইসলাম ও তার জীবন বিধানের চেয়ে অন্য কিছুকে অধিকতর কল্যাণকর মনে করা সম্ভবই না। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “ওরা কি তবে জাহিলিয়াতের বিধিবিধান চায়? মুমিনদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে হতে পারে!

শত্রুরা আমাদের ওপর যেই কৌশল বারবার অবলম্বন করে সফল হতে চাচ্ছে, আমাদের উচিত নয় তার মাধ্যমে প্রতারিত হওয়া। যেমনটা আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মুমিন কখনো একই ফাঁদে দ্বিতীয়বার ধোঁকা খেতে পারে না। এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘এই হাদিসে উদাসীন না থাকা এবং নিজেদের মেধা ব্যবহার করার নির্দেশনা আছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

هُوَالَّذِىٓأَخْرَجَالَّذِينَكَفَرُوامِنْأَهْلِالْكِتَابِمِنْدِيَارِهِمْلِأَوَّلِالْحَشْرِمَاظَنَنْتُمْأَنْيَخْرُجُواوَظَنُّواأَنَّهُمْمَانِعَتُهُمْحُصُ
ونُهُمْمِنَاللهِفَأَتَاهُمُمِنْحَيْثُلَمْيَحْتَسِبُواوَقَذَفَفِيقُلُوبِهِمُالرُّعْبَيُخْرِبُونَبُيُوتَهُمْاللهِبِأَيْدِيهِمْوَأَيْدِىالْمُؤْمِنِينَفَاعْتَبِرُ
واياأُولِىالْأَبْصَارِ.

‘আর তিনিই কিতাবিদের মধ্যে যারা কাফের, তাদের প্রথম সমাবেশেই তাদের ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছেন। (হে মুসলিমগণ!) তোমরা কল্পনাও করোনি তারা বের হয়ে যাবে। তারাও মনে করেছিল, তাদের দুর্গগুলো তাদের আল্লাহ হতে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ তাদের কাছে এমন দিক থেকে আসলেন, যা তারা ধারণাও করতে পারেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতিসঞ্চার করলেন। ফলে তারা নিজেদের হাতে নিজেদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে ফেলেছিল এবং মুসলিমদের হাতেও। সুতরাং হে চক্ষুষ্মানেরা, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো!

বর্তমানে মুসলিমরা যেসব আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে, তার সবগুলোর সূত্র আমরা আধুনিক ইতিহাসের সূচনালগ্নেই খুঁজে পাব। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেসব আগ্রাসন আজও বহাল আছে। বদলেছে ভাষা, পাল্টিয়েছে নাম। আগে যেটা হতো প্রাচ্যবিদের নামে, এখন সেটা চলছে গবেষকের নামে। এখন উপনিবেশের নাম হয়েছে ওয়ার অন টেরর। আমরা যদি তাদের কর্মকৌশলগুলোর বাস্তবতা বুঝতে পারি, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের আগ্রাসনকে আমরা খুব সহজেই প্রতিরোধ করতে পারব। এজন্য এসব বিষয়ে আমাদের দায়ীদের মাঝে যথেষ্ট সচেতনতা তৈরি করতে হবে এবং তাদের সমস্ত প্রকার আগ্রাসন নিয়ে নিজেদের মধ্যে গবেষণা চালু রাখতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম উম্মাহর মাঝে আমরা সচেতনার এক জোয়ার দেখতে পাচ্ছি। এই জোয়ারকে আরও বেগবান ও মজবুত করতে হবে। যেন উম্মাহ বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সর্বপ্রকার বহিরাগত আগ্রাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে দীনের ছায়ায় জীবনযাপন করতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদের মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর দাসত্বে জীবন পরিচালনার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقُللِلْمُؤْمِنَاتِيَغْضُضْنَمِنْأَبْصَارِهِنَّوَيَحْفَظْنَفُروجَهُنَّوَلَايُبْدِينَزِينَتَهُنَّإِلَّامَاظَهَرَمِنْهَاوَلْيَضْرِبْنَبِخُمُرِهِنَّعَلَى
جُيُوبِهِنَّوَلَايُبْدِينَزِينَتَهُنَّإِلَّالِبُعُولَتِهِنَّأَوْآبَائِهِنَّأَوْآبَاءِبُعُولَتِهِنَّأَوْأَبْنَائِهِنَّأَوْأَبْنَاءِبُعُولَتِهِنَّأَوْإِخْوَانِهِنَّأَوْبَنِىإِخْوَانِ
هِنَّأَوْبَنِىأَخَوَاتِهِنَّأَوْنِسَائِهِنَّأَوْمَامَلَكَتْأَيْمَانُهُنَّأَوِالتَّابِعِينَغَيْرِأُولِىالْإِرْبَةِمِنَالرِّجَالِأَوِالطِّفْلِالَّذِينَلَمْيَظْهَرُواعَلَ
ىعَوْرَاتِالنِّسَاءِوَلَايَضْرِبْنَبِأَرْجُلِهِنَّلِيُعْلَمَمَايُخْفِينَ

مِنْزِينَتِهِنَّوَتُوبُواإِلَىاللهِجَمِيعًاأَيُّهَالْمُؤْمِنُونَلَعَلَّكُمْتُفْلِحُونَ.

‘মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল নিজ বক্ষদেশে নামিয়ে দেয় এবং নিজেদের ভূষণ যেন স্বামী, পিতা,

শ্বশুর, পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগিনা, আপন নারীগণ, যারা নিজ মালিকানাধীন যৌনকামনা জাগে না এমন---

ইমাম আবু হাইয়্যান আল আন্দালুসি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'স্পেনের মুসলিম নারীদের রীতি ছিল তারা এক চোখ ছাড়া পুরো শরীর ঢেকে রাখত।

ইমাম মাওযিয়ি আশ শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আগে পরে সব যুগে, সব দেশে এটাই ছিল মুসলিমদের আমল। তারা বৃদ্ধাদের মুখ খুলতে দিতেন এবং তরুণীদের মুখ খোলার অনুমতি দিতেন না; বরং এটাকে খারাপ কাজ মনে করতেন।

সালাফদের কিতাবে এমন অসংখ্য বক্তব্য ও ঘটনা আছে, যা থেকে এটা স্পষ্ট যে, নববি যুগ থেকে আধুনিক ইতিহাস পর্যন্ত মুখ ঢাকার ওপরই মুসলিম নারীদের আমল ছিল। প্রজন্ম পরম্পরায় মুসলিম উম্মাহর এই আমল থেকে স্পষ্ট যে, উম্মাহর ফকিহরা এই মাসআলায় কোন মতের ওপর উম্মাহকে নির্দেশনা দিয়েছেন এবং কোন মতকে তারা সমাজে বাস্তবায়িত রেখেছেন। তারা উম্মতকে সেই মতের ওপরই আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেই মত উম্মাহর পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষা করবে। তবে এই বিষয়টিও স্বীকৃত যে, চার মাজহাবের পরবর্তী ইমামরা আধুনিক যুগে মুখ ঢাকাকে ওয়াজিব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অল্প কিছু আলেম ব্যতিক্রম মত দিয়েছেন।

নববি যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত গাইরে মাহরামদের সামনে মুখ খোলা কখনোই মুসলিম নারীদের সংস্কৃতি ছিল না। মুখ খোলার ব্যাপারে দায়িত্বশীল পুরুষ ও মুখ আবৃতকারী নারীর মাঝে এতটাই আত্মমর্যাদাবোধ ছিল যে, তারা এটার কল্পনাই করতে পারত না। এই ব্যাপারে ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ খুব সুন্দর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ২৮৬ হিজরিতে কাজি মুসা ইবনে ইসহাকের দরবারে একজন নারী তার অভিভাবকসহ একটা মুকাদ্দামা নিয়ে আসল। তিনি মুকাদ্দামা পেশ করতে বললে নারীর পিতা বলল, তার মেয়ে স্বামীর কাছ থেকে মহর বাবদ ৫০০ দিনার পায়। স্বামী তা অস্বীকার করল। এরপর কাজি নারীপক্ষকে বলল, তোমাদের সাক্ষী আছে? মেয়ের অভিভাবক বলল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী নিয়ে এসেছি। তখন কোনো এক সাক্ষী মেয়েটাকে দেখতে

চাইল, যেন সে নিজের সাক্ষীর ব্যাপারে পরিষ্কার হতে পারে। এরপর ওই সাক্ষী মেয়েটাকে দাঁড়াতে বলল। তখন তার স্বামী দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, তোমরা এসব কী করছ? তখন উকিল বলল, তারা তোমার স্ত্রীকে মুখ খোলা অবস্থায় দেখতে চায়, যেন তারা তাকে চিনতে পারে। স্বামী বলল, আমি কাজি সাহেবকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমার স্ত্রী যেই মহর আমার ওপর দাবি করেছে, সে আমার থেকে তা প্রাপ্য। তার চেহারা খোলার কোনো প্রয়োজন নেই। স্বামীর এই গায়রতপূর্ণ আচরণ দেখে স্ত্রী বলে উঠল, আমিও কাজি সাহেবকে সাক্ষী রেখে বলছি, এই মহর

আমি তাকে হাদিয়া দিয়ে দিলাম এবং দুনিয়া ও আখেরাতে এর দায় থেকে তাকে মুক্ত করে দিলাম।

মূলত প্রজন্ম পরম্পরায় সতরের প্রতি এটাই ছিল মুসলিম উম্মাহর গাইরাত। মুখ খোলার প্রশ্ন কিংবা মুসলিম নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন ও ফ্রি-মিক্সিংয়ের যে সংস্কৃতি, এটা শুরুই হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম দেশগুলোতে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে। মুসলিম দেশগুলোতে উপনিবেশ আমলের শুরু পর্যায়ের প্রামাণ্যচিত্রগুলোও আমরা যদি ঘেটে দেখি, তখন আমাদের সামনে বিভিন্ন দেশের মুসলিম নারীদের আপাদমস্তক আবৃত চিত্রই নজরে আসবে। রাস্তাঘাট, বাজার সর্বত্র মুসলিম নারীদের আমরা এই পোশাকেই দেখতে পাব।

আমরা যদি মাকাসিদে শরিয়াহর আলোকে মুখ খোলা রাখা প্রসঙ্গটির দিকে দৃষ্টি দিই, তাহলে দেখব বর্তমানে মুখ খোলা রাখা নিশ্চিতভাবে মাকাসিদে শরিয়ায় উত্তীর্ণ হয় না। ইসলামি শরিয়ায় পর্দার বিধানের উদ্দেশ্য হলো, নারীর সৌন্দর্যকে গাইরে মাহরাম পুরুষ থেকে আবৃত রাখা। যেন নারীর প্রতি পুরুষের স্বভাবজাত যেই আকর্ষণ সেটা নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং কোনো অঘটন না ঘটে। আর একজন নারীকে পছন্দ হওয়া কিংবা তার প্রতি প্রাথমিক আকর্ষণ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে তার চেহারার দর্শনই প্রধান ভূমিকা রাখে। চেহারা ঢেকে রাখাই মাকাসিদে শরিয়াহর দাবি।

এখানে আরেকটা বিষয় হলো, আমরা যারা ইখতিলাফের দোহাই দিয়ে চেহারা খুলে রাখার সুবিধা গ্রহণ করতে চাই, তাদের অধিকাংশই আসলে এই মতটা এই জন্য গ্রহণ করছেন না যে, মতটা শরিয়াহর সার্বিক দলিলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত; বরং নিজের অবস্থান কিংবা প্রবৃত্তিকে বহাল রাখার জন্য এই সুবিধাটা গ্রহণ করা হচ্ছে। আবার যারা মুখ খোলা রাখার মত বর্ণনা করেন, তাদের অনেকেই অত্যন্ত সাধারণভাবে বিষয়টাকে উপস্থাপন করেন। খোলা রাখার মত গ্রহণ করলেও যে এখানে অনেক শর্ত ও নীতিমালা আছে, সেটা তাদের বক্তব্যে উঠে আসে না। যেমন : চুল ও কান সতরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। কিন্তু অনেক নারী মুখ খোলা রাখতে গিয়ে মাথার উপরিভাগের চুলকেও প্রকাশ করেন, আবার কানকেও খোলা রাখেন। যা সবার ঐকমত্যে হারাম। আবার যেই মতে মুখমণ্ডলকে স্বভাবতই প্রকাশিত থাকা হিসেবে মুখ খোলা রাখা বৈধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানেও যদি কোনো প্রকার কৃত্রিম সৌন্দর্য, মেকাপ বা অন্য যেকোনো প্রকার সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়, তাহলে তা প্রকাশ করা হারাম হয়ে যাবে। কারণ তাদের মতে তখন সেটা আর স্বাভাবিক সৌন্দর্য থাকবে না। এজন্য তাদের মতে অনুমোদিত অংশগুলোও কোনো প্রকার সাজসজ্জা ছাড়া প্রকাশ করতে হবে।

বর্তমানে যারা মাথা ঢেকে মুখ খুলে বের হয়, তাদের কেউই সৌন্দর্যবর্ধনকারী জিনিস ব্যবহার করা ছাড়া বের হয় বলে মনে হয় না। যদিও এরকম কাউকে পাওয়া যায়, তবে সেটা একদমই বিরল ঘটনা। সুতরাং জমহুর উলামায়ে কেরামের মতই নিরাপদ ও বাস্তবতার আলোকে উত্তীর্ণ। কিছু আলেমদের যেই মত, সেই মত অনুযায়ীও মুখ খোলা রাখা অবস্থায় সতরের শরয়ি বিধান পালিত হচ্ছে না।

এখানে আমরা উভয় পক্ষের দলিলসমূহ এনে পর্যালোচনা করে আলোচনা দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না। এর উপযুক্ত স্থানও এটি নয়। তবে আমরা সংশ্লিষ্ট মাসআলায়

উত্তম সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য মৌলিক কিছু বিষয় তুলে ধরলাম। নিষ্ঠার সাথে আমরা যদি বিবেচনা করি, তাহলে আমাদের সামনে মুখ ঢাকার মতটিকেই বিশুদ্ধ ও উম্মাহর জন্য কল্যাণকর মনে হবে। মাকাসিদে শরিয়াহ, উম্মাহর সুদীর্ঘকালের আমল ও বর্তমান সমাজের অবস্থা সর্বদিক বিবেচনায় মুখ ঢাকাই ইসলামি শরিয়াহর প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত এবং উসুলে ফিকহের দৃষ্টিতে মুখ ঢাকা ওয়াজিবের পর্যায়ভুক্ত। বৃদ্ধ নারী, যাদের দেখে আকর্ষিত হওয়ার সুযোগ নেই, তাদের জন্য কিংবা একান্ত প্রয়োজনের সময় মুখ খোলা রাখার মতের ওপর আমল করা যেতে পারে।

বর্তমানে মডার্নিস্ট কিছু মুসলিমের পক্ষ থেকে একটি অবান্তর দাবি করা হয়। সেটা হলো, নিকাব বা হিজাবের বিধান কেবল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের জন্য বিশেষ বিধান। বাকি মুসলিম মেয়েরা এই বিধানের আওতাভুক্ত নয়। মূলত এই ধরনের আপত্তি সাহাবীদের যুগ থেকে নিয়ে উপনিবেশ আমলের আগ পর্যন্ত মুসলিম-সমাজে প্রচলিত ছিল না। উপনিবেশের আমলে পশ্চিমা সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু মুসলিম মুসলিম-সমাজের ভেতর এই আপত্তি ছড়ানোর চেষ্টা করেছে। এর মধ্যে কাসিম আমিনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য; বইয়ের ভূমিকাতে যার আলোচনা আমরা করে এসেছি। কাসিম আমিন তার লিখিত 'তাহরিরুল মারআহ' গ্রন্থে এই দাবি করে মুসলিম নারীদের পশ্চিমা নারীদের মতো সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে।

তখনকার সময়ের বিখ্যাত আলেমে দীন, উসমানি খিলাফার একজন বিচারক শাইখুল ইসলাম মুস্তফা আস সবারি তার বিশ্ববিখ্যাত কিতাব 'মাওকিফুল আকলি ওয়াল ইলমি ওয়াল আলামি' এর ভেতর কাসিম আমিনের এই দাবির খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন, 'কাসিম আমিন তার বইয়ে মুসলিম নারীদের হিজাব ও পুরুষদের থেকে তাদের দূরে থাকার যে বিধান, তার ওপর নগ্ন আক্রমণ চালিয়েছে। সে পশ্চিমা নারীদের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শনের পক্ষে প্রতিরোধকারী হিসেবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেছে।'

তার মতে মুসলিম-সমাজে প্রচলিত যে হিজাব, সেটা উম্মাহাতুল মুমিনিনের সাথেই খাস। তার এই দাবির পক্ষে সে সুরা আহযাবের ৩২ এবং ৫৩ নং আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করে। তার যুক্তি হলো, এই আয়াতে যে সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে, তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে। এজন্য আয়াতে উল্লিখিত বিধিনিষেধ বিশেষভাবে তাদের জন্যই আরোপ হবে, অন্য কোনো মহিলার জন্য নয়।

আমরা বলব, সুরা আহযাবের ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "হে নবিপত্নীরা, তোমরা অন্যান্য মহিলাদের মতো নও।' এখানে তাদের বিশেষত্ব আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে নায়; বরং এই বিশেষত্বের সম্পর্ক তাদের পূণ্য ও পাপের বদলার সাথে। যা আল্লাহ তাআলা সুরা আহযাবের ৩০ এবং ৩১ নং আয়াতে বলেছেন। ৩২ নং আয়াতের পর যেসব বিধিনিষেধ এসেছে,

এর সাথে ৩২ নং আয়াতের প্রথম অংশের কোনো বিশেষত্ব নেই। আর সেই বিধিনিষেধগুলো হলো :

“হে নবি পত্নীগণ! তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও, যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো। সুতরাং তোমরা কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, পাছে অন্তরে ব্যাধি আছে এমন ব্যক্তি লালায়িত হয়ে পড়ে। বরং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলো।

নিজ গৃহে অবস্থান করো, (পর-পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না, যেমন প্রাচীন জাহেলি যুগে প্রদর্শন করা হতো। নামাজ কায়েম করো, জাকাত আদায় করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো। হে নবি পরিবার (আহলে বাইত)! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে মলিনতা দূরে রাখতে এবং তোমাদেরকে এমন পবিত্রতা দান করতে, যা সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ হবে।'

যদি এই আয়াতের বিধানগুলো উম্মাহাতুল মুমিনিনের সাথে খাস হয়, তাহলে কি মুসলিম নারীদের পুরুষদের আকর্ষণ করার জন্য নম্র স্বরে কথা বলা, সৎ কথা না বলা, ঘরে অবস্থান না করা, জাহিলিয়াতের মতো নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করা, সালাত না পড়া, জাকাত না দেওয়া, এমনকি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য না করা–এ সবকিছু বৈধ হয়ে যাবে?

তারপর ৫৩ আয়াতে বলা হয়েছে।

وَإِذَاسَأَلْتُمُوهُنَّمَتَاعًافَاسْأَلُوهُنَّمِنْوَرَاءِحِجَابٍذَٰلِكُمْأَطْهَرُلِقُلُوبِكُمْ

‘নবির স্ত্রীগণের কাছে তোমাদের কিছু চাওয়ার থাকলে পর্দার আড়াল থেকে চাবে। এ পন্থা তোমাদের অন্তর ও তাদের অন্তর অধিকতর পবিত্র রাখার পক্ষে সহায়ক হবে।'

রাসুলের স্ত্রী, যারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ নারী এবং রাসুলের সাথিবর্গ, যারা উম্মাহর শ্রেষ্ঠ অংশ হওয়া সত্ত্বেও অন্তরের পবিত্রতা কি কেবল তাদেরই প্রয়োজন, আর বাকি মুসলিম নারী-পুরুষের অন্তরের পবিত্রতার প্রয়োজন নেই?

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, সুরা আহযাবে হিজাবের যেই বিধান, সেটা উম্মাহাতুল মুমিনিনের জন্য বিশেষ বিধান নয়; বরং সমস্ত মুসলিম নারীদের জন্যই এই বিধান প্রযোজ্য। কিন্তু কাসিম আমিন নিজের প্রবৃত্তিকে প্রচারের জন্য আকল ও বুঝ-শক্তির ভুল ব্যবহার করেছে এবং আল্লাহর কালামে বিকৃতি সাধন করেছে।

সুরা আহযাবেই আরেকটি আয়াত আছে, যেটি কাসিম আমিনের দাবিকে খণ্ডন করে দেয়। সেই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিজাব সকল মুসলিম নারীর জন্য আবশ্যক। নবিপত্নী ও অন্যান্য নারীর মাঝে এই বিধান প্রযোজ্য হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاأَيُّهَاالنَّبِيُّقُلْلِأَزْوَاجِكَوَبَنَاتِكَوَنِسَاءِالْمُؤْمِنِينَيُدْنِينَعَلَيْهِنَّمِنْجَلَابِيبِهِنَّذَلِكَأَدْنَىأَنْيُعْرَفْنَفَلَايُؤْذَيْنَوَكَانَاللَّهُغَفُورًا رَحِيمًا.

‘হে নবি! তুমি তোমার স্ত্রীদের, তোমার কন্যাদের ও মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের (মুখের) ওপর নামিয়ে দেয়। এ পন্থায় তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এর থেকে সুস্পষ্ট বিধান আর কী হতে পারে! ‘জালাবিব' শব্দটি ‘জিলবাব’ এর বহুবচন। আর ‘জিলবাব' বলে ওই চাদরকে, যার ভেতর নারীর পুরো শরীর আবৃত থাকে। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা কেবল জিলবাবের কথা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি; বরং সেই চাদরকে মাথার ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিতে বলেছেন। যেন চেহারাও চাদরে আবৃত হয়ে যায়।

ফ্রি মিক্সিং:

ফ্রি-মিক্সিং নিয়ে এখানে আমরা বিস্তারিত আলাপ করব না। আমরা কেবল এখানে সংক্ষিপ্তভাবে ফ্রি-মিক্সিং হারাম হওয়ার কিছু দলিল ও মডার্নিস্ট মুসলিমদের সংশয়ের জবাব তুলে ধরার চেষ্টা করব। তার আগে একটা বিষয় পরিষ্কার করে নিচ্ছি।

আমরা অনেক সময় সতর আবৃত করার বিধানের সাথে আরও বেশ কিছু বিধানকে মিলিয়ে ফেলি। আর মিলিয়ে ফেলার এই ভাব থেকেই আমাদের মাঝে একটি ভয়াবহ চিন্তার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। সেটা হলো, সতর আবৃত করে সব করা যায়। কিন্তু আমরা ভুলে যাই সতর আবৃত করা পরিপূর্ণ পর্দা নয়। পর্দার বিধানের সাথে আরও অনেক বিধান জড়িত আছে। পুরো শরীর ও হাত-মুখ ঢাকা পৃথক একটি বিধান। ফ্রি-মিক্সিং, গাইরে মাহরাম পুরুষের সাথে নির্জনতা অবলম্বন, গান-বাদ্য, মডেলিং ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা পৃথক বিধান। এজন্য যথারীতি সতর আবৃত করেও কোনো নারী গাইরে মাহরাম পুরুষের সাথে নির্জনতায় অবস্থান করতে পারবে না।২৩৮ কারণ সতর আবৃত করা ও নির্জনতা অবলম্বন না করা, দুটো পৃথক পৃথক বিধান। একটির জন্য অপরটি শিথিল হয়ে যাবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে তার কোনো মাহরাম না থাকা অবস্থায় নির্জনতা অবলম্বন না করে।’২৩৯ অন্য হাদিসে আছে, কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান করলে সেখানে শয়তান থাকে তৃতীয় পক্ষ (অর্থাৎ শয়তান তখন তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়) ।

এমনিভাবে যথারীতি সতর আবৃত করেও কোনো নারী গাইরে মাহরাম পুরুষদের সাথে কোনো অনুষ্ঠান, সম্মেলন, কর্মক্ষেত্র কিংবা শ্রেণিকক্ষ ইত্যাদিতে পুরুষদের সাথে ইখতিলাত তথা ফ্রি-মিক্সিং করতে পারবে না। এটা তার জন্য বৈধ নয়; বরং এসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের জন্য পৃথক ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে। মোটকথা, সতর আবৃত করেও সব করা যায় না। সতর আবৃত করার কারণে শরিয়াহর অন্যান্য বিধানে শিথিলতা আসে না। সতর আবৃত করা পৃথক একটি বিধান,

শালীনতাবিরোধী আর ফাহেশা কাজ না করা আরেকটি বিধান। এজন্য হিজাব পরে সব করা যায় এই মানসিকতা আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে।

ইখতিলাত বা ফ্রি-মিক্সিং বলা হয়, গাইরে মাহরাম নারী-পুরুষ শিক্ষাক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র, আড্ডা, সম্মেলন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোনো ব্যবধান কিংবা আড়াল ছাড়া একই স্থানে একত্রিত হওয়া। যেই পরিবেশ থেকে তারা খুব সহজেই মেলামেশা, কথাবার্তা, আকার-ইঙ্গিত করতে পারে।

ইসলাম সাধারণভাবে ফ্রি-মিক্সিং হারাম করেছে। একান্ত বাধ্যগত পরিস্থিতি ছাড়া গাইরে মাহরাম নারী-পুরুষের জন্য ফ্রি-মিক্সিং বৈধ নয়। ইখতিলাত হারাম হওয়ার বিস্তারিত দলিল পেশ করা এখানে সম্ভব না। এর জন্য পৃথক রচনার প্রয়োজন। আমি এখানে ইখতিলাত হারাম হওয়ার পক্ষে এমন কিছু দলিল পেশ করতে চাচ্ছি, যেগুলো ব্যবহার করে মডার্নিস্টরা স্বয়ং ইখতিলাতকেই বৈধ প্রমাণ করতে চায়। এতে একদিকে ইখতিলাত হারাম হওয়ার দলিলও প্রদান হয়ে যাবে, অন্যদিকে মডার্নিস্টদের খণ্ডনও হয়ে যাবে।

মুসা আলাইহিস সালাম মাদায়েনের দুইজন নারীকে পানি উত্তোলন করে দিয়েছিলেন। সেই ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَمَّاوَرَدَمَاءَمَدْيَنَوَجَدَعَلَيْهِأُمَّةًمِنَالنَّاسِيَسْقُونَوَوَجَدَمِنْدُونِهِمُ

امْرَأَتَيْنِتَذُودَانِقَالَمَاخَطْبُكُمَاقَالَتَالَانَسْقِيحَتَّىٰيُصْدِرَالرِّعَاءُوَأَبُونَاشَيْخٌكَبِيرٌ.
فَسَقَىٰلَهُمَاثُمَّتَوَلَّىٰإِلَىالظِّلِّفَقَالَرَبِّإِنِّيلِمَاأَنْزَلْتَإِلَيَّمِنْخَيْرٍفَقِيرٌ.

‘যখন সে মাদইয়ানের কুয়ার কাছে পৌঁছল, সেখানে একদল মানুষকে দেখল, যারা তাদের পশুদের পানি পান করাচ্ছে। আরও দেখল তাদের পেছনে দুজন নারী, যারা তাদের পশুগুলোকে আগলিয়ে রাখছে। মুসা তাদের বলল, তোমরা কী চাও? তারা বলল, আমরা আমাদের পশুগুলোকে ততক্ষণ পর্যন্ত পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ না সমস্ত রাখাল তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে চলে যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ। তখন মুসা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়েছিলেন। তারপর একটি ছায়াস্থলে ফিরে আসলেন। তারপর বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণ বর্ষণ করবে আমি তার ভিখারি।

এই আয়াত ফ্রি-মিক্সিং নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে সুস্পষ্ট একটি দলিল। আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, শুয়াইব আলাইহিস সালামের দুই মেয়ে পুরুষদের ভিড় থেকে দূরে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাদের চলে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। যেন তারা মিক্সিং ছাড়া পানি তুলে আনতে পারেন। ইবনে জারির রহিমাহুল্লাহ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করে বলেন,

‘আমরা দুজন নারী, আমরা পুরুষদের সাথে ভিড় জমাতে পারি না।

ইমাম বাগাভি রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘বাকিরা শেষ না করা পর্যন্ত আমরা পালিত পশুদের পানি পান করাতে পারি না। কারণ আমরা দুইজন মেয়ে। এই ধরনের ভিড়ের পরিবেশে আমরা আমাদের পশুদের পানি পান করাতে পারি না এবং আমাদের পক্ষে পুরুষদের সাথে মিলিত হওয়াও সম্ভব নয়।

সুতরাং এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, নারীদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে পুরুষদের সাথে ইখতিলাত না করা। এই আয়াত থেকে আরেকটি বিষয় বোঝা যায়, সাধারণত ঘরের বাইরে নারীদের জন্য কাজ করা উচিত নয়; বরং ঘরের পুরুষরা এসব কাজ সম্পাদন করবে। একমাত্র অপারগতা কিংবা প্রয়োজনের সময় নারীরা ঘরের বাইরে শরিয়াতের অন্যান্য বিধিমালা মেনে কাজ করতে পারে। এজন্য হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দুই মেয়েকে তাদের দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করল, তারা দুটি কারণ দেখাল। একটি হলো, আমরা পুরুষদের সংস্পর্শে যাব না। এজন্য তাদের প্রস্থানের অপেক্ষায় আছি। অপর কারণটি হলো, আমাদের কোনো ভাই নেই এবং আমাদের বাবাও বৃদ্ধ মানুষ; কাজ করতে অক্ষম। এজন্য আমরা গবাদিপশুকে পানি পান করাতে এসেছি। অর্থাৎ অপারগ হয়ে এসেছিলেন এবং যেহেতু আসতেই হয়েছে, এজন্য বাইরের পরিবেশের আদব রক্ষার্থে ফ্রি-মিক্সিং এড়িয়ে চলছেন।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, এই আয়াতে ফ্রি-মিক্সিংয়ের বিরুদ্ধে এত সুস্পষ্ট বার্তা থাকার পরেও কিছু বিভ্রান্ত ব্যক্তি এই আয়াতকে ফ্রি-মিক্সিংয়ের পক্ষে দলিল হিসেবে ব্যবহার করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। যেমন বিখ্যাত মডার্নিস্ট আবদুল হালিম আবু শুক্কাহ তার লিখিত গ্রন্থ ‘তাহরিরুল মারআহ ফি আসরির রিসালাহ'-এর ভেতর ফ্রি-মিক্সিংয়ের পক্ষে এই আয়াতটিকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করেছে। অথচ সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে উম্মাহর সকল মুফাসসির ও ফকিহরা এই আয়াতকে ঠিক সেভাবেই বুঝেছেন, যেমনটা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মডার্নিস্টরা সালাফদের সকলের বুঝকে প্রত্যাখ্যান করে যুগের সাথে তাল মেলানোর নামে মনগড়া নিজস্ব ভ্রান্ত বুঝের আশ্রয় নেয়া ইসলামকে কথিত সংস্কারের নামে তাদের মূল ভূমিকাই হলো, সালাফে সালেহিনের আমল ও বুঝকে পেছনে ছুঁড়ে ফেলা।

দুঃখজনক বিষয় হলো, বিখ্যাত দুজন ব্যক্তি বইটির শুরুতে প্রশংসাসুলভ অভিমত লিখে দিয়েছেন। একজন হলেন শায়খ মুহাম্মাদ আল গাজ্জালি, অন্যজন হলেন শায়খ ইউসুফ আল কারজাভি। শায়খ ইউসুফ আল কারজাভিও তার বিভিন্ন লেখায় ফ্রি-মিক্সিংকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেছেন এবং এটাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত ইসলামি সভ্যতার একটি স্বাভাবিক সংস্কৃতি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। মূলত মুসলিমদের ভেতর আধুনিক সংস্কারবাদী যেই ধারাটি রয়েছে তাদের সকলের ভেতরই কমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলাপের সুযোগ নেই। আমরা ভিন্ন কোনো গ্রন্থে তাদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ইরাদা রাখি। ইনশাআল্লাহ।

ফ্রি-মিক্সিংয়ের বিপক্ষে আরেকটি দলিল হলো, নারীদের তালীম বা শিক্ষার জন্য আলাদা স্থান ও দিন নির্ধারণ করে দেওয়ার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস। আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একজন নারী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমাদের থেকে পুরুষরাই আপনার কাছে অধিকাংশ সময় থাকে। আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য আলাদা দিন নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের তালীম দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

আল্লামা আইনি রহিমাহুল্লাহ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ পুরুষরাই প্রতিদিন আপনার পাশে থাকে এবং ইলম ও দীনি বিষয় শ্রবণ করে। আমরা নারীরা দুর্বল, তাদের ভিড়ে আমরা আসতে পারি না। আমাদের জন্য বিশেষ একটি দিন ধার্য করে দিন। যেদিন আমরা আপনার কাছ থেকে ইলম ও দীনি বিষয় শুনব।

আরেক হাদিসে এসেছে, একজন নারী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, 'পুরুষরা আপনার হাদিস আহরণ করে নিয়ে যায়। আমাদের জন্য নির্দিষ্টভাবে আলাদা স্থান ও সময় নির্ধারণ করে দিন, যেদিন আমরা আপনার কাছে শিক্ষার জন্য আসব। আল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়েছেন, আপনি আমাদের তা শেখাবেন।' তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'অমুক দিন অমুক স্থানে তোমরা একত্রিত হবে। এরপর থেকে নারীরা নির্ধারিত সময় ওই জায়গাতে একত্রিত হতো এবং তিনি তাদের আল্লাহ যা শিখিয়েছেন তার শিক্ষা দিতেন।

ওপরে উল্লেখিত দুটি হাদিস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসুলের যুগে

নারী সাহাবিরাও পুরুষদের সাথে সাধারণ মেলামেশা থেকে দূরে থাকতেন। অথচ তারা ছিলেন এই উম্মতের মাঝে সবচেয়ে পবিত্র হৃদয় ও পরিচ্ছন্ন ঈমানের অধিকারী। যদি ফ্রি-মিক্সিং অনুমোদিতই হতো, তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের পুরুষদের সাথেই আসতে বলতেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে শিক্ষা, মসজিদ, রণক্ষেত্র কোথাও ফ্রি-মিক্সিং ছিল না। যেমনটা মডার্নিস্ট মুসলিমরা দাবি করে। মসজিদে নামাজের সময়ও নারীরা পুরুষদের থেকে আলাদা থাকতেন। এমনকি হাদিসে এমন বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, নারীরা অন্য কোনো পুরুষকে পাঠিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রশ্ন পৌঁছাতেন। স্বয়ং নারীরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করার যেসব বর্ণনা আছে, সেগুলো থেকেও ফ্রি-মিক্সিং সাব্যস্ত হয় না। কারণ তারা পুরুষদের থেকে আলাদা জায়গায় অবস্থান করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করতেন।

রাসুলের যুগে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নারীরা যুদ্ধের ময়দানে অংশগ্রহণ করত না। কারণ সাধারণত ময়দানের যুদ্ধ নারীদের ওপর আবশ্যক নয়। এজন্যই হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুল

সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিহাদের সওয়াবের তামান্না প্রকাশ করলে তিনি তাকে বলেন, “কবুল হজই হলো তোমাদের জিহাদ।

তবে প্রয়োজনের স্বার্থে বেশ কিছু যুদ্ধে নারীরা অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু সেই অংশগ্রহণ লড়াইয়ের জন্য ছিল না। ছিল আহতদের স্বাস্থ্য সেবা ও খাবার-পানীয় সরবরাহের জন্য। এই বিষয়টিকেও মডার্নিস্টরা ফ্রি-মিক্সিং বৈধ হওয়ার জন্য দলিল হিসেবে পেশ করে। অথচ এই ঘটনা থেকেও ফ্রি-মিক্সিং প্রমাণিত হয় না। কারণ তারা পুরুষদের থেকে পৃথক হয়ে কাফেলার সঙ্গী হতো। যেমনটা সহিহ মুসলিমের এক হাদিসে এসেছে–উম্মে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, “আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাতটি যুদ্ধে ছিলাম। সেগুলোতে আমি কাফেলার পেছনের থাকতাম। আর তাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং অসুস্থদের দেখাশোনা করতাম।" ইমাম কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ আরও পরিষ্কার করে বলেছেন। যেসব নারীরা যুদ্ধে অংশ্রহণ করত, তারা সেনাদের পানি সরবরাহ করার ক্ষেত্রে পানির পাত্র পুরুষদের নিকটতম স্থানে রেখে দিয়ে আসত। আর পুরুষরা সেটা নিজেরা পান করে নিত। এমনিভাবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তারা ক্ষতস্থানের জন্য ওষুধ প্রস্তুত করত। কিন্তু পুরুষদের অবৈধভাবে স্পর্শ করত না। আর তাদের মধ্যে বয়স্ক নারীদের জন্য মুখ খোলা রাখার বৈধতা ছিল। যুবতীরা মুখ ঢেকে রাখত।

এই প্রসঙ্গে ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘নারীরা সাধারণত তাদের মাহরাম পুরুষ ও স্বামীদের চিকিৎসা করত। আর গাইরে মাহরাম পুরুষদের ক্ষেত্রে চিকিৎসার প্রয়োজন হলে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া স্পর্শ পর্যন্ত করতেন না।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, যুদ্ধের মতো প্রয়োজনের পরিস্থিতির সাথে তুলনা করে স্বাভাবিক কোনো জিনিসের বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। সালাফদের কেউই এসব বর্ণনা থেকে ইখতিলাতের বৈধতার কথা বলেননি। তারা নির্দিষ্ট কোনো ঘটনাকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে দেখিয়ে ইখতিলাতকে ব্যাপকভাবে বৈধতা দেননি এবং উৎসাহও প্রদান করেননি; বরং কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। ফ্রি-মিক্সিংকে বৈধ করার জন্য মডার্নিস্টরা যেসব দলিল দেখাতে চেষ্টা করে, তার সবগুলো দলিল এখানে খণ্ডন করা সম্ভব না এবং সেটার প্রয়োজনও নেই। আমরা যদি তাদের এই সমস্ত দলিল উপস্থাপনের পেছনের মৌলিক সমস্যাটা চিহ্নিত করতে পারি, তবেই তাদের দলিলগুলোর অসারতা বুঝতে পারব। আর সেই মৌলিক সমস্যাটা হলো, কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন ঘটনাকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থাপন করা এবং যুগ চাহিদা কিংবা ইজতিহাদ, তাজদিদ, মাকাসিদ, মাসালিহ ইত্যাদির নামে সালাফে সালেহিনের বুঝকে অগ্রাহ্য করে প্রবৃত্তি কিংবা পশ্চিমা সভ্যতার আদলে মনগড়া ব্যাখ্যা পেশ করা। এটাই তাদের মূল সমস্যা। কিন্তু এই কথা সব যুগের সব আলেমদের কাছে ঐকমত্যে স্বীকৃত যে, সালাফদের বুঝ ও আমলের বাইরে গিয়ে ইসলামকে বোঝা সম্ভব না। যারাই এই কাজ করতে গিয়েছে তারাই ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে নিয়ে ফ্রান্স ও ব্রিটিশদের উপনিবেশের আগে মুসলিম-সমাজে ফ্রি-মিক্সিংয়ের সংস্কৃতি ছিল না। প্রথমে উপনিবেশবাদীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে ফ্রি-মিক্সিংয়ের প্রচলন শুরু করে। আর সেটাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য পশ্চিমা সভ্যতায় প্রভাবিত একদল কথিত বুদ্ধিজীবী কুরআন-সুন্নাহকে বিকৃত করে। এর আগ পর্যন্ত ফুকাহায়ে কেরামের কোনো কিতাবে ইখতিলাত হারাম হওয়ার ব্যাপারে ন্যূনতম বিতর্ক দেখা যায় না। উপনিবেশের সাথে সাথে মুসলিম দেশগুলোতে এই বিতর্ক প্রবেশ করেছে কাসিম আমিনের মতো কিছু লোকের হাত ধরে। যারা ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় সাদা চামড়ার লোকদের সেবা করে গেছে এবং আজও কিছু মুসলিম বুঝে কিংবা না বুঝে নিষ্ঠার সাথে এই সেবা পালন করে যাচ্ছে। আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে এদের ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ রাখুন এবং তাদেরও সঠিক বোধ ও বুঝ দান করুন। আমিন।

ইসলামের আলোকে নারীর শিক্ষা, চাকরি ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিশ্চিতকরণে করনীয়ঃ

এখানে নারীর শিক্ষা, চাকরি ও রাজনৈতিক তৎপরতা নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু কথা বলব। ফিকহি ইখতিলাফ ও তার পক্ষে বিপক্ষের দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে আলোচনা করব না। এখানে ফিকহি আলোচনার বাইরে গিয়ে এগুলোর প্রতি ইসলামের মৌলিক চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গি জানার চেষ্টা করব।

নারী-শিক্ষাঃ

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে শিক্ষা অর্জনের নির্দেশ দেয় এবং উৎসাহ প্রদান করে। কুরআন-হাদিসে এমন কোনো উক্তি নেই যা নারীর শিক্ষা গ্রহণকে নিষিদ্ধ করে কিংবা নিরুৎসাহিত করে। ইসলামের ইতিহাসে অনেক আলেমা, মুহাদ্দিসা, ফকিহা ও খ্যাতনামা নারীদের দৃষ্টান্ত আছে। যেই সাতজন মহান ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের প্রজ্ঞা গণমানুষের কাছে পৌঁছেছে, তাদের একজন হলেন উন্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা। এমনকি ইসলামি ইতিহাসে নারীরা ফতোয়া প্রদানের খেদমতও আঞ্জাম দিয়েছেন।

ইসলামে নারীর শিক্ষা কোনো গৌণ বিষয় নয়; বরং এটি একটি আবশ্যকীয় বিষয়। এজন্য কেউ নারীর শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করতে পারে না। এমনকি কোনো নারী যদি উচ্চশিক্ষাও অর্জন করতে চায়, তবে তাকে বাধা দেওয়া বৈধ হবে না। তবে সেই শিক্ষা, তার পরিবেশ ও উদ্দেশ্য অবশ্যই নারীর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্বের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া যাবে না। ইসলামি শরিয়াহর নীতিমালা ও চাহিদার পরিপন্থি হওয়া যাবে না। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি এটাই যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কাউকেই এই শিক্ষা তাদের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন করে না। তাদের আদর্শ পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা এখানে নেই।

বিশেষ করে সমাজে নারীশিক্ষার যেই আস্ফালন, তার পুরো প্রজেক্টই পশ্চিমাবান্ধব। এই শিক্ষা প্রজেক্টের অন্যতম এজেন্ডা হলো, নারীকে কেবল একজন উৎপাদক যন্ত্র হিসেবে আমদানি করা।

প্রচলিত নারীশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, নারীকে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত করা, নারীকে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান হওয়ার এক অপ্রাকৃতিক ও ঘৃণ্য প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেওয়া।

উপনিবেশ আমলে যখন মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তখন শায়খ মুস্তফা আস সবারি রহিমাহুল্লাহ 'কওলি ফিল মারআহ ওয়া মুকারানাতুহু বি আকওয়ালি মুকাল্লিদাতিল গারবি' নামক গ্রন্থ লেখেন। এই বইয়ে তিনি বলেন, আমি মনে করি নারীদের শিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত তাদের প্রধান ও স্বভাবজাত দায়িত্ব পালন। অর্থাৎ পরিবার পরিচালনা, সন্তান প্রতিপালন ও তাদের চরিত্র গঠন। এবং তাদের শিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত পারিবারিক ব্যবস্থাপনা, সুস্থতা ও অর্থনীতির ওপর। সব কাজে ও সর্বক্ষেত্রে পুরুষদের সমান হওয়ার জন্য তাদের শিক্ষা কর্মসূচি হওয়া উচিত নয়। কারণ এটা সম্ভবও না, কল্যাণকরও না। আর নারী-পুরুষের সমতার যেই দাবি, এটা কখনোই সম্ভব নয়। একজন পুরুষের জন্য যেসব বিষয় উপযুক্ত, তার সবগুলো একজন নারীর জন্য উপযুক্ত হবে না। একই কথা বিপরীত ক্ষেত্রেও।

এজন্য নারী-পুরুষের শিক্ষা কর্মসূচি এক হওয়া মারাত্মক ক্ষতিকর। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো, সমাজের সদস্যদের স্ব স্ব দায়িত্বে দায়িত্ববান করে তোলা। দীনের বুনিয়াদি শিক্ষার পর স্ত্রী ও মা হিসেবে একজন নারীর শিক্ষায় প্রথম অগ্রাধিকার পাবে এই সংক্রান্ত শিক্ষা অর্জন করা। এজন্য শায়খ মুস্তফা আস সিবায়ি রহিমাহুল্লাহ মনে করতেন, বিশেষভাবে পরিবার পরিচালনা-সংক্রান্ত বিদ্যা মেয়েদের পাঠ্যসূচিতে বেশি পরিমাণ থাকা উচিত। যাতে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে সফলতা অর্জন সহজ হয়।

পাশাপাশি মেধা অনুপাতে এবং দীন, উম্মাহ ও সমাজের প্রয়োজনে তার ফিতরাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন শাস্ত্রেও একজন নারী ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারে। নারীর শিক্ষা কর্মসূচি এমন হতে হবে, যা তাকে আদর্শ স্ত্রী ও মা হিসেবে গড়ে তুলবে। তাকে পুরুষের সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার বাসনায় উন্মাদ করবে না। তাকে পরিবার থেকে বিমুখ করে বহির্মুখী করে তুলবে না। তাকে এমন কোনো পেশা কিংবা পরিবেশে ঠেলে দেবে না, যেখানে তার নারীত্ব ও মর্যাদা মারাত্মকভাবে শোষিত হয়; কিন্তু সেটা সে অনুভবও করতে পারে না। তাকে মাতৃত্বের পরিচয় ছাপিয়ে কেবলই একটা উৎপাদক যন্ত্র হওয়ার লিপ্সায় অন্ধ করে তুলবে না।

ইসলামে নারীশিক্ষা কর্মসূচির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এই কর্মসূচি প্রথমে তাকে আল্লাহর আবদিয়্যাত বাস্তবায়নের চেতনায় উজ্জীবিত করবে। তারপর তাকে একজন আদর্শ পরিবার পরিচালক ও প্রজন্ম তৈরির কারিগর হিসেবে গড়ে তুলবে। সবশেষে তার ফিতরাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ক্ষেত্রগুলোতে সেবা দেওয়ার জন্য তাকে যোগ্য করে তুলবে।

নারীর চাকরি:

নারীর চাকরির কথা বলতে গেলে যে বিষয়টি বুঝতে হবে, আধুনিক যুগের চাকরি কাঠামো সম্পূর্ণই নতুন। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঘরের বাইরে থাকাসহ আরও বিভিন্ন নিয়মনীতি ও বাধ্যবাধকতা পালনের যে কাঠামো আমরা দেখতে পাই, সেটার সাথে ইসলামের প্রথম যুগের কিছু দৃষ্টান্ত এনে তুলনা করলে ভুল হবে। এবং এটা নিজের ও সমাজের সাথে বিশাল প্রতারণা হবে। তখন হয়তো বিচ্ছিন্ন দলিল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারব, কিন্তু এর খারাপ ফলটাকে অনুধাবন করতে পারব না এবং ইসলামের চাহিদাটাও বাস্তবায়ন করতে পারব না ।

ইসলাম কখনোই নারীদের ব্যাপকভাবে ঘরের বাইরে কর্মসংস্থানের দিকে ছোটার জন্য উৎসাহিত করে না। আবার নিঃশর্তভাবে তার চাকরির পথকে রুদ্ধও করে দেয়নি। যেন সে প্রয়োজনের মুহূর্তে এই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে। ইসলর ামের ইতিহাসে ব্যাপকভাবে কর্মের প্রতি নারীদের ঝোঁক পরিলক্ষিত হয় না।

মূলত এই ঝোঁক এসেছে পশ্চিমা সমাজ থেকে। কারণ পশ্চিমা সমাজে একটা বয়স পার করার পর পুরুষ নারীর অর্থনৈতিক দায় দায়িত্বের বোঝা বহন করতে চায় না। শায়খ মুস্তফা আস সিবায়ি রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আমার মতে নারীদের কর্মজীবী হওয়ার মাত্রারিক্ত বাসনা নিছক পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া কিছুই না। এই পথ অবলম্বন করার পর নারীকে সেসব কষ্টকর দায়দায়িত্ব বহন করতেই হবে, যা পাশ্চাত্যের নারীকে করতে হয়। আর এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দর্শনের সকল অনিবার্য কুফলগুলোও তাকে ভোগ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

আমরা অনেক সময় হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যবসাকে নারীদের চাকরির পক্ষে দলিল হিসেবে দেখাতে চাই। কিন্তু আমরা ভুলে যাই, হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলামে আসার পর ব্যবসার জন্য এক মুহূর্তও ঘরের বাইরে থাকেননি; বরং সমস্ত দায়িত্ব তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ন্যস্ত করে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া আগেও ঘরের অভ্যন্তরে থেকে অন্য লোক দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতেন। এমনকি তিনি ঘরের ভেতরের কোনো কাজের ত্রুটি পর্যন্ত করতেন না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যবসার সময়ে ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেনি। পর্দা, হজ, জিহাদ ইত্যাদি অধিকাংশ বিধান এসেছে মদিনাতে হিজরতের পর। সুতরাং হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার দৃষ্টান্ত দিয়ে নারীদের ব্যাপকহারে ব্যবসা বা চাকরির দিকে ধাবিত করার প্রচেষ্টা ইসলামি শরিয়াহর সাথে পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক।

হ্যাঁ, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান এমন আছে, যেগুলো মহিলাদের দ্বারা খুবই উপকৃত হতে পারে। যেমন : হাসপাতাল, শিশুবিদ্যালয়, মহিলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও এমন সামাজিক কর্মকাণ্ড, যেখানে নারীরাই অধিকতর সফলতা লাভ করতে পারে। আবার নারীদের ভেতর এমন কোনো বিরল প্রতিভাধারী মানুষও থাকতে পারে,

যার মেধা উম্মাহর কল্যাণে বৃহৎ ভূমিকা রাখতে পারে। এসব ক্ষেত্রে নারীর চাকরি করাটা কেবল চাকরিজীবী নারীদেরই প্রয়োজন পূরণ করে না, এর পাশাপাশি তার এই চাকরিটা সামাজিক প্রয়োজন ও দাবি পূরণেও ভূমিকা রাখে।

এই জন্য উলামায়ে কেরাম এসব ক্ষেত্রে কিছু নারীর অংশগ্রহণকে ফরজে কিফায়া হিসেবে মত প্রদান করেছেন। ফলে আমাদের উচিত নারীবান্ধব এসব ক্ষেত্রকে নারীদের জন্য উন্মুক্ত করা। এগুলো বিশাল এক ক্ষেত্র, যেখানে আমরা নারীদের আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা, যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে পারি।

নিজেকে প্রমাণ করার জন্য, কথিত স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত তৈরির জন্য, উইমেন এম্পাওয়ারের (নারীর ক্ষমতায়নের) জন্য কিংবা পুরুষের সাথে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য চাকরির প্রতি বর্তমান নারীসমাজের যেই অবাধ ঝোঁক তৈরি হয়েছে, এর সাথে শরিয়াহর কোনো সম্পর্ক নেই। উম্মাহর বৃহৎ কল্যাণ ও সত্যিকার অর্থেই নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য নির্দিষ্ট কিছু নারী কর্মসংস্থানে আসতে পারে এবং সেটাও ইসলামের অন্য সব বিধিবিধানকে অক্ষুণ্ন রেখে। কিন্তু মুসলিম নারীদের প্রধান জায়গা তার পরিবার। পরিবারকে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য দুর্গ হিসেবে প্রস্তুত করার যে মহান দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষ উভয়কেই দিয়েছেন, সে দায়িত্ব পালনে পরিবারই তার আসল ক্যারিয়ার, মূল কর্মক্ষেত্র। এখানে অবহেলা ও ত্রুটি করে এবং আল্লাহর শরিয়াহকে লঙ্ঘন করে মুসলিম নারীদের কোনো ক্যারিয়ার থাকতে পারে না। তৈরি হতে পারে না তাদের সফলতা ও উন্নতির কোনো গল্প।

নারী-নেতৃত্বঃ

যদিও ইসলাম নারীকে দীন প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব অর্পণ করেছে, তথাপি ইসলামের প্রথম যুগ থেকে রাজনীতির সাথে তাদের কোনো সংস্রব ছিল না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর বনু সায়িদা গোত্রের মুক্তাঙ্গনে মুসলমানদের খলিফা নির্বাচন-সংক্রান্ত সলাপরামর্শের জন্য সাহাবিদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে কোনো নারী সদস্য যোগদান করেছিল বলে আমাদের জানা নেই। শাসন-সংক্রান্ত কোনো কর্মকাণ্ডে পুরুষদের সাথে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি আমাদের জানা নেই।

খুলাফায়ে রাশেদিন রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলির ব্যাপারে পরামর্শের জন্য পুরুষদের যেমন বৈঠক আহবান করতেন, তেমনি নারীদেরও বৈঠক অনুষ্ঠিত করতেন– এমন কোনো তথ্য আমাদের গোচরে আসেনি। ইসলামের সমগ্র ইতিহাসেও আমরা এমন কোনো নজির দেখতে পাই না যে, রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে, রাজনৈতিক তৎপরতায় ও যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনায় নারীরা পুরুষদের পাশাপাশি অবস্থান করত। হ্যাঁ, কোনো কোনো সময় রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যোগ্য নারী আপত্তি জানাত। সেই সুযোগ এখনো আছে। কিন্তু এর দ্বারা কখনো সক্রিয় রাজনৈতিক তৎপরতা প্রমাণিত হয় না।

ইতিহাসে আমরা যেটুকু পাই তা হচ্ছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের হাতে হাত না রেখেই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তারা কখনো আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, সন্তান হত্যা করবে না, কারও নামে মিথ্যা অপবাদ রটাবে না এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ লঙ্ঘন করবে না। কিন্তু এই সব অঙ্গীকারগ্রহণের ঘটনাকে কেউ যদি মুসলিম নারীর রাজনৈতিক তৎপরতা হিসেবে গণ্য করে, তবে সে ভুল করবে এবং একে ইতিহাসের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না।

আমরা জানি যে, কোনো কোনো সাহাবির স্ত্রী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচালিত যুদ্ধবিগ্রহে আহতদের সেবা-শুশ্রূষা ও পিপাসার্তদের পানি পান করানোর জন্য পুরুষদের সাথে রণাঙ্গনে যেতেন। তারা আহতদের চিকিৎসা ও সেবার জন্য নির্ধারিত শিবিরে থাকতেন এবং কোনো মুসলমান যুদ্ধে আহত হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ওই শিবিরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন। এই তথ্যটাও নারীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার প্রমাণ বহন করে না।

ইতিহাসের এক বিখ্যাত যুদ্ধ জঙ্গে জামালে উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি উটের পিঠে বসে পর্দার অন্তরাল থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, পরবর্তী সময়ে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের এই কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করেছিলেন এবং অন্যান্য উম্মুল মুমিনিনগণ এজন্য তাকে ভর্ৎসনাও করেছিলেন। কাজেই হযরত আয়েশার এই পদক্ষেপ দ্বারা মুসলিম নারীর রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত হওয়ার বৈধতা প্রমাণ হয় না। কেননা প্রথমত এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, দ্বিতীয়ত এটা যে ভুল ছিল ব্যাপারটা স্বয়ং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাই উপলব্ধি করেছিলেন।

ইতিহাসের কোনো কোনো যুগে কোনো কোনো নারী দেশের শাসক ও সম্রাজ্ঞী হয়েছিলেন। কেউ বা নিজ স্বামীর প্রভাব খাটিয়ে পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশীদার হয়েছিলেন। সবই ব্যতিক্রমী ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা, যা দলিল প্রদানের জন্য উপযুক্ত না। কারণ ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলি কখনো শরিয়াহর ব্যাপারে দলিল হয় না। সুতরাং এ কথা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, মুসলিম নারীরা অতীতে রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করত না এবং মুসলমানদের মধ্যে সংগঠিত রাজনৈতিক ঘটনাবলিতেও তারা প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা রাখত না। হ্যাঁ, সমাজ সংস্কার, ইসলামি দাওয়াহ ও শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রে তারা সামাজিকভাবে অনেক ভূমিকা পালন করেছেন। নারীদের মাঝে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক তৎপরতা তারা পরিচালনা করেছেন এবং এই সুযোগ তাদের এখনো আছে; বরং বলতে হবে মুসলিম নারীদের এসব দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হতে হবে। কিন্তু সক্রিয় রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ইসলাম কখনোই অনুমোদন করে না। এটা তার যোগ্যতাকে অস্বীকৃতি দানের জন্য নয়; বরং পরিবার ও সমাজ গঠনের দায়িত্বে নিরবিচ্ছিন্নভাবে আত্মনিয়োগ, সার্বিক পর্দারক্ষা, ফ্রি-মিক্সিং এড়িয়ে চলা, মাহরাম ছাড়া সফর না করাসহ ইসলাম তাকে যেসব মূল্যবান বিধিনিষেধ দিয়েছে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রকৃতি নিশ্চিতভাবে তার এসব

বিধান পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। এজন্য যুগে যুগে মুসলিম নারীরা রাজনৈতিক হাঙ্গামা থেকে নিজেদের গুটিয়ে রেখেছেন।

আর এটা নারীর প্রতি অবমূল্যায়ন কিংবা নারীর অধিকার লঙ্ঘন করাও নয়; বরং ইসলাম এর মাধ্যমে নারীর ওপর অনুগ্রহ করেছে এবং তাকে বাহ্যমান রাজনীতির দৃশ্য থেকে আড়ালে রেখে যোগ্য ব্যক্তিত্ব গঠন করে নিজের ক্ষমতা বাস্তবায়নের সুযোগ দিয়েছে। তাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে তার মৌলিক দায়িত্ব পালনের নিরাপদ ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

পরিশেষে মুসলিম নারীদের তাদের রবের প্রতি বিশ্বাস মজবুত করতে হবে। আল্লাহ তাআলা কারও ওপর জুলুম করেন না। তিনি নারীদের ওপরও জুলুম করেননি। আমাদের অধিকারের কনসেপ্ট বিদেশি কোনো সংস্থা কিংবা দেশীয় কোনো এনজিওর কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে না। আমাদের অধিকারের উৎস মহান রবের দেওয়া পবিত্র শরিয়াহ, যিনি আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। সেই উৎস থেকেই আমরা আমাদের অধিকারের কনসেপ্ট গ্রহণ করব। কোনো সংস্থা কিংবা প্রচারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের মানসিকতা নিয়ে।

উপসংহারঃ

পরিশেষে, ইসলামি শরিয়াহ নারীর মানবিক বৈশিষ্ট্য, তার যোগ্যতা ও মর্যাদার স্পষ্ট স্বীকৃতি দেওয়ার পর তার স্বভাব-প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দিয়েছে এবং তার এই স্বভাব-প্রকৃতি জীবনের কোন কোন কাজ বা কর্মক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত তা সুনিপুণভাবে নির্ণয় করেছে। অতঃপর যে কাজ বা কর্মক্ষেত্র তার স্বভাব-প্রকৃতির পরিপন্থি ও অনুপযোগী, কিংবা সমাজে তার স্বভাবসুলভ ভূমিকা পালনের পথে অন্তরায়, সেই কাজ ও কর্মক্ষেত্র থেকে তাকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রেখেছে। এই কারণেই পুরুষের তুলনায় তার ওপর কিছু কাজের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছে, আবার কিছু দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দিয়েছে।

ইসলামি শরিয়াহ যখন নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়েছে তখন তার উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত মহৎ ও পবিত্র। হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তোষামোদ কিংবা নারীত্বকে শোষণ ও ব্যবহার করার নোংরা মানসিকতা তার ছিল না। অথচ গ্রীক, রোমান ও আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা তাকে যত্রতত্র বিচরণ, অবাধ মেলামেশা ও ঢলাঢলিতে নামিয়ে দিয়েছে। উদ্দেশ্য, তার নারীত্বকে নষ্ট করা ও ভোগ করা এবং তাকে রাজনৈতিক ও উপনিবেশের স্বার্থ বাস্তবায়নের হাতিয়ার বানানো। তার অধিকার ও মর্যাদার প্রতি স্বীকৃতি দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

পক্ষান্তরে ইসলাম ঠিক এর বিপরীত ভূমিকা পালন করেছে। ইসলাম নারীর জন্য সে বিধানই দিয়েছে যা তার যথার্থ মর্যাদা নিশ্চিত করে। ইসলাম পুরুষের সাথে মেলামেশা ও সভাসমিতিতে বিচরণের ব্যাপারে নারীর ওপর কঠোরতা আরোপ করেছে। কেননা ইসলাম চায় পরিবার ও সমাজের কল্যাণ সাধন করতে, নারীর ইজ্জত-সম্ভ্রমকে নিরাপদ ও তার নারীত্বকে শোষণমুক্ত করতে।

এজন্য মুসলিম নারীদের উচিত বিশ্বের সকল নারীর সামনে গর্ববোধ করা। কারণ তার অনুসৃত ইসলামি শরিয়াহ ও সভ্যতা দুনিয়ার সকল আইন ও সভ্যতার তুলনায় তাকে সবার আগে নিঃস্বার্থভাবে অধিকার প্রদান করেছে এবং তার মনুষ্যত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে। আর এই অধিকার ও স্বীকৃতি দিতে গিয়ে ইসলাম তার নারীত্বের বিন্দুমাত্র অবমাননা করেনি এবং তাকে কোনো স্বার্থ কিংবা জোরজবরদস্তির কালিমাও স্পর্শ করেনি।

তথ্যসূত্র

১. ইসলামে নারীর অধিকার ও জীবন ব্যবস্থা - ইলিয়াছ বিন সাঈদ

২. নারীবাদী বনাম নারীবাঁদি - কারিম শাওন

৩. বিহাইন্ড ফেমিনিজম নারীবাদের বাস্তবতা - মারিয়াম তানহা

৪. আধুনিক প্রাচ্যবাদের কবলে মুসলিম নারী সমাজ - হাসসান বিন সাবিত